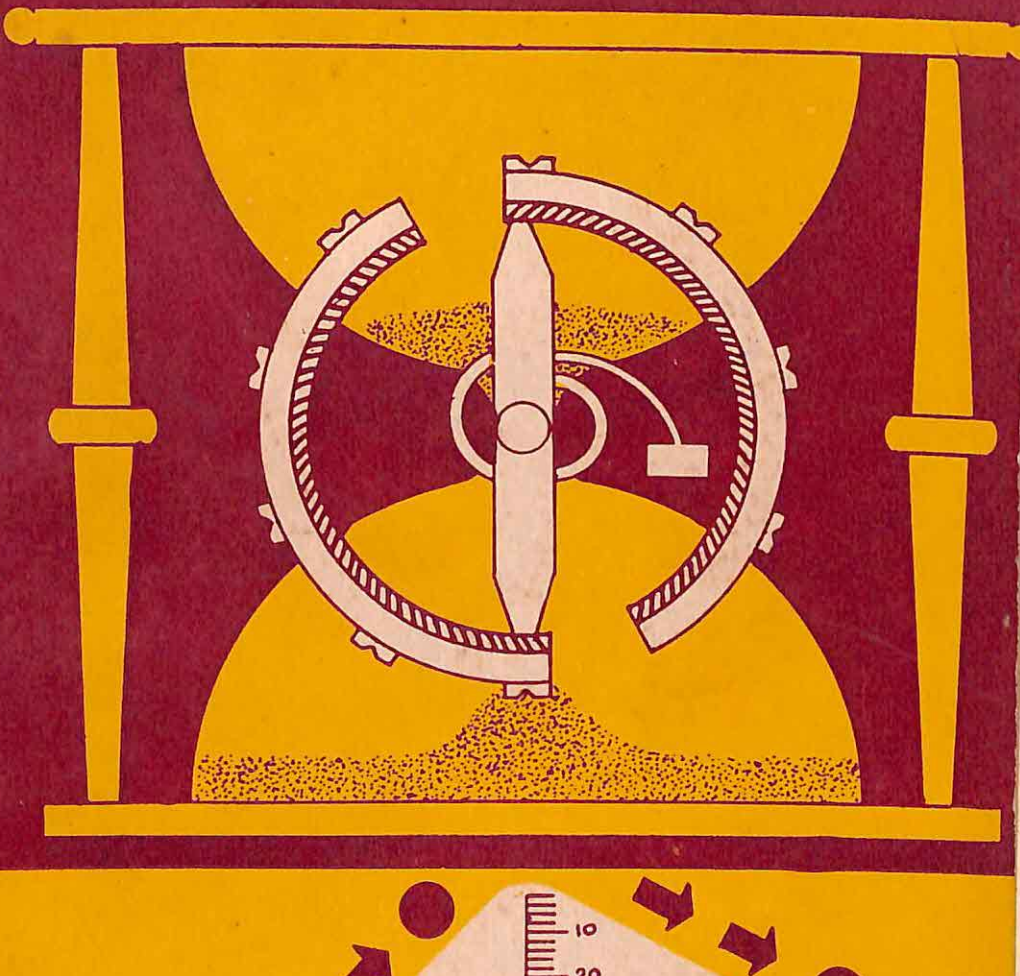
বিজ্ঞান পরিচয়

দেবব্রত নাগ ও অরবিন্দ নাগ



ওরিয়েন্ট লংম্যান

নবম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যক্রম (১৯৭৪) অনুযায়ী লিখিত এবং পশ্চিমবঙ্গ
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত
(TB/74/IX/PS/24 dated 24.11.75)

বিজ্ঞান পরিচয়

প্রথম ভাগ

[পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন : নবম শ্রেণীর জন্য]

অরবিন্দ নাগ, এম. এস-সি,
পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
দেবব্রত নাগ, এম. এস-সি., পি-এইচ-ডি.,
প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক, মেডিকেল কলেজ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; ভূতপূর্ব রসায়নের অধ্যাপক,
চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী
বাঙ্গালোর • হায়দ্রাবাদ

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস
৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১
অন্যান্য অফিস
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০৭২
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০০৩৮
৩৬এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩-৫-৮২০ হায়দারগুডা, হায়দ্রাবাদ ৫০০০০১

প্রথম মুদ্রণ : ১৯৭৪
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬

[এই পুস্তকে ব্যবহৃত কাগজ ভারত সরকারের আনুকূল্যে স্বলভ মূল্যে প্রাপ্ত]

মুদ্রাকর : পি. সি. রায়
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশক : শ্রী এন. ভেঙ্কু আয়ার, ম্যানেজার,
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭২

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচেষ্টা বহুদিন হতে শুরু হয়েছে। পুরোনো এক স্মৃতির অবতারণা করে এ বইয়ের নাম রেখেছি **বিজ্ঞান পরিচয়**। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান যখন প্রথম স্কুল পর্যায়ে শুরু হয়, তখন ঐ একই নামে পিতৃদেব শ্রীসুশীলচন্দ্র নাগ একটি পাঠ্য বই লিখেছিলেন। ঐ বইটি বহুদিন কলিকাতায় এবং অবিভক্ত বাংলার নানা স্কুলে পাঠ্য ছিল।

আমাদের **বিজ্ঞান পরিচয়** বইটি চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারে এবং তা প্রকাশ করতে পারে। নানা উদাহরণ ও চিত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়বস্তু বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রমের জন্য অনুমোদিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা অতিক্রম করে গেছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা ; সেজন্য পৃষ্ঠা-সংখ্যা কিছু বেশী হলেও তা কাট-ছাঁট করা হয়নি।

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড বাংলা ভাষায় এই পাঠ্য পুস্তকটি ছাপাবার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটি যাদের জন্য লেখা তাদের উপকারে লাগলেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলিকাতা
১ অক্টোবর, ১৯৭৪

গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

পদার্থবিদ্যা

রসায়ন

প্রথম অধ্যায়

মাপতে হবেই ! কিন্তু কিভাবে ?

1. সূচনা

জড় পদার্থের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভই পদার্থ বা রসায়ন বিজ্ঞানের কাজ। তোমার পড়ার টেবিলটি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে তোমাকে অনেক কিছুই জানতে হবে। টেবিলটি কোন্ জিনিসের তৈরী, কাঠের না লোহার, তার আকার কি রকম, গোল না চতুষ্কোণ, টেবিলটি কত উঁচু, লম্বা-চওড়াতেই বা কতখানি ইত্যাদি ইত্যাদি। টেবিলটি বেশ উঁচু বললে যথেষ্ট বলা হল না। বসবার ছোট টুলটিরও কিছু উচ্চতা আছে ; তোমার পড়ার টেবিলটি তার থেকে উঁচু। অবশ্য বড় আলমারীটার মাথা যত উঁচু তত নয়। কাজেই টেবিলের উচ্চতা সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে একটা তুলনার কথা এসে যায়। কোন্টা ছোট কোন্টা বড়, কোন্টা বেশী কোন্টা কম, এই তুলনার নাম পরিমাণ। পরিমাণ জানতে গেলেই তা মাপতে হয়। টেবিলের উচ্চতা মাপা সম্ভব। ছোট টুলটির সমান উচ্চতার আর একটি টুল প্রথমটির উপর বসিয়ে দেখলাম মোট উচ্চতা টেবিলের সমান। সিদ্ধান্ত হল—টেবিলটির উচ্চতা টুলের উচ্চতার দ্বিগুণ। দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা তুলনার মাধ্যমে উচ্চতা মাপা সম্ভব। যার **পরিমাপ** (measurement) সম্ভব তাই **ভৌত রাশি** (physical quantity)। উচ্চতা, ওজন, উত্তাপ, সময় ইত্যাদি মাপা যায় ; কাজেই এরা ভৌত রাশি। এরকম বিভিন্ন ভৌত রাশির পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারলেই জড় পদার্থের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব। কাজেই বিভিন্ন ভৌত রাশির পরিমাপ করাটা জড়বিজ্ঞানের একটা প্রধান ও অবশ্য করণীয় কাজ।

2. পরিমাপের পদ্ধতি

মাপতে হবেই। কিন্তু কিভাবে? কোন রাশির পরিমাণ মাপতে গেলে ঐ রাশির কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে নিয়ে তার সঙ্গে রাশিটির তুলনা করা হয়। যে অংশটিকে তুলনার ভিত্তি হিসাবে নেওয়া হল তাকে বলা হয় **একক** (unit)। এককটি **সুবিধাজনক** হওয়া চাই। টুলের উচ্চতাটিকে উচ্চতার একক হিসাবে নিলে অনেক অসুবিধা। একটিমাত্র টুলে কাজ হবে না। একাধিক টুলের সমান উচ্চতা মাপতে একাধিক টুলের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া তোমার বসবার টুল যে সকলের কাছে **সহজলভ্য** হবে তার নিশ্চয়তা কি? উচ্চতা মাপবার জন্য হাতকেও একক হিসাবে নেওয়া

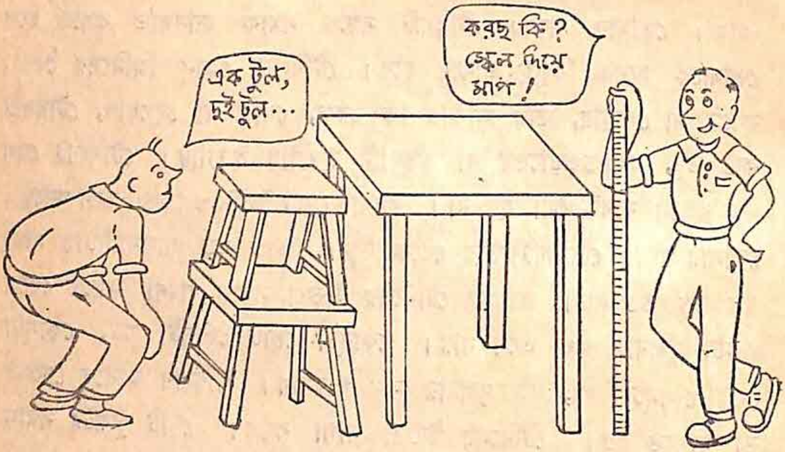


Fig. 1.1 মাপতে গেলে এককটি সুবিধাজনক হওয়া চাই।

চলে। টুলের থেকে হাত দিয়ে মাপা সুবিধাজনক। হাতে মেপে দেখা গেল, টেবিলের উচ্চতা তোমার হাতে দুই হাত। কিন্তু এখানেও গণ্ডগোল। হাত বললে এককটি সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হল না। তোমার হাত থেকে আমার হাত লম্বায় বড়। কাজেই তোমার হাতে যেখানে টেবিলের উচ্চতা দুই হাত, আমার হাতে সেখানে উচ্চতা দুই হাত থেকে কম। তোমার হাতই হাত, আমার হাত হাত নয়—একথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। আমার না তোমার, কার হাত দৈর্ঘ্যের একক, তা নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই উচ্চতা মাপতে গেলে উচ্চতার এমন একটা একক নেওয়া প্রয়োজন

যার সম্বন্ধে আমার, তোমার বা কারুরই কোন আপত্তি নেই। অর্থাৎ এককটি **সর্বজনস্বীকৃত** হওয়া চাই। সর্বজনস্বীকৃত এককটিকে **স্ট্যাণ্ডার্ড** বা **মানক** (standard) বলে।

টেবিলের উচ্চতা মাপতে এবার একটা ফুটরুল নিলাম। এখানে ফুটরুলটা হল স্ট্যাণ্ডার্ড। টেবিলের পা বরাবর ফুটরুলটি পর পর ফেলে দেখা গেল, টেবিলের উচ্চতা 3 ফুট অর্থাৎ টেবিলের উচ্চতা ফুটরুলটির দৈর্ঘ্যের তিন গুণ। কি মাপা হল তা বলতে গেলে দুটি জিনিস লাগে, একটি **একক**, যা দেখে বোঝা যাবে কোন্ রাশিটি মাপা হচ্ছে এবং **একটি সংখ্যা**, যা থেকে বোঝা যাবে যে, যে রাশিটি মাপা হচ্ছে সেটা এককের কত গুণ অর্থাৎ রাশিটির পরিমাণ কত। এখানে 3 হল সংখ্যা আর ফুট হল দৈর্ঘ্যের একক। ফুট বললেই বোঝা গেল যে কোন দৈর্ঘ্য মাপা হচ্ছে। **কেবল সংখ্যাটি বললেই হবে না, এককের কথাও অতি অবশ্যই বলতে হবে।**

এককের কথাটা না বললে শুধু সংখ্যাটি থেকে কিছু বোঝা যাবে না। এর কারণ হল, **একই রাশির বিভিন্ন একক থাকতে পারে।** ঘরের লম্বা-চওড়া মাপতে ফুট সুবিধাজনক। কিন্তু তোমার টেবিলের পাটাতনটি কত পুরু সেটা মাপতে গেলে ফুটের থেকে ছোট এককের প্রয়োজন। তেমন একটি একক হল ইঞ্চি। ইঞ্চির এককে 1 ফুট হল 12 ইঞ্চি আর টেবিলের পাটাতনটি 1 ইঞ্চি পুরু। আবার কলকাতা থেকে বর্ধমানের দূরত্ব বলা হয় 69 মাইল। এখানে ফুটে না বলে মাইলে বললেই সুবিধা। মাইলটি বড় একক। এক মাইলে 5280 ফুট। এখন টেবিলের উচ্চতা শুধু 3 বললে 3 ইঞ্চি, 3 ফুট বা 3 মাইল যা ইচ্ছা বোঝাতে পারে। কাজেই পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে **এককটির উল্লেখ করতেই হবে।**

পরিমাপ সম্বন্ধে আর একটি কথা **বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।** আগেই বলেছি যে, একই রাশি মাপতে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়। রাশিটির বড় অংশ মাপতে বড় একক এবং সূক্ষ্ম অংশ মাপতে সূক্ষ্ম একক। ধর, তোমাকে কোন দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। তুমি ফুট এককের মাপকাঠি নিয়ে দেখলে তার দৈর্ঘ্য পুরা 2 একক হয়ে কিছুই বেশী, কিন্তু 3 একক হয় না। 2 ফুট থেকে কতখানি বেশী তা জানতে গেলে সূক্ষ্মতর এককের মাপকাঠি লাগবে। সূক্ষ্মতর মাপকাঠি ইঞ্চি (1 ইঞ্চি = $\frac{1}{12}$ ফুট)

দিয়ে মেপে দেখা গেল, 6 এককের থেকে বেশী কিন্তু 7 এককের থেকে কম। যতটুকু বেশী সেটা জানতে আবার সূক্ষ্মতর মাপকাঠি লাগবে। সেই সূক্ষ্মতর মাপকাঠি দিয়ে মাপলেও কিছুটা থেকে যাবে। যতই সূক্ষ্ম এককের মাপকাঠি নিই না কেন, তার থেকেও কিছু সূক্ষ্ম অংশ বাকী থেকে যেতে পারে। মাপকাঠি সূক্ষ্ম নেবার একটা সীমা আছে। কাজেই সব রকম পরিমাপেই **কিছুটা ভুল থেকেই যায়।** ভুলটা বেশী হল কি কম হল তা নির্ভর করে মাপার প্রণালীর উপর। ঠিক কতটা ভুল হল তা যে সঠিকভাবে বলা যাবে না, সেটা বুঝতেই পারছ। (কেন?)। **তবে ভুলের সর্বোচ্চ পরিমাণ কতটুকু তা বলা সম্ভব।** যেমন, তোমার হাতে যদি শুধু ফুটের মাপকাঠিই থাকে তবে তুমি জোর দিয়ে বলতে পারবে যে দৈর্ঘ্যটা 2 থেকে 3 ফুটের মধ্যে, অর্থাৎ ভুলের পরিমাণ 1 ফুটের বেশী নয়। যখন ইঞ্চির মাপকাঠিও হাতে রয়েছে তখন বলতে পারবে যে দৈর্ঘ্য 2 ফুট 6 ইঞ্চি থেকে 2 ফুট 7 ইঞ্চির মধ্যে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ 1 ইঞ্চির বেশী নয়। যদি ভুলের সর্বোচ্চ পরিমাণ **খুবই কম** হয়, তবে পরিমাপটি মোটামুটিভাবে নির্ভুল হয়েছে বলা যেতে পারে। কতটুকু ভুলকে খুব কম ধরা হবে সেটা অবশ্য কোন্ জিনিসটা, কি কাজের জন্য মাপা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে। চাল মাপতে যতটুকু ভুল গ্রাহ্য না করলেও চলে, রসায়নবিদের পরীক্ষায় ততটুকু ভুল মারাত্মক হতে পারে।

কোন রাশি মাপতে গেলে তার নিজস্ব একক লাগে। সুতরাং বিভিন্ন রাশির জন্য বিভিন্ন একক চাই। যেমন দৈর্ঘ্য মাপি গজে, আয়তন লিটারে, ভর কেজিতে, আর সময় ঘণ্টায়। এভাবে এককের সংখ্যা অত্যধিক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কার্যত তা হয় না।

বিভিন্ন ভৌত রাশির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। কোন ভৌত রাশির স্বরূপটি কেমন অর্থাৎ অন্য রাশিদের সঙ্গে এই রাশির কি সম্পর্ক তা নির্দিষ্ট করতে হয় যথাযথ **সংজ্ঞার** (definition) মাধ্যমে। যেমন, একক সময়ে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করা হয় তাই **দ্রুতি** (speed)। এখানে দ্রুতির সংজ্ঞার মধ্যেই স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে কি করে সময় ও দূরত্ব মেপে দ্রুতি পাওয়া যাবে এবং দ্রুতির একক কিভাবে সময় ও দূরত্বের এককের উপর নির্ভর করবে। কোন গাড়ির দ্রুতি ঘণ্টায় 25 মাইল বললে এটাই বোঝায়

যে যদি এক ঘণ্টা সময় ধরে লক্ষ্য করি তবে ঐ সময়ে গাড়িটা যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তা মাপলে 25 মাইল হবে। এখানে দূরত্বের একক মাইল এবং সময়ের একক ঘণ্টা নেওয়া হয়েছে এবং দ্রুতির একক ঘণ্টা আর মাইলের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। জলের ঘনত্ব 62·5 পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে। এখানে ভরের একক পাউণ্ড এবং দৈর্ঘ্যের একক ফুট। অর্থাৎ ঘনত্ব মাপতে ভরের ও দৈর্ঘ্যের একক জানলেই যথেষ্ট। এভাবে বিভিন্ন ভৌত রাশির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—ঐসব রাশির একক দৈর্ঘ্য, সময়, বা ভরের এককের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য ও সময় সম্বন্ধে একটা অনুভব আমাদের আশৈশব। সহজতর অন্য রাশির মাধ্যমে দৈর্ঘ্য বা সময়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কোন বস্তুর ভর হল তার পদার্থ বা জড়ত্বের পরিমাণ। ভর বলতে সঠিক কি বুঝি তা পরে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) আলোচনা করা হবে।

দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরকে **মৌলিক রাশি** (fundamental quantities) এবং তাদের একককে **মৌলিক একক** (fundamental units) বলা হয়। আর এই তিনটি মৌলিক একক থেকে উদ্ভূত আর সব একককে **লব্ধ একক** (derived units) বলা হয়। যেমন, ঘনত্বের একক পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে একটি লব্ধ একক, ভরের একক পাউণ্ড আর দৈর্ঘ্যের একক ফুট থেকে উদ্ভূত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে,

(ক) বিভিন্ন ভৌত রাশির জন্য বিভিন্ন একক বা একই রাশির জন্য বিভিন্ন একক ব্যবহার করলেও এদের অধিকাংশই লব্ধ একক। লব্ধ এককগুলি কয়েকটিমাত্র মূল একক থেকে উদ্ভূত। বলবিদ্যায় মৌলিক রাশি তিনটি। আমরা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর এই তিনটিকে নিয়ে থাকি। প্রযুক্তি-বিদেরা কিন্তু দৈর্ঘ্য, সময় ও বলকে (force) মৌলিক রাশি হিসাবে নেন।

(খ) প্রতিটি মূল রাশির জন্যই একটি করে স্ট্যাণ্ডার্ড বা মানক চাই। মানকটির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কমিটির উপর। এ ধরনের 'ওজন ও মাপের' (weights and measures) আন্তর্জাতিক কমিটি রয়েছে। মূল মানকটিকে **প্রাথমিক মানক** (primary standard) বলে।

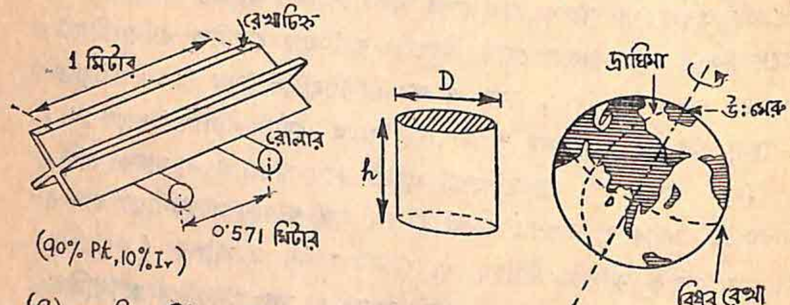
(গ) প্রাথমিক মানকের সমান, গুণিতক (multiple) বা ভগ্নাংশ (fraction) মাপার সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি থাকবে। এরকম সর্বজনস্বীকৃত

বিশেষ কোন পদ্ধতিতে প্রাথমিক মানকের অনুরূপ দ্বিতীয় স্তরের মানক (secondary standards) তৈরি করা হয়ে থাকে। এই দ্বিতীয় স্তরের মানক বা এদের সঙ্গে তুলনা করে নির্মিত সাধারণ মানকই সকলে ব্যবহার করে। তুমি যে ফুটরুলটি ব্যবহার কর সেটাও এভাবে তৈরী।

(ঘ) মূল মানকটির সমান, তার কোন গুণিতক বা তার কোন ভগ্নাংশকে একক হিসাবে নেওয়া যায়। যেমন মূল এককটি যদি ফুট হয়, তবে তার $\frac{1}{12}$ অংশটিকে একক ধরে হয়েছে ইঞ্চি একক এবং 5280 গুণকে একক ধরে হয়েছে মাইল একক।

3 এককের বিভিন্ন পদ্ধতি (Systems of units)

মৌলিক একক আর তাদের থেকে উদ্ভূত যাবতীয় লব্ধ একক নিয়ে হয় **একটি এককের পদ্ধতি** (System of units)। পৃথিবীর সর্বত্রই সাধারণভাবে দুটি এককের পদ্ধতি প্রচলিত :—(ক) দশমিক বা মেট্রিক পদ্ধতি (metric system) এবং (খ) বৃটিশ পদ্ধতি (British system)। বৃটিশ পদ্ধতিটি বৃটেন, কমনওয়েলথ দেশগুলি এবং আমেরিকাতে হাটে-বাজারে, কলকারখানায় বা ব্যবসাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে পৃথিবীর সর্বত্র এখন মেট্রিক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশ কিছুদিন হল ভারতবর্ষেও সব রকম কাজের জন্য আইন করে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মেট্রিক পদ্ধতিকে **আন্তর্জাতিক পদ্ধতিও** (International system) বলা হয়।



(a) প্রাথমিক মিটার ; বিশেষ আধার ও রাখার ব্যবস্থা লক্ষণীয়

(b) প্রাথমিক কিলোগ্রাম স্তম্ভের উচ্চতা = ব্যাস।

(c) ঘূর্ণমান পৃথিবী একবার ঘুরবার গড় সময় = গড় সৌর দিবস।

Fig. 1.2

(ক) **মেট্রিক পদ্ধতি :**—মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মানক হল **আন্তর্জাতিক প্রামাণিক মিটার** (International prototype metre), ভরের মানক হল **আন্তর্জাতিক প্রামাণিক কিলোগ্রাম** (International prototype kilogram) এবং সময়ের মানক হল **ঘূর্ণমান পৃথিবী** (rotating earth) (Fig. 1.2)।

দৈর্ঘ্যের মানক : আন্তর্জাতিক প্রামাণিক মিটার :—ভূপৃষ্ঠের কোন দ্রাঘিমা বরাবর বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত দূরত্বের এক কোটি ভাগের এক ভাগকে **এক মিটার** (1 metre বা m) ধরা হবে 'ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থা' (International Bureau of Weights and Measures) থেকে এটা স্থির করার পর ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 1889 খৃস্টাব্দে প্রামাণিক মিটারটি তৈরি করা হয়। 90% প্ল্যাটিনাম ও 10% ইরিডিয়ামের সঙ্কর ধাতুর একটা দণ্ডের উপর আড়াআড়ি-ভাবে দুটি সূক্ষ্ম দাগ এই উদ্দেশ্যে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে $0^{\circ}C$-এ ঐ দুটি দাগের মধ্যে দূরত্ব হয় 1 মিটার (Fig. 1. 2 a)। পরে অবশ্য দেখা গেছে যে এই প্রামাণিক মিটার দিয়ে মাপলে বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত দূরত্ব হয় 1 কোটি 2 হাজার 88 মিটার। উদ্দেশ্য যা ছিল, প্রামাণিক মিটারটি তার থেকে একটু অন্য রকম হলেও, ওটাকে আর বদলানো হয়নি। প্রথম তৈরী এই মিটারটিকেই প্রামাণিক মিটার হিসাবে সযত্নে রাখা হয়েছে।

মিটারের ভগ্নাংশ ও গুণিতকের সমান আরও অনেক একক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন :—

মিটারের ভগ্নাংশ	$\frac{1}{10}$	মিটার = 1 ডেসিমিটার	
	$\frac{1}{100}$	মিটার = 1 সেন্টিমিটার	(cm)
	$\frac{1}{1000}$	মিটার = 1 মিলিমিটার	(mm)
	$\frac{1}{10^6}$	মিটার = 1 মাইক্রোমিটার	
মিটারের গুণিতক	10	মিটার = 1 ডেকামিটার	
	100	মিটার = 1 হেক্টোমিটার	
	1000	মিটার = 1 কিলোমিটার	(km)
	10^6	মিটার = 1 মেগামিটার	

ভরের মানক : আন্তর্জাতিক প্রামাণিক কিলোগ্রাম :—ঐ একই আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্থির করা হয়েছিল যে, যে উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব

সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ 4^{o} সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং সাধারণ চাপে 1000 ঘন সেন্টিমিটার (cubic centimetre বা c. c.) জলের ভরকে **এক কিলোগ্রাম** (1 kilogram বা kg) ধরা হবে। এই উদ্দেশ্যে 90% Pt, 10% Ir ধাতুর একটা নিরেট স্তম্ভ (cylinder) বানানো হয়, যার ভর উপরে বর্ণিত জলের ভরের সমান (Fig. 1.2 b)। পরে দেখা গেছে যে, এই প্রামাণিক কিলোগ্রামটি ঐ রকম 1000 সি. সি. জলের থেকে অল্প ভারী, লক্ষ ভাগে 3 ভাগের মত। তা হলেও এটাকেই মূল প্রামাণিক কিলোগ্রাম হিসাবে ধরা হয়।

4^{o} সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 1 কিলোগ্রাম জলের আয়তন, অতএব, 1000 সি. সি-র থেকে বেশী ; বস্তুত এই আয়তন হল 1000.028 সি. সি.। 4^{o} সেন্টিগ্রেডে 1 কিলোগ্রাম জলকে **1 লিটার** (1 litre) বলে। কাজেই 1 লিটার = 1000·028 ঘন সেন্টিমিটার। **1 লিটার 1000 সি. সি-র সমান, প্রচলিত এই ধারণাটি ঠিক নয়,** যদিও সাধারণ কাজকর্মের জন্য পার্থক্যটা খুবই নগণ্য।

কিলোগ্রামের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে **গ্রাম** (gram বা gm) বলে। গ্রামের ভগ্নাংশ বা গুণিতক নিয়ে অন্যান্য এককগুলি হল :—

গ্রামের ভগ্নাংশ	$\frac{1}{10}$	গ্রাম = 1 ডেসিগ্রাম
	$\frac{1}{100}$	গ্রাম = 1 সেন্টিগ্রাম
	$\frac{1}{1000}$	গ্রাম = 1 মিলিগ্রাম (mg)
	$\frac{1}{10^{6}}$	গ্রাম = 1 মাইক্রোগ্রাম (μg)
গ্রামের গুণিতক	10	গ্রাম = 1 ডেকাগ্রাম
	100	গ্রাম = 1 হেক্টোগ্রাম
	1000	গ্রাম = 1 কিলোগ্রাম (kg)

সময়ের মানক : ঘূর্ণমান পৃথিবী :—পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরছে। ফলে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আপাতদৃষ্টিতে সূর্য দিনে একবার **আকাশের মধ্যরেখাকে** (celestial meridian) অতিক্রম করে। পর পর দুবার অতিক্রম করার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে **সৌর দিবস** (solar day) বলে। সারা বৎসরে সৌর দিবস মোটামুটিভাবে একই থাকে। তবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার (elliptical) পথে ঘুরছে বলে সারা বৎসরে সৌর দিবসের সময়ে কিছু হেরফের হয়। সারা

বৎসরের সৌর দিবসের গড় সময়কে **গড় সৌর দিবস** বলে। গড় সৌর দিবসের 86,400 ভাগের এক ভাগকে সেকেণ্ড (second বা sec.) বলে। সময়ের অন্যান্য প্রচলিত এককগুলি হল :—

1 মিনিট (minute বা min.) = 60 সেকেণ্ড

1 ঘণ্টা (hour বা hr.) = 60 মিনিট

অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় 1 গড় সৌর দিবস বা 1 দিন।

মেট্রিক প্রণালীতে দুটি এককের পদ্ধতি প্রচলিত। এর মধ্যে **সি. জি. এস্.** (C. G. S.) বা **সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড পদ্ধতিটি** অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য **সেন্টিমিটারে** (cm), ভর **গ্রামে** (gm) এবং সময় **সেকেণ্ডে** (sec.) মাপা হয়। দ্বিতীয়টি হল **এম্. কে. এস্.** (M. K. S.) বা **মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেণ্ড** পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাশির এককগুলি প্রচলিত **ব্যবহারিক এককের** (practical units) সমান হওয়ায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে বেশ সুবিধা হয়। ফলে পদ্ধতিটি সাম্প্রতিক কালে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিতে অবশ্য এখনও সি. জি. এস্. পদ্ধতিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

(খ) **বৃটিশ পদ্ধতি** :—বৃটিশ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মানক **প্রামাণিক গজ** (prototype yard বা yd.), ভরের মানক **প্রামাণিক পাউণ্ড** (prototype pound বা lb.), এবং সময়ের মানক **ঘূর্ণমান পৃথিবী**। প্রামাণিক গজটি একটি ব্রোঞ্জের দণ্ড, আর প্রামাণিক পাউণ্ডটি একটি প্ল্যাটিনাম স্তম্ভ। দুটিই লণ্ডনে সযত্নে রক্ষিত। বর্তমানে অবশ্য গজ ও পাউণ্ড বলতে বোঝায়

1 গজ = 0·9144 মিটার

1 পাউণ্ড = 0·4535924277 কিলোগ্রাম

গজের ভগ্নাংশ ও গুণিতক নিয়ে যে সমস্ত একক রয়েছে তারা হল

$\frac{1}{3}$ গজ = 1 ফুট (ft.) = 12 ইঞ্চি (inch)

এবং 1760 গজ = 1 মাইল (mile)

পাউণ্ড থেকে লব্ধ এককগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

$\frac{1}{16}$ পাউণ্ড = 1 আউন্স (ounce বা oz.)

এবং 2240 পাউণ্ড = 1 টন (ton)

গজ, পাউণ্ড, ইত্যাদি মানকের উপর নির্ভর করে যে এককের পদ্ধতিটি প্রচলিত তার নাম **এফ্ পি এস্** (F. P. S.) বা **ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড** পদ্ধতি। মেট্রিক পদ্ধতিগুলির মত এক্ষেত্রেও সময়ের একক হল সেকেণ্ড।

অনেক দেশেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বৃটিশ পদ্ধতি এখনও ব্যবহৃত হয়। কাজেই বৃটিশ ও মেট্রিক এককগুলির মধ্যে সম্বন্ধটা মনে না রাখলে চলে না। **যেগুলি মনে রাখতে হবে তারা হল :—**

1 ফুট = 30·48 সেন্টিমিটার ≃ 30·5 সে. মি.

1 মাইল = 1·609 কিলোমিটার ≃ 1·6 কিলোমিটার

1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম ≃ 454 গ্রাম

1 কিলোগ্রাম = 2·205 পাউণ্ড ≃ 2·2 পাউণ্ড

4. বিভিন্ন ভৌত রাশি ও তাদের একক (Different physical quantities and their units)

কোন ভৌত রাশির সংজ্ঞায় বলা থাকে ঐ ভৌত রাশিটি মৌলিক রাশিগুলির উপর কিভাবে নির্ভর করে। ভৌত রাশিটির সঙ্গে মৌলিক রাশিগুলির সম্পর্কটা এককের কোন্ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে না। যেমন, ঘনত্বের সংজ্ঞা হল ভর প্রতি ঘন এককে ; কাজেই ঘনত্বের একক C. G. S. পদ্ধতিতে হবে গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে, M. K. S. পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম প্রতি ঘন মিটারে এবং F. P. S. পদ্ধতিতে পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে। ধরা যাক, মৌলিক এককগুলি হল— দৈর্ঘ্য L, ভর M এবং সময় T। তাহলে আয়তনের একক হবে L^3 এবং ঘনত্বের একক হবে M/L^3। যে-কোন এককের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন ঘনত্বের একক M/L^3-ই থাকবে। ভৌত রাশির সংজ্ঞাটি থেকে রাশিটির একককে এভাবে সূত্রাকারে লিখতে পারলে যে-কোন এককের পদ্ধতিতেই রাশিটির একক কি হবে তা পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি বিশেষ ভৌত রাশির কথা ১১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে কয়টি ভৌত রাশির কথা বলা হল তার মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে হয়ত তোমার এখনও পরিচয় হয় নি। তার জন্য ঘাবড়ে যেও না। এদের সঙ্গে ধীরে ধীরে তোমার পরিচয় হবে। দরকারী কথাটি হল, ভৌত রাশির সংজ্ঞাটি জানলেই তুমি তার এককটি কি হবে তা বলতে পারবে। যেমন,

ভৌত রাশি	সংজ্ঞা	সূত্র	C.G.S. পদ্ধতিতে একক	বিশেষ নাম
(i) ক্ষেত্রফল		L^2	cm^2	
(ii) বেগ (velocity)	একক সময়ে সরণের পরিবর্তন	L/T	cm/sec	
(iii) ত্বরণ (acceleration)	একক সময়ে বেগের পরিবর্তন	$\frac{L}{T}/T$	cm/sec^2	
(iv) ভরবেগ (momentum)	ভর × বেগ	$M\,L/T$	gm-cm/sec	
(v) বল (force)	একক সময়ে ভরবেগের পরিবর্তন	$\frac{ML}{T}/T$	$gm\text{-}cm/sec^2$	ডাইন (dyne)
(vi) কোণ (angle) রেডিয়ান মাপে	বৃত্তচাপ/ব্যাসার্ধ	L/L	—	রেডিয়ান
(vii) কার্য (work)	বল × দূরত্ব	$\frac{ML}{T^2}L$	dyne-cm	আর্গ (erg)
(viii) ক্ষমতা (power)	একক সময়ে কার্যের পরিমাণ	$\frac{ML^2}{T^2}/T$	erg/sec	ওয়াট (watt)

কার্যের সংজ্ঞাটি তোমাকে বলা হয়েছে। এখন যদি M. K. S. পদ্ধতিতে কার্যের এককটি কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তবে তুমি চোখ বুজে বলে দিতে পারবে যে এককটি kg-m^2/sec^2। এটির একটি বিশেষ নামও আছে। তা হল **জুল** (Joule)।

5. মাপার যন্ত্র (Measuring devices)

কোন ভৌত রাশি মাপতে গেলে অর্থাৎ তার এককের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে লাগে মাপার যন্ত্র। যেমন দৈর্ঘ্য মাপতে লাগে স্কেল, ভর মাপতে তুলাযন্ত্র, আর সময় মাপতে ঘড়ি।

(ক) **সাধারণ স্কেল** (ordinary scale) ঃ—দৈর্ঘ্য মাপার জন্য।

দৈর্ঘ্য মাপার নানা রকম যন্ত্র আছে। তার মধ্যে পরীক্ষাগারে সবচেয়ে সহজলভ্য হল সাধারণ স্কেল। এই স্কেল পাতলা কাঠ বা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী, চওড়ায় প্রায় 1 ইঞ্চি। নানা দৈর্ঘ্যের স্কেল পাওয়া যায়, যেমন, 100 সে-মি লম্বা **মিটার স্কেল**, 50 সে-মি **আধামিটার স্কেল**, আর 12 ইঞ্চি লম্বা **ফুট স্কেল**। স্কেলের দুই ধার **সরল** (straight) এবং সমান্তরাল। দুই ধার বরাবর দুরকম মাপে দাগ কাটা থাকে, এক ধারে ইঞ্চির হিসাবে আর অপর ধারে সেন্টিমিটারের হিসাবে। ইঞ্চির ঘর 8 ভাগ, 10 ভাগ বা 16 ভাগে ভাগ করা থাকে, আর সেন্টিমিটারের ঘরগুলি দশ ভাগে অর্থাৎ মিলিমিটারে ভাগ করা থাকে (Fig. 1.3)।

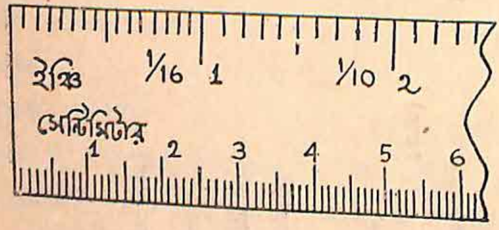


Fig. 1.3 সাধারণ স্কেল

ধরা যাক, AB দৈর্ঘ্যটি মাপতে হবে (Fig. 1.4)। AB বরাবর স্কেলটি রাখ। AB রেখার A ও B প্রান্ত দুটি, স্কেলের দুটি বিন্দুর সঙ্গে মিলবে। স্কেলে ঐ দুটি বিন্দু কোথায় আছে দেখ। স্কেলে ঐ বিন্দু দুটির মান L_1 ও L_2 হলে AB রেখার দৈর্ঘ্য হল ঐ দুটি পাঠের (reading) অন্তর অর্থাৎ ($L_2 - L_1$)। Fig. 1.4-এ A প্রান্তটি সেন্টিমিটার স্কেলের 0তে এবং

B প্রান্তটি 3·4 সেন্টিমিটারে রয়েছে। অতএব AB-র দৈর্ঘ্য 3·4 সে-মি। A ও B প্রান্ত দুটি স্কেলের কোন্ কোন্ বিন্দুর সঙ্গে মিলেছে সেটা ঠিকভাবে জানতে হবে। স্কেলের ধারগুলি খুব পাত্‌লা হয় না বলে, চোখটা কোথায় রেখেছ তার উপর এটা নির্ভর করে। যেমন, চোখ যখন Eতে অর্থাৎ স্কেলের ধার ও AB রেখার সঙ্গে যখন তুমি লম্বভাবে দেখছ

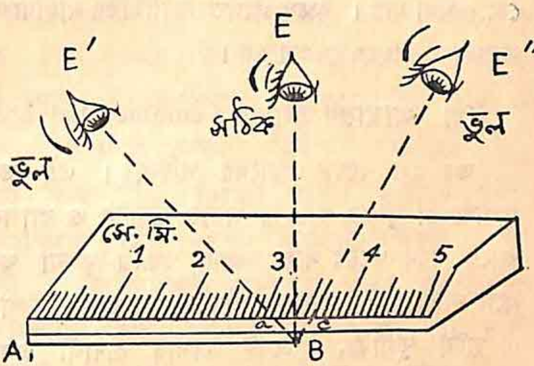


Fig. 1.4

তখন B বিন্দুটি স্কেলের b বিন্দু অর্থাৎ 3·4 সে-মি-এর সঙ্গে মিলেছে। চোখ E′-এ থাকলে a বিন্দুর সঙ্গে (3·1 সে-মি) এবং চোখ E″তে থাকলে c বিন্দুর সঙ্গে (3·6 সে-মি) মিলবে। কাজেই তেরছাভাবে দেখলে পাঠে ভুল হবে।

সাধারণ স্কেল দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে মাপা সম্ভব নয়। যত্ন নিয়ে এবং সাবধানে মাপলে ভুলের পরিমাণ 0·5 মিলিমিটারের বেশী হয় না।

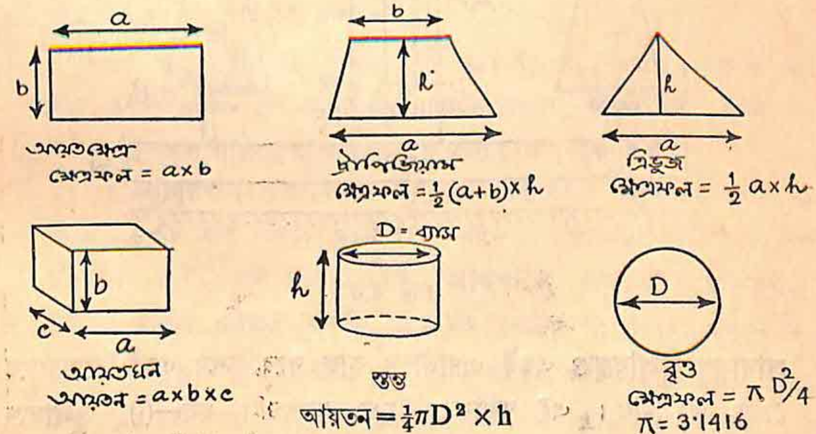


Fig. 1.5

সাধারণ স্কেল দিয়ে যে শুধু দৈর্ঘ্যই মাপা যায় তা নয়। সরল জ্যামিতিক আকৃতির ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও বস্তুর আয়তনও স্কেল দিয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মেপে বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে জ্যামিতির সাহায্যও নিতে হয়। Fig. 1.5-এ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

(খ) **সাধারণ তুলাযন্ত্র** (common balance)—ভর মাপার জন্য।

ভর হল বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ। এই ভর মাপতে লাগে তুলাযন্ত্র। তুলাযন্ত্র বা তুলার ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক। তুলাযন্ত্র দিয়ে জানা আছে এমন ভরের সঙ্গে অজানা ভরটির তুলনা করা হয়। জানা ভরটিকে বলে বাটখারা। কয়লার আড়তে মস্ত বড় দাঁড়িপাল্লা আর স্বর্ণকারের নিক্তি এ দুটিই তুলাযন্ত্র, দুটিতেই মাপার প্রণালী এক। পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত

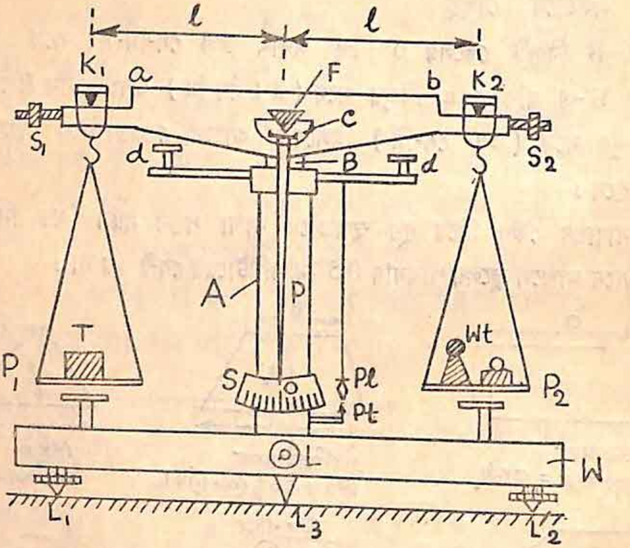


Fig 1.6

সাধারণ তুলাযন্ত্রও একই প্রণালীতে কাজ করে, তবে একটু বিশেষভাবে তৈরী, এই মাত্র। এই তুলাযন্ত্রের মুখ্য অংশগুলি হল—(i) **তুলাদণ্ড** (the balance beam) : এটি একটি লম্বা ধাতুদণ্ড ab (Fig. 1.6)।

এই দণ্ডের **ঠিক মাঝখানে** একটি ইস্পাতের ত্রিভুজাকৃতি **ক্ষুরধার** (knife edge) F শক্ত করে লাগানো। তুলাদণ্ডটি আসলে একটি **লিভার** (lever) আর ক্ষুরধারটি তার **আলম্বের** (fulcrum) কাজ করছে। তুলাদণ্ডটিকে কাঁধে নিয়ে ক্ষুরধারটি দাঁড়িয়ে আছে একটি **অ্যাগেট** (agate) ফলক C-এর উপর। তুলাদণ্ডটি ক্ষুরধারের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে এদিক-ওদিক দুলতে পারে। ক্ষুরধারের দুদিকে তুলাদণ্ডের দুই অংশকে তার **বাহু** (arm) বলে। সাধারণ তুলাদণ্ডে বাহু দুটি সমান (equal-arm) নেওয়া হয়। অ্যাগেট ফলকটি B দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। B দণ্ডটি A স্তম্ভের মধ্যে ঢোকানো। L চাবিটি ঘুরিয়ে B দণ্ডটিকে ওঠানো-নামানো যায়। L চাবিটি ঘুরিয়ে B দণ্ডটিকে উপরে উঠালে তুলাদণ্ডটি নির্বাধায় (freely) দুলতে পারে। চাবিটি ঘুরিয়ে B দণ্ডটিকে নামালে তুলাদণ্ডটি দুটি ধারক (support) d, d-র উপর বসে পড়ে, আর দুলতে পারে না ; স্থির হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় B দণ্ডটি নামানো থাকে।

(ii) **তুলাপাত্র** (Scale pan) :—তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে, আলম্ব থেকে সমান দূরত্বে, দুটি সমান **ওজনের পাত্র** (P_1, P_2) ঝুলানো থাকে দুটি স্টিরপের (K_1, K_2) সাহায্যে। পাত্র দুটিকে **তুলাপাত্র** বলা হয়। সাধারণত বাঁ দিকের পাত্রে যে জিনিসটি মাপা হবে সেটি এবং ডান দিকের পাত্রে বাটখারা রাখা হয়।

(iii) তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে **দুটি স্ক্রু** (S_1, S_2) থাকে। যখন তুলা-পাত্র দুটিই খালি এবং তুলাদণ্ডটির দুলতে কোন বাধা নেই তখন S_1, S_2কে **ঠিকমত ঘুরিয়ে তুলাদণ্ডটিকে অনুভূমিক করা হয়।**

(iv) **সূচক** (Pointer) :—তুলাদণ্ডটি অনুভূমিক (horizontal) হল কি না দেখার জন্য একটা সূচক (P) থাকে। সূচকটি একটি সরু, লম্বা, সূঁচালো কাঁটা, তুলাদণ্ডের **ঠিক মাঝখানে লম্বভাবে** আটকানো। সূচকের নীচের প্রান্তটি একটি অনুভূমিক স্কেলের গা ঘেঁষে এদিক-ওদিক চলাচল করতে পারে। যখন A স্তম্ভটি উল্লম্ব (vertical) তখন সূচকটি ঠিক ঠিক উল্লম্ব হলেই কেবল সূচকের সূঁচালো প্রান্তটি স্কেলের শূন্য (0) থাকবে। সূচকটি উল্লম্ব হওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে তুলাদণ্ডটিরও অনুভূমিক হওয়া।

(v) **ওলন দড়ি** (Plumb line) :—স্তম্ভটি উল্লম্ব হল কি না দেখার জন্য একটি ওলনদড়ি (Pl) ও একটি সূচক (Pt) আছে। স্তম্ভটি পাটাতন W-এর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকানো। লেভেলিং স্ক্রু (Levelling screws) L_1 ও L_2কে ঘুরিয়ে **যখন ওলনের সূক্ষ্ম প্রান্তটি সূচকের সূক্ষ্ম প্রান্তের সঙ্গে ঠিক এক হয় তখন স্তম্ভটি উল্লম্ব হয়।**

বাইরের ধূলাবালি থেকে রক্ষা করার জন্য একটা ঢাকনাওয়ালা কাঁচের বাক্সে সমস্ত তুলাযন্ত্রটিকে রাখা হয়।

(vi) **ওজন বাক্স** (Weight box) :—10 মিলিগ্রাম থেকে 100 গ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের বাটখারা এই পৃথক বাক্সটিতে থাকে। এটিও তুলাযন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

কোন ভর মাপার আগে তুলাযন্ত্রটিকে উপযুক্ত অবস্থায় আনতে হবে। এজন্য প্রথমে স্তম্ভটি উল্লম্ব করতে হবে এবং তারপর, তুলাপাত্র দুটির খালি অবস্থায় তুলাদণ্ডটিকে অনুভূমিক করতে হবে। এবার পরিমেয় বস্তুটি বাম পাত্রে রেখে ডান পাত্রে প্রমাণ বাটখারা দিতে দিতে যখন তুলাদণ্ডটি আবার অনুভূমিক হবে তখন প্রমাণ বাটখারার মোট ভর হবে বস্তুটির ভরের সমান (Fig. 1.7)।

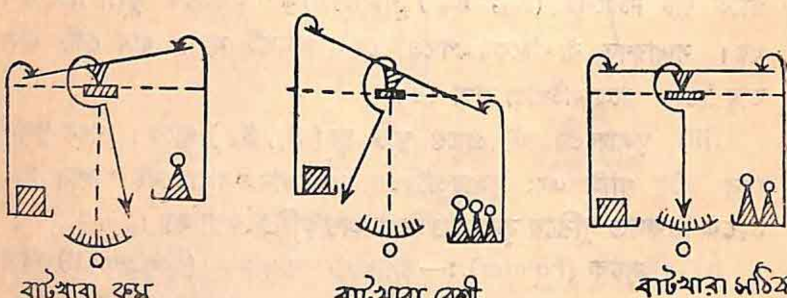


Fig. 1.7

সঠিকভাবে তৈরী একটা তুলাযন্ত্রকে তখনই **ভালো** বলা হবে যখন সেটা **সুবেদী** (sensitive) ও **সুস্থিত** (stable)। বস্তু আর বাটখারার মধ্যে ভরের সামান্য পার্থক্য হলেই যদি তুলাদণ্ডটি অনুভূমিক অবস্থা থেকে অনেকখানি সরে যায় তবে সেটা সুবেদী। আর যদি স্থির অবস্থা থেকে

সরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলে এটা খুব তাড়াতাড়ি আবার স্থির অবস্থায় ফিরে আসে, তবে এটা সুস্থিত। সাধারণ তুলাযন্ত্রটি মোটামুটি ভালো হলে, যত্নসহকারে মাপলে এবং বস্তুটির ওজন বেশী না হলে, ভুলের পরিমাণ 10 মিলিগ্রামের বেশী হয় না।

(গ) মেজারিং সিলিণ্ডার বা পরিমাপ চোঙ্ (measuring cylinder)—আয়তন মাপার জন্য।

তরলের আয়তন মাপা হয় পরিমাপ চোঙ্ দিয়ে। এটি একটি লম্বা কাঁচের চোঙ্। চোঙের গায়ে দাগ কাটা থাকে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার বা c.c.তে। 50 সি. সি., 100 সি. সি., 250 সি. সি., ইত্যাদি বিভিন্ন আয়তনের পরিমাপ চোঙ্ পাওয়া যায়।

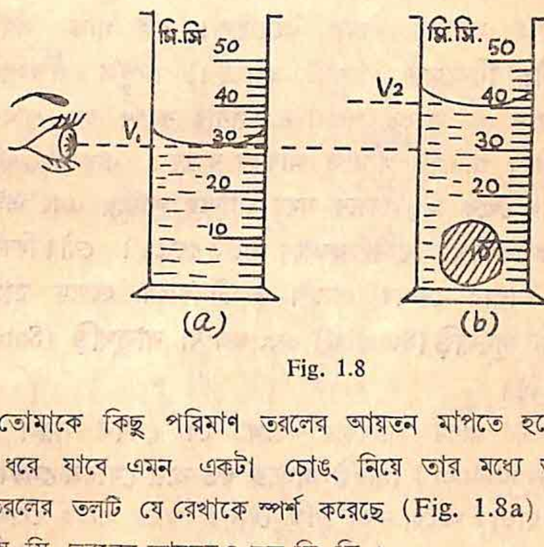


Fig. 1.8

ধর, তোমাকে কিছু পরিমাণ তরলের আয়তন মাপতে হবে। তরলের পুরোটাই ধরে যাবে এমন একটা চোঙ্ নিয়ে তার মধ্যে তরলটা ঢেলে দাও। তরলের তলটি যে রেখাকে স্পর্শ করেছে (Fig. 1.8a) সেই রেখার মান যত সি. সি. তরলের আয়তনও তত সি. সি.।

সরল জ্যামিতিক আকৃতির কোন বস্তুর আয়তন মোটামুটিভাবে মাপতে সাধারণ স্কেলই যথেষ্ট। বস্তুটির আকৃতি অসম হলে আর স্কেল দিয়ে হবে না। তখন পরিমাপ চোঙের সাহায্যে আয়তন মাপা যেতে পারে। মাপতে হলে চোঙে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত জল নাও। এবার বস্তুটিকে ঐ জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। এর ফলে যতটুকু জল আগের নির্দিষ্ট উচ্চতা

ছাড়িয়ে উপরে উঠবে বস্তুটির আয়তন হল তার সমান (Fig. 1.8b)। এমন তরল নিতে হবে যার মধ্যে বস্তুটি গলে না। চিনির আয়তন মাপতে জল ব্যবহার করলে হবে না।

সাধারণ তুলাযন্ত্রে ভরটি মেপেছ আর আয়তন মেপেছ সাধারণ স্কেলে বা পরিমাপ চোঙ্ দিয়ে। কাজেই বস্তুটির ঘনত্বও তোমার জানা হয়ে গেল, কেননা, বস্তুটির ঘনত্ব=বস্তুটির ভর/বস্তুটির আয়তন।

(ঘ) **ঘড়ি** (clock)—সময় মাপার জন্য।

যে যন্ত্র দিয়ে সময়ের অন্তর **(time interval)** মাপা যায় তার নাম ঘড়ি। **কোন ভৌতরাশি যদি নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তিত হয় তবে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করেই সময়ের অন্তর মাপা সম্ভব।** সূর্য যে পৃথিবীকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে প্রদক্ষিণ করে এ ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের নজরে এসেছিল। এই গতি লক্ষ্য করেই মানুষের **সৌর দিবসের** ধারণাটি হয়েছে। নির্ভুল ও অনিবার্যভাবে দিনের পর রাত ও রাতের পর দিন আসার কারণ হল পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে সুনির্দিষ্ট গতিতে আবর্তন করছে। প্রকৃতির এই ঘড়িটি স্মরণাতীত কাল থেকে নির্ভুলভাবে সময় জানিয়ে আসছে এবং এই ঘড়িটিই সময়ের মানক হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সৌর দিবসের চেয়ে ছোট সময় মাপার যে-সব প্রচেষ্টা প্রাচীনকালে হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **সূর্যঘড়ি** (Sundial) এবং জল বা **বালুঘড়ি** (Sand clock Fig. 1.9 b, c)।

গ্যালিলিওই প্রথম আবিষ্কার করেন যে **কোন সরল দোলক** (simple pendulum) **নির্দিষ্ট সময়ে যত বার দোলে সেটা নির্দিষ্ট।** সরল দোলক ছাড়াও আরো নানা রকম দোলক আছে যাদের দোলনের হার নির্দিষ্ট। সূর্যদিবসের ভগ্নাংশ সময় মাপার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যন্ত্র হল **দোলক** (pendulum)। যে দোলক একদিনে 86,400 বার দোলে সেটা দিয়ে সেকেণ্ড মাপা যায়। এভাবেই সেকেণ্ড সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যত রকম ঘড়ি বর্তমানে ব্যবহৃত হয় তাদের প্রায় সবগুলিতেই রয়েছে এরকম কোন না কোন দোলক। দেওয়াল ঘড়িতে থাকে **যৌগিক দোলক** আর রিস্টওয়াচে থাকে **ব্যালান্স হুইল** (Fig. 1.9 e,f)।

ঘড়ির মূল দোলকটি নির্দিষ্ট হারে আন্দোলিত হতে থাকলে একাধিক কাঁটা (pointer) একটা ডায়ালের (dial) উপর ঘুরতে থাকে। বিভিন্ন কাঁটা বিভিন্ন গতিতে ঘোরে। একটা আধুনিক ঘড়িতে সাধারণত থাকে, বিভিন্ন সময় নির্দেশ করতে, **ঘণ্টার কাঁটা** (hour hand), **মিনিটের কাঁটা** (minute hand) এবং **সেকেণ্ডের কাঁটা** (second hand)। ডায়ালে কাঁটাগুলি কতটুকু সরল তা দেখে সময়ের অন্তর মাপা হয়।

মূল দোলকটি যাতে থেমে না যায়, দুলতেই থাকে, সেজন্য সেটাকে সাহায্য করতে ঘড়িতে থাকে একটা গুটিয়ে রাখা **স্প্রিং** (spring)। নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্প্রিংটিকে একটা চাবি দিয়ে গুটিয়ে দিতে হয়। একে বলে ঘড়িকে **দম দেওয়া** (winding)।

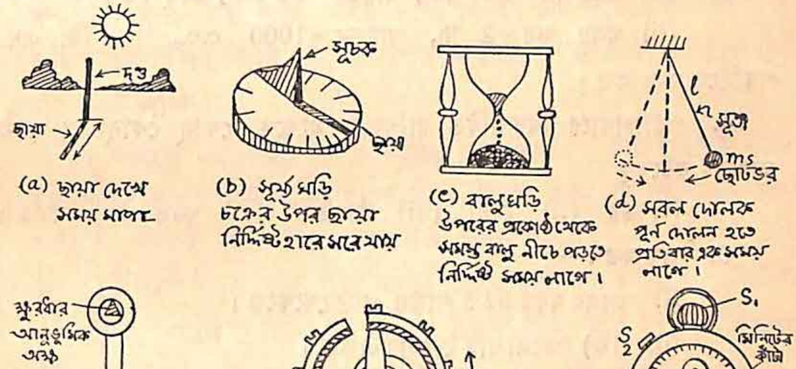


Fig. 1.9

সেকেণ্ডের থেকেও কম সময় ভালোভাবে মাপতে পরীক্ষাগারে **স্টপ ঘড়ি** (stop watch) ব্যবহার করা হয়। স্টপ ঘড়ি দিয়ে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত মাপা যায়। সূক্ষ্মতর সময় মাপার বহু প্রণালী এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি দিয়ে মাইক্রোসেকেণ্ড $\left(\frac{1}{10^6}\right.$ সেকেণ্ড$\left.\right)$ বা তার চেয়েও কম সময় যথেষ্ট নির্ভুলভাবে মাপা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. একক কাকে বলে? মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের মানক কি? মানকের প্রয়োজনীয়তা কি?

2. (i) দৈর্ঘ্য = 10 cm, প্রস্থ = 5 cm, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

(ii) দৈর্ঘ্য = 10 cm, প্রস্থ = 3 cm, উচ্চতা = 3 cm, আয়তঘনের আয়তন কত?

(iii) দৈর্ঘ্য = 2 m, প্রস্থ = 10 cm, উচ্চতা = 2 cm, আয়তঘনের আয়তন কত?

(iv) উচ্চতা = 1 ft, ব্যাস = 20 cm, স্তম্ভের আয়তন কত?

3. (i) বস্তুর ভর = 500 gm, আয়তন = 80 c.c., ঘনত্ব কত?

(ii) বস্তুর ভর = 2 lb, আয়তন = 1000 c.c., সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ঘনত্ব কত?

4. পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত রাশিগুলি মাপতে কোন্ কোন্ যন্ত্র তুমি ব্যবহার করবে?

(i) ভর (ii) দৈর্ঘ্য (iii) আয়তন (iv) ঘনত্ব (v) দ্রুতি।

5. শুদ্ধ কর :—

(i) জলের ঘনত্ব 62·5 পাউণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে।

(ii) (ক) কিলোগ্রাম দৈর্ঘ্যের একক।

(খ) লিটার ঘনত্বের একক।

(গ) 1000 সি. সি. প্রায় 1 কিলোগ্রামের সমান।

(iii) এফ্. পি. এস. পদ্ধতিতে মূল একক হল সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ড।

6. তুমি তোমার দেহের আয়তন কত জানতে চাও। কিভাবে নির্ণয় করবে?

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ ও শক্তি নিয়েই জগৎ

1. পদার্থ ও শক্তি (matter and energy)

কোটি কোটি নীহারিকা, সূর্য, চন্দ্র, তারা, এই পৃথিবীর মাটি আর সমুদ্রের জল, নিঃশ্বাসের বায়ু আর অগ্নির তাপ, যে শব্দ শুনি এবং যে আলোয় দেখি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই দুটি মাত্র উপাদানে তৈরী। তার একটি হল **পদার্থ,** আর অন্যটি **শক্তি**।

যে কাগজে এই বইটি ছাপা হয়েছে তা পদার্থ। বইটি **ছুঁয়েই** ধারণা হল যে এই কাগজ বস্তুটি কঠিন, হাতে নিয়ে বোঝা গেল যে কাগজের **ওজন** আছে। স্পষ্টতই বইটি কিছু **জায়গাও** জুড়ে রয়েছে। ঐ কাগজের এক টুকরা টেবিলের উপর রেখে দিলে সেটা নিজে থেকে নড়ে না। ফুঁ দিলে তবে নড়ে। আস্তে ফুঁ দিলে অল্প সরে, জোরে ফুঁ দিলে সরে বেশী। অবস্থার পরিবর্তনে বস্তুর এই যে দ্বিধা, তারই আর এক নাম **জাড্য** (inertia) (Fig. 2.1)। কাগজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তার ওজন আছে, জাড্য আছে, কিছু **ব্যাপ্তিও** (extension) আছে। যার এ সমস্ত ধর্ম রয়েছে তাই **পদার্থ**।

ফুৎকারে যে বায়ু কাগজের উপর গিয়ে পড়ল তাও পদার্থ। পদার্থের সবগুলি গুণই বায়ুতে বর্তমান। তবে বায়ু কাগজের মত এত জমাট বাঁধা কঠিন বস্তু নয়। বায়ুরও যে ওজন আছে তা নিক্তি দিয়ে বিশেষ উপায়ে মেপে প্রমাণ করা যায়। হাল্কা গ্যাসে ভর্তি বেলুন আকাশে ওড়ে। এই প্লবতার (buoyancy) কারণ হল বায়ুর ওজন। একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাও। এবার হাত দিয়ে চাপলেই ভিতরে বাতাসের অস্তিত্ব টের পাবে। কাজেই বায়ু খুব পাতলা হলেও যে পদার্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে আলোতে তুমি বইটি পড়ছ তার কোন ওজন নেই। একটা বেলুনের মধ্যে টর্চ জেলে যতই আলো ফেল না কেন বেলুনটা আলোতে ভর্তি হয়ে ফুলে উঠবে না। ধোঁয়া-ভর্তি ঘরে টর্চ জ্বাললে আলোর পথটি স্পষ্ট



Fig 2.1 অবস্থার পরিবর্তনে পদার্থের এই দ্বিধার আর এক নাম জাড্য।

দেখতে পাবে। জোরে ফুঁ দিয়ে আলোর ঐ গুচ্ছকে সরাবার চেষ্টা কর। দেখবে ধোঁয়ার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে কিন্তু আলো তার পথ থেকে একটুও সরবে না। কাজেই আলো বাতাসের মত খুব হাল্কা হয়ে যাওয়া কোন পদার্থ নয়। তাপ, শব্দ ইত্যাদিরও ধর্ম পদার্থের মত নয়। এরা পদার্থ থেকে পৃথক। বিজ্ঞানবিদ্ এদের নাম দিয়েছেন **শক্তি**।

'শক্তি কি?' এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব এখনও আমাদের জানা নেই। তবে শক্তি **কি করে** সেটা আমরা জানি। **শক্তি করে কাজ। প্রকৃতিতে সব রকম পরিবর্তনের পিছনেই কোন না কোন শক্তি কাজ করছে।**

কাগজের টুকরাটাতে ফুঁ দেওয়াতে সেটা একটু সরল, এখানে পদার্থের **অবস্থানের** (position) পরিবর্তন হয়েছে। কাগজের টুকরাটিতে আগুন ধরিয়ে দাও। কাগজটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখানে পদার্থের **প্রকৃতিগত** পরিবর্তন হচ্ছে। অবস্থানগত বা প্রকৃতিগত, কোন রকম পরিবর্তনই পদার্থ নিজের থেকে করতে পারে না। এই পরিবর্তন আনতে গেলে লাগে শক্তি। কাগজটিকে ছাই করতে আগুনের তাপের প্রয়োজন হয়েছে।

2. ভর ও ভার (mass and weight)

পদার্থের একটি প্রধান ধর্ম হল তার জাড্য। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে কোন জিনিস যদি স্থির অবস্থায় থাকে তবে সেটা কখনই নিজের থেকে নড়ে না। নড়াতে গেলেই হয় ধাক্কা দিতে হয়, নয়ত টানতে হয় (Fig. 22)। চলন্ত বস্তুকে থামাতে গেলে, তার গতিবেগ হ্রাস করতে গেলে বা তার দিক পরিবর্তন করতে গেলেও

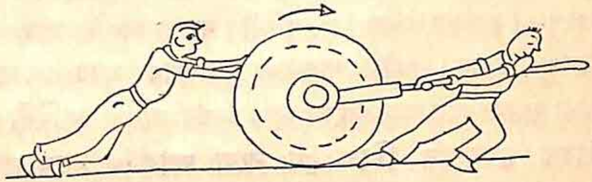


Fig 2·2 স্থির অবস্থা থেকে নড়াতে গেলে ধাক্কা বা টান লাগে।

ধাক্কা বা টানের প্রয়োজন হয়। একটা রোলারকে অল্প নড়াতে গেলে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিতে হয়, কিন্তু একটা ছোট মার্বেলকে সমান দূর পর্যন্ত নড়াতে গেলে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সামান্য ধাক্কাই যথেষ্ট। রোলার এবং মার্বেল দুটির বেলাতেই স্থির অবস্থা থেকে নড়াতে গেলে ধাক্কা লাগে। রোলারের ক্ষেত্রে বেশী ধাক্কা লাগে, মার্বেলের ক্ষেত্রে কম। কাজেই রোলারের জাড্য বেশী এবং মার্বেলের জাড্য কম। কোন জিনিসের জাড্য তার পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রোলারে পদার্থের পরিমাণ বেশী—তাই তার জাড্য বেশী, মার্বেলে পদার্থের পরিমাণ কম, তাই তার জাড্য কম। **কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণ কতটুকু বা জাড্য কতটুকু তার পরিমাপ হল তার ভর** (mass)।

এই ভর মাপার উপায় কি? **একটা উপায় হল ধাক্কা**। ধাক্কা দিলে বস্তুটি বিচলিত হবে এবং বস্তুতে বেগ জন্মাবে। **ঠিক সমান** ধাক্কা বা বল প্রয়োগ করা হলেও, সমান সময়ে যে বস্তুতে অল্প বেগ জন্মে তার ভর বেশী, আর যে বস্তুতে বেশী বেগ জন্মে তার ভর কম।

এভাবে নির্দিষ্ট সময় ধরে ঠিক সমান বল প্রয়োগ করে তার ফলে উৎপন্ন বেগ মেপে ভরের তুলনা বা পরিমাপ করা সম্ভব।

ভর মাপার দ্বিতীয় উপায় হল তার **ভার** (weight) বা ওজন মাপা। এই ভার বা ওজন বলতে কি বুঝি ? একটা থান ইটকে হাতে ধরে রাখতে বেশ ক্লেশ হয়। আমরা বলি, থান ইটটি ভারী। থান ইটটিকে ছেড়ে দিলেই সেটা ভূপতিত হয়। বায়ুশূন্য স্থানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সব বস্তুই ভূপতিত হয়। এই ভূপতনের কারণ হল মাধ্যাকর্ষণ (gravitation)। পৃথিবী সব বস্তুকেই তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণের পরিমাণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে এবং ভূকেন্দ্র হতে বস্তুর দূরত্বের উপর নির্ভর করে। **পৃথিবী কোন বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে যে বলে আকর্ষণ করে তাই ঐ বস্তুর ভার বা ওজন**। যে বস্তুকে যত বেশী বলে আকর্ষণ করে তার ভারও তত বেশী, বহন করতে গেলে সেটা তত বেশী ভারী বলে বোধ হয়।

সমবাহু তুলাযন্ত্রের (equal arm balance) দুই পাল্লায় দুটি বস্তু চাপানো হল। পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য দুটি বস্তুই ভূকেন্দ্র অভিমুখে যাবার চেষ্টা করবে। যে পাল্লার উপর এই আকর্ষণ বল বেশী অর্থাৎ যে পাল্লার ভার বেশী, সেই দিকটাই ভূপৃষ্ঠের দিকে বেশী ঝুঁকবে। যখন তুলাদণ্ডটি অনুভূমিক তখন দুই পাল্লার উপর **আকর্ষণ সমান** অর্থাৎ **বস্তু দুটির ভার সমান**। তুলাযন্ত্র বলে দেয় দুটি বস্তুর ভার সমান কি না।

দুটি বস্তুকে এভাবে তুলাযন্ত্রে মেপে দেখলাম তাদের ভার সমান। এবার বস্তু দুটির উপর সমান বল প্রয়োগ করলে দেখা যায় (যদিও পরীক্ষাটি নিখুঁতভাবে করাটা খুব সহজ নয়) বস্তু দুটিতে সমান বেগ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বস্তু দুটির ভরও সমান। বস্তু দুটি যে পদার্থেরই হোক না কেন, **ভার সমান হলে দেখা যায় ভরও সমান হয়**। বহু পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথমে গ্যালিলিও ও পরে নিউটন এই তথ্যটি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। কাজেই তুলাদণ্ডে যখন ভার সমান হল, তখন ভরও সমান হল একথা বুঝতে হবে। ভর মাপার প্রথম পদ্ধতি

থেকে তুলাযন্ত্রে অনেক সহজে এবং সূক্ষ্মভাবে ভর মাপা যায়। এজন্য ভর মাপতে তুলাযন্ত্রই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বস্তুর ভর স্থান-নিরপেক্ষ। কোন বস্তুর কলকাতায় যতটুকু ভর, লণ্ডনেও ততটুকুই ভর। পৃথিবী থেকে চাঁদে নিয়ে গেলেও ভরের কোন তারতম্য হবে না। **অবস্থান-ভেদে কিন্তু ভারের তারতম্য হয়।** ভূকেন্দ্র থেকে যত দূর যাওয়া যায় বস্তুর ভার তত কমে। কলকাতায় কোন বস্তুর যতটুকু ভার, দার্জিলিং-এ তার চেয়ে একটু কমবে; চাঁদে গেলে ভার অনেক গুণ কম হবে (Fig. 2.3)। চাঁদে বস্তুটিকে নিয়ে গেলে পৃথিবীর আকর্ষণ কমে $\frac{1}{90}$ ভাগ হয়ে যাবে। তবে চাঁদও বস্তুটিকে আকর্ষণ করবে চাঁদের কেন্দ্রের দিকে। চাঁদে বস্তুটির ভার হবে মূলত চাঁদের আকর্ষণের জন্য। এই ভার পৃথিবীতে বস্তুটির ভারের $\frac{1}{7}$ ভাগ মাত্র।

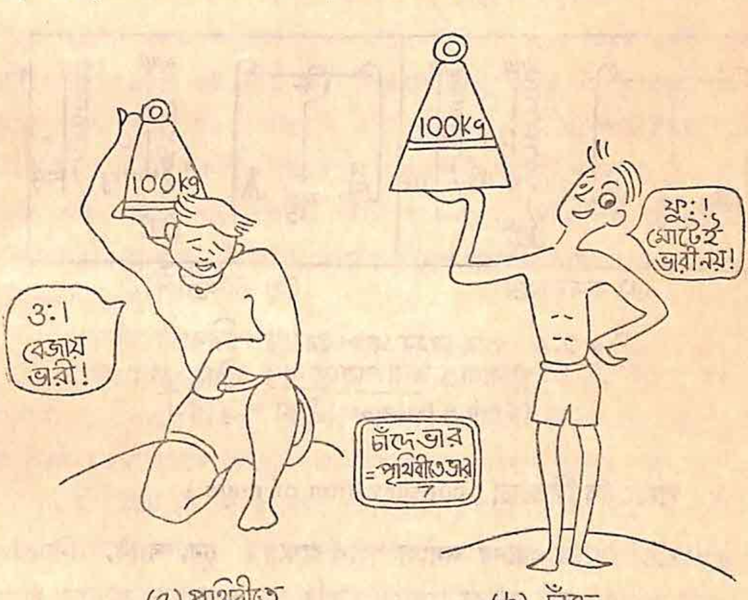
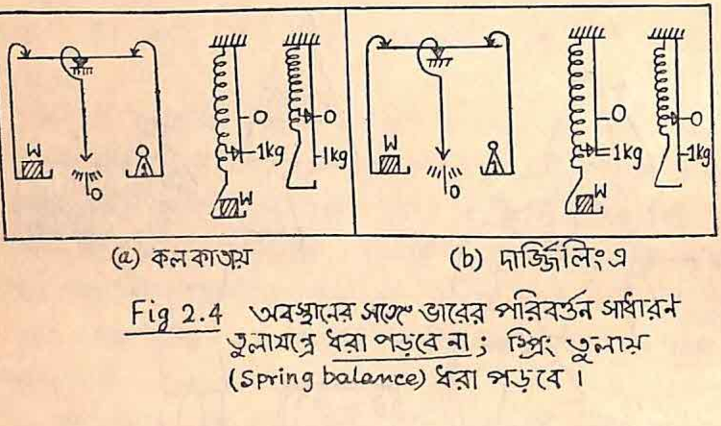


Fig 2·3 অবস্থান ভেদে ভারের তারতম্য হয়।

কোন বস্তুর ভার কমল কি বাড়ল সেটা সাধারণ তুলাযন্ত্রে ধরা সম্ভব নয়। ধর, কলকাতায় কোন বস্তুকে সাধারণ তুলাযন্ত্রে ওজন করা

হচ্ছে। ওজনে বস্তুর ভর এক কিলোগ্রাম পাওয়া গেল। বস্তুটিকে দার্জিলিং-এ নিয়ে গিয়ে আবার তুলাযন্ত্রে ওজন করলে এক কিলোগ্রাম বাটখারাই লাগবে কেননা বস্তুর ভর অবস্থান-নিরপেক্ষ। দার্জিলিং-এ নিলে এক কিলোগ্রাম বস্তুটির ভার যতটুকু কমবে, এক কিলোগ্রাম বাটখারার ভারও ঠিক ততটুকুই কমবে এবং তুলাদণ্ডটি অনুভূমিকই থাকবে। ফলে, এভাবে তুলাদণ্ডে ওজন করে বস্তুটির ভারে কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না তা ধরা যাবে না। ভারের পরিবর্তন স্প্রিং তুলাযন্ত্রে ধরা পড়বে (Fig. 2.4)। এই তুলায় কোন বস্তু চাপালে তার ভারের জন্য স্প্রিং-এর উপর যে টান পড়বে তাতে স্প্রিংটি লম্বায় প্রসারিত হবে। প্রসারণের পরিমাণ দেখে ভার কতটুকু তা বলা যাবে। স্প্রিং তুলাদণ্ডে অবশ্য ভারের এই পরিবর্তন খুব সূক্ষ্মভাবে মাপা সম্ভব নয়। ভারের পরিবর্তন সূক্ষ্মভাবে মাপার আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে।



(a) কলকাতায় (b) দার্জ্জিলিংএ

Fig 2.4 অবস্থানের সঙ্গে ভারের পরিবর্তন সাধারন তুলাযন্ত্রে ধরা পড়বে না; স্প্রিং তুলায় (Spring balance) ধরা পড়বে।

3. পদার্থের নিত্যতা (conservation of mass)

প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য পদার্থ রয়েছে। চুন, বালি, সিমেণ্ট, দুধ, চিনি, মাখন, কাঠ, কয়লা, লোহা, মাথার চুল, পশম আর মানুষের দাঁত এরা সবাই পদার্থ। সকলেরই ওজন রয়েছে, ব্যাপ্তিও আছে। এই পৃথিবীতে কিম্বা মহাকাশে যত পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত মোট 105টি মৌলিক পদার্থ (elements) পাওয়া গিয়েছে। এই সব মৌলের মিশ্রণ (mixtures) কিম্বা যৌগ (compounds) থেকেই অন্য সব বস্তু তৈরী হয়েছে।

প্রকৃতিতে অহরহ পদার্থের রূপান্তরও ঘটছে। দুধ থেকে যখন ছানা হয়, মাখন থেকে ঘি অথবা যখন কয়লা পুড়ে ছাই হয়, তখন আমরা পদার্থের রূপান্তরই প্রত্যক্ষ করি। পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক লাভোয়শিয়া (Lavoisier, 1743-1794) বলেছেন যে, **"কোন কিছুই সৃষ্টি করা যায় না, এবং সব প্রক্রিয়াতেই পদার্থের পরিমাণ প্রক্রিয়ার পূর্বে ও পরে একই থাকে ; শুধু মাত্র পদার্থের রূপান্তর ঘটে।"** লাভোয়শিয়ার এই উক্তিটি পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উক্তিটিকে **পদার্থের নিত্যতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of conservation of mass) বলা হয়।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য রকম বলে। এক টুকরা কাগজে আগুন ধরালে ওটা জ্বলেপুড়ে শেষ হয়। জ্বলার সময় কিছু আলো আর তাপ পাওয়া যায়। জ্বলার শেষে অবশিষ্ট থাকে কিছু ছাই আর ধোঁয়া। এক টুকরা পাতলা লোহা ফেলে রাখলে দেখা যায় সেটা মরচে পড়ে কিছুটা মোটা আর ভারী হয়ে গেছে। এক টুকরা সাদা ফস্‌ফরাস নিয়ে তাকে একটু গরম করলে তাতে আগুন ধরে যায়। জ্বলবার সময় যথেষ্ট সাদা ধোঁয়া আর উজ্জ্বল সাদা আলো হয়। জ্বলার পর ঐ ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এরকম অজস্র ঘটনা থেকে সাধারণভাবে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পদার্থের পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে থাকে, কখনও কখনও পদার্থ শক্তিতে, যেমন, আলো বা তাপে পরিণত হয়।

নিত্যতার সূত্রটি কতটুকু ঠিক তা যাচাই করতে গেলে এই সব পরীক্ষা আরো সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। এই সব পরীক্ষায় প্রক্রিয়াটি ঘটাতে হবে পুরোপুরি বন্ধ এমন কোন পাত্রে যাতে পাত্রটি থেকে কোন পদার্থ বাইরে চলে যেতে না পারে। একটা 250 সি. সি.-র গোল তলাওয়ালা ফ্লাস্কের ভিতর ছোট একটুকরা শুকনো ফস্‌ফরাস নাও। ফ্লাস্কের মুখটি শক্ত করে রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দাও। ফ্লাস্কটি ওজন কর। এবার ফ্লাস্কের তলের দিকে যেখানে ফস্‌ফরাসের টুকরাটি রয়েছে সে জায়গাটা আগুনের শিখার উপর ধরে গরম করতে থাক, যতক্ষণ না ফস্‌ফরাসে আগুন ধরে যায়। ফস্‌ফরাসের দহনক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেলে ফ্লাস্কটিকে ঠাণ্ডা হতে দাও। ঠাণ্ডা হবার পর ফ্লাস্কটিকে আবার ওজন করলে দেখবে, **ওজন একই রয়েছে।**

লাভোয়শিয়া, লানডোণ্ট (Landolt), হান্‌লে (Hanley) প্রমুখ বহু বিজ্ঞানবিদ্ এই সূত্রটির যাথার্থ্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখেছেন। **অত্যন্ত সুবেদী নিক্তি দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে ওজন করেও দেখা গেছে** যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই পদার্থের পরিমাণে কোন হেরফের ধরা পড়ে না। পার্থক্য যদি বা কিছু হয় তবে তার পরিমাণ 1/1000,000,000 অর্থাৎ একশ কোটি ভাগের এক ভাগ-এর থেকে কম। কাজেই **সব রকম সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে** পদার্থের পরিমাণ প্রক্রিয়ার আগে ও পরে **সঠিকভাবে একই** (exactly same) থাকে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

4. শক্তির বিভিন্ন রূপ (different forms of energy)

প্রকৃতিতে শক্তিও রয়েছে বিভিন্ন রূপে। ঘড়ির মূল স্প্রিংকে গুটিয়ে নিলে তাতে কিছু শক্তি বর্তায়, কেননা এর ফলে স্প্রিংটি ঘড়ির কাঁটাগুলিকে ঘোরাতে সক্ষম হয়। এই শক্তি স্থিতিশক্তি। কোন বস্তু মাটি থেকে কিছু উঁচুতে থাকলে মাটিতে নেমে আসার সময় অন্য কোন বস্তুকে উপরে তুলতে পারে (Fig. 2.5)। মাটি থেকে উপরে থাকার জন্য বস্তুটিতে যে শক্তি বর্তেছে তাও **স্থিতিশক্তি** (potential energy)। কোন চলন্ত বস্তুও তার গতির জন্য কিছু শক্তির অধিকারী হয়, কেননা চলন্ত অবস্থায় অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে সে দ্বিতীয় বস্তুটিকেও গতিশীল করে তুলতে পারে (Fig. 2 6)। পেরেক ঠুকতে হাতুড়ীকে জোরে চালাতে হয়। গতির জন্য বস্তুতে যে শক্তি বর্তায় তা **গতিশক্তি** (kinetic energy)। স্থিতি ও গতি দুই ধরনের শক্তিকে বলা হয় **যান্ত্রিক শক্তি** (mechanical

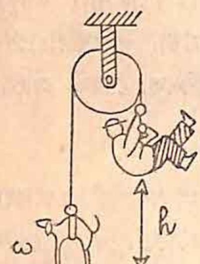


Fig 2.5: নীচে নামবার সময় W অন্য কোন বস্তু (ω) কে উপরে ওঠাতে পারে।

energy)। সব বস্তুরই তার স্থিতি বা গতির অবস্থার জন্য কিছু যান্ত্রিক শক্তি থাকে।

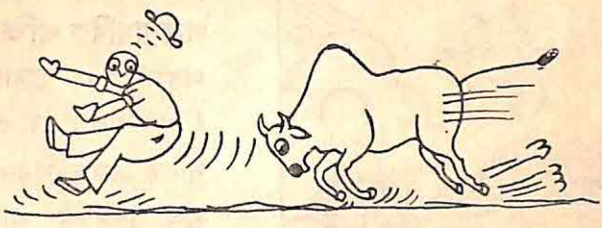


Fig 2.6 গতিশীল বস্তু অন্য বস্তুতে গতি সঞ্চার করতে পারে।

প্রকৃতিতে অহরহ যত রকম শক্তির বিকাশ দেখা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল **বিকিরণ শক্তি** (radiant energy)। তাপ (heat) ও আলো (light) বিকিরণ শক্তি। শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হল সূর্য। সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি অবিরাম বিকিরিত হচ্ছে তার খুব ছোট্ট একটি অংশই কেবল পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। সূর্যের **তাপে** সমুদ্রের জল বাষ্প হয়; বাষ্প পরিণত হয় মেঘে, আর মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জল আর সূর্যের আলো গ্রহণ করেই গাছপালা বাঁচে। আর এই গাছপালার উপরেই নির্ভর করে বেঁচে আছে অন্য সব প্রাণী। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে সূর্য থেকে পাওয়া বিকিরিত শক্তির উপর (Fig. 2.7)।

পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাকে বলে **রাসায়নিক শক্তি** (chemical energy)। এই শক্তি তাপ, আলো বা আকস্মিক বিস্ফোরণের আকারে প্রকাশ পায়, যেমন কয়লা পোড়ালে পাই তাপ। কোন বস্তুতে তড়িৎ সঞ্চার করলে সেটা অন্য বস্তুকে কাছে টেনে আনে। তড়িৎ থাকায় বস্তুটিতে **তড়িৎ শক্তি** (electrical energy) বর্তায়। কোন পদার্থ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের ফলেও তড়িৎ শক্তি পাওয়া যায়। চুম্বক লোহাকে টানে। চুম্বকের **চৌম্বক শক্তি** (magnetic energy) রয়েছে।

কোন শব্দ যখন আমাদের কানে প্রবেশ করে তখন আমরা **শব্দশক্তি** (sound energy) সম্বন্ধে সচেতন হই। বাজ পড়লে অনেক সময় তবলার চাঁদি ফেটে যায়। এছাড়া রয়েছে **পারমাণবিক শক্তি** (atomic energy)। পরমাণুর কেন্দ্রে (nucleus) যে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চিত রয়েছে সে কথাটা আমরা মাত্র কিছুদিন আগে বুঝতে পেরেছি। পরমাণুর কেন্দ্রকে টুকরা করলে বা একাধিক পরমাণুর কেন্দ্রকে এক করে দিলে বিপুল শক্তি প্রকাশ পায়।

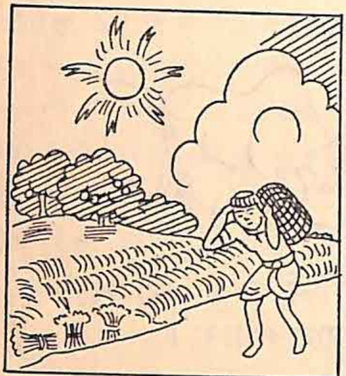


Fig 2·7 পৃথিবীতে প্রানের অস্তিত্ব সূর্য্যের বিকীরিত শক্তির উপর নির্ভর করে।

সূর্য আদি সমস্ত নক্ষত্রের বিকিরিত শক্তিও আসছে এই **পরমাণুকেন্দ্রিক শক্তি** (nuclear energy) থেকে। অ্যাটম বোমার (atom bomb) বিধ্বংসী ক্ষমতার পিছনেও ঐ একই শক্তি কাজ করছে। মানুষ অবশ্য এই বল্গাহীন শক্তির রাশ টেনে ধরতে শিখেছে। তার উদাহরণ হল **পারমাণবিক চুল্লী** (atomic reactor)।

5. শক্তির রূপান্তর (transformation of energy) ও শক্তির নিত্যতা (conservation of energy)

প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাতেই আমরা শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করি। একটা খুঁটি পোতার যন্ত্রের (pile driver) কথাই ধর (Fig. 2.8 । দড়ি টেনে দুরমুশ Wকে বেশ কিছু উচ্চতায় ওঠানো হল। এবার দুরমুশটিকে ছেড়ে দিলে তার নীচের দিকে গতি বাড়তে থাকবে, ফলে গতিশক্তিও বাড়তে থাকবে। দুরমুশটি খুঁটির উপর সজোরে পড়লে খুঁটিটি মাটিতে কিছুটা ঢুকে যাবে। দুরমুশটির গতিশক্তি যে বাড়ছে **তা কিন্তু শক্তির সৃষ্টি নয়।** এখানে শক্তির রূপান্তর ঘটছে। দুরমুশটি যত নামছে, স্থিতিশক্তি তত কমছে, স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে গতিশক্তিতে,

কাজেই গতিশক্তি বাড়ছে। দুরমুশের গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে খুঁটির গতিশক্তিতে। ফলে খুঁটিটি মাটিতে ঢুকছে।

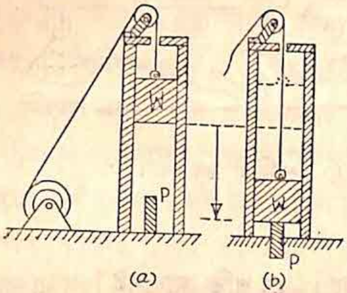


Fig 2.8 স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয়েছে গতিশক্তিতে। গতিশক্তি কোথায় গেল?



Fig 2.9 লোহাকে পিটলে সেটা গরম হয়ে ওঠে। এখানে যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েছে। যখন দুরমুশ ও খুঁটি দুটিই থেমে গেল, তখন তাদের গতিশক্তি কোথায় গেল? **এখানে শক্তি লোপ পায়নি,** রূপান্তরিত হয়েছে তাপশক্তিতে। তাপও যে শক্তিবিশেষ, যান্ত্রিক শক্তি যে তাপে রূপান্তরিত হয়, একথাটি প্রমাণ করেছেন রামফোর্ড, জুল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। হাতে হাত ঘষলে হাত দুটি গরম হয়ে ওঠে। হাতুড়ী দিয়ে একটা লোহাকে পিটতে থাকলে দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা গরম হয়ে উঠেছে (**Fig. 2.9**)। এসব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে তাপে।

ধর, তুমি কয়লা দিয়ে আগুন ধরালে। **রাসায়নিক শক্তি** রূপান্তরিত হবে, তুমি পাবে **তাপশক্তি**। এই তাপশক্তি দিয়ে জল ফুটিয়ে যে বাষ্প পাওয়া যাবে তাই দিয়ে পিস্টন ঠেলে যন্ত্রের চাকা ঘোরানো যাবে। অর্থাৎ এভাবে পাবে **যান্ত্রিক শক্তি**। এই যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে যদি ডায়নামো চালানো যায় তবে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হবে **তড়িৎশক্তিতে**। ঐ তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে হিটার জ্বালালে **তাপ** পাবে, আর বাতি জ্বালালে পাবে **আলো**। তড়িচ্চুম্বকের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে তড়িৎশক্তি রূপান্তরিত হবে **চৌম্বক শক্তিতে**। এই তড়িচ্চুম্বক যদি কোন লাউডস্পীকারের অংশ হয় তবে চৌম্বক শক্তি

রূপান্তরিত হবে যান্ত্রিক কম্পনে এবং এই কম্পন থেকে পাওয়া যাবে **শব্দশক্তি** (Fig. 2.10)।

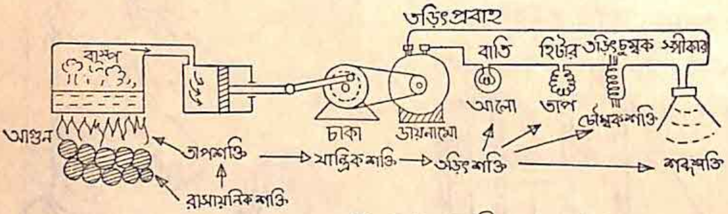


Fig 2.10 শক্তির রূপান্তর।

এই সমস্ত উদাহরণে একটা জিনিস লক্ষণীয়। যে শক্তি আদপেই ছিল না তা আমরা সৃষ্টি করতে পারি না। যে শক্তি ছিল তারই কেবল সদ্ব্যবহার করতে পারি। তড়িৎশক্তি যখন উৎপন্ন করি তখন তা করি অন্য শক্তির বিনিময়ে, তাকে রূপান্তরিত ক'রে।

তবে প্রকৃতিতে আমরা সাধারণত শক্তিকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হতে দেখি না। শক্তি কেবল শক্তিতেই রূপান্তরিত হয় বা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। যেখানে যেখানে শক্তির লাভ-ক্ষতি মেপে দেখা সম্ভব হয়েছে, সেখানেই দেখা গেছে যে একটি বস্তুর শক্তি হ্রাস পেলে অন্য কোন বস্তুর শক্তি ঠিক ততটা পরিমাণই বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের একটা দৃঢ় ধারণা গড়ে উঠেছে যে, **শক্তির সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই, বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ সব সময় একই থাকে।** এই তত্ত্বকেই **শক্তির নিত্যতার সূত্র** বলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা শক্তি ও পদার্থের পৃথক ও ভিন্ন অস্তিত্বেই কেবল বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে পদার্থও নিত্য, শক্তিও নিত্য। পদার্থ থেকে শক্তিতে এবং শক্তি থেকে পদার্থে রূপান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (1905 খৃঃ) জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) ঘোষণা করলেন যে পদার্থ ও শক্তি একই অস্তিত্বের দুটি ভিন্ন রূপ মাত্র, একটির পরিমাণ কমলে অপরটির পরিমাণ

বৃদ্ধি পায়। এই রূপান্তরের সময় পদার্থের পরিবর্তন M ও শক্তির পরিবর্তন E-র মধ্যে সম্বন্ধ হল,

$$E = Mc^2$$ (c = আলোর শূন্যে গতিবেগ)

এই সূত্রানুযায়ী প্রায় 3·5 টন ফস্‌ফরাস বাতাসে পোড়ালে তাপ ও আলো হিসাবে যতটুকু শক্তি উদ্ভূত হবে তার ফলে ভর হ্রাস পাবে মাত্র 1 মিলিগ্রাম। লাভোয়শিয়ারের পরীক্ষায় ভরের হ্রাস সেজন্য এতই নগণ্য ছিল যে কোন নিক্তির পক্ষেই তা ধরা সম্ভব ছিল না। আমরা এখনও পর্যন্ত এমন কোন পরীক্ষার কথা জানি না যেখানে আইনস্টাইনের এই সূত্রটি প্রযোজ্য নয়।

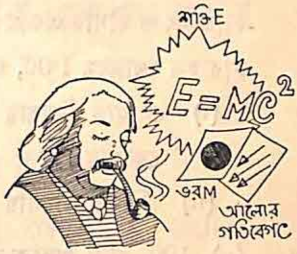


Fig 2.11 পদার্থ ও শক্তি একই অস্তিত্বের দুটি ভিন্ন রূপ।

আইনস্টাইনের এই আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানীরা শুধু জানতেন যে পদার্থে শক্তি সঞ্চিত করা যায় আবার পদার্থে সঞ্চিত শক্তি পদার্থ থেকে নিয়েও নেওয়া যায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে তার ফলে পদার্থের পরিমাণে কোন হেরফের হয় না। আইনস্টাইন দেখালেন যে যখন পদার্থে শক্তি জমা হয়, **তখন সেটা অতিরিক্ত ভরের আকার নেয়,** যখন শক্তি পদার্থ থেকে মুক্ত হয় তখন আবার পূর্বের রূপে ফিরে যায়। বর্তমানে আমরা বিশ্বাস করি যুগ্মভাবে **পদার্থ ও শক্তির নিত্যতার সূত্রে** (law of conservation of mass and energy) : 'বিশ্বে পদার্থ ও শক্তির মোট পরিমাণ সব সময় একই থাকে।'

প্রশ্নাবলী

1. ইট, কাঠ, লোহা, শব্দ, জল, দুধ, চিনি, আলো, মাখন, তাপ, স্লেট, পেন্সিল এদের মধ্যে কোন্‌টা পদার্থ, কোন্‌টা শক্তি? কিভাবে এদের চিনলে?
2. 10টি মটরশুটি ছাড়িয়ে পেলে 10টি খোসা আর 52টি মটরদানা অর্থাৎ ছাড়াবার আগে ছিল 10টি জিনিস, আর ছাড়াবার পরে সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে 62। এখন বলত

(i) আয়তন কি পাল্টেছে ?

(ii) তুলাযন্ত্রে ওজন করলে ভর কি বদলে গেছে দেখা যাবে ?

(iii) পদার্থের পরিমাণে কি কোন পরিবর্তন হয়েছে ?

3. একটা স্প্রিং তুলাদণ্ডে মেপে দেখা গেল যে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং ও দীঘায় এক খণ্ড লোহার উপর পৃথিবীর টানের আনুপাতিক হার হল যথাক্রমে 1·00, 0·98, 0·95 ও 1·04।

(i) লোহার টুকরার ওজন সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে কম কোথায় হবে ?

(ii) বিভিন্ন জায়গায় ঐ লোহার টুকরার ভর কি বিভিন্ন হবে ?

4. (a) 100 গ্রাম জলকে তার মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিশ্লিষ্ট করে দেখা গেল যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ 11·1 গ্রাম। তাহলে অক্সিজেনের পরিমাণ কত ?

(b) বাতাসে হাইড্রোজেন পোড়ালে হাইড্রোজেন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল হয়। 4 গ্রাম হাইড্রোজেন পুড়িয়ে জল করতে 140 গ্রাম বাতাস লাগল। উৎপন্ন জলের পরিমাণ কত ? বাতাসের যে অংশটা পোড়ায় অংশ গ্রহণ করল না তার পরিমাণই বা কত ?

———

তৃতীয় অধ্যায়

এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায়

1. অবস্থার পরিবর্তন (Change of State)

পদার্থের মোটামুটি তিন অবস্থা দেখা যায়—**কঠিন** (solid), **তরল** (liquid) ও **গ্যাসীয়** বা **বায়বীয়** (gaseous)। ইট কাঠের কঠিন অবস্থা, তেল জলের তরল অবস্থা, আর বায়ুর গ্যাসীয় অবস্থা। পদার্থের তিনটি অবস্থা বা দশার (state or phase) কথা বলা হল, কেননা **একই জড় পদার্থ এই তিন রূপই গ্রহণ করতে পারে।** অত্যধিক উষ্ণতায় বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যে-কোন পদার্থ এই তিন অবস্থার যে-কোন একটিতেই থাকতে পারে বিশেষ চাপ ও উষ্ণতায়। পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন বা দশান্তরপ্রাপ্তি (change of phase) ও ঘটে। সোনা রূপার মত কঠিন পদার্থও উত্তাপ পেলে তরল হয়, কর্পূরের মত কঠিন পদার্থ উবে গ্যাসে পরিণত হয়। প্রতিটি তরল কিম্বা কঠিন পদার্থকেই গ্যাসে পরিণত করা যায়, আবার প্রতিটি গ্যাসকেই তরল কিম্বা কঠিন অবস্থায় আনা সম্ভব। সাধারণ তাপ ও চাপে জল তরল কিন্তু শীতের দেশে জল জমে বরফ হয়। জল ফোটালে যে বাষ্প (steam) পাওয়া যায় তা বায়বীয় জল মাত্র। বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘাস পাতা বা অন্য কোন ঠাণ্ডা তলের সংস্পর্শে এসে শিশিরে পরিণত হয়।

যখন কোন পদার্থ কঠিন অবস্থা থেকে তরলে পরিণত হয় তখন এই অবস্থান্তরকে **গলন** (melting) বলে। এর বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তরল থেকে কঠিন হওয়াকে **কঠিনীভবন** (solidification বা freezing) বলে। তরল পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তনকে **বাষ্পীভবন** (vaporisation) এবং তার বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরলে পরিণত

হওয়াকে **তরলীভবন** (liquefaction) বা **ঘনীভবন** (condensation) বলে। অনেক কঠিন পদার্থই সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়, যেমন, আয়োডিন (iodine), ন্যাপথলিন, কর্পূর, নিশাদল, ফটকিরি, শুষ্ক বরফ (dry ice) ইত্যাদি। এভাবে কঠিন থেকে গ্যাসে পরিণত হওয়াকে **ঊর্ধ্বপাতন** (sublimation) বলে। গ্যাস থেকে সরাসরি কঠিন অবস্থায় পরিবর্তনকেও ঘনীভবনই বলা হয়। সব রকম শাস্তরেই তাপের শোষণ কিম্বা বর্জন হয়, কখনও কখনও আয়তনের পরিবর্তনও হয়।

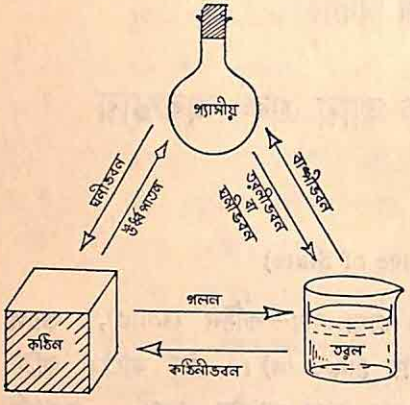


Fig 3.1 অবস্থার পরিবর্তন

2. **গলন** (melting) এবং **কঠিনীভবন** (freezing)

বরফ গলে জল হওয়া এবং জল জমে বরফ হওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব এবং এ দুটি পরীক্ষা থেকে সাধারণভাবে গলন ও কঠিনীভবন সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে।

1 নং পরীক্ষা : চার ভাগ বরফ ও এক ভাগ লবণের মিশ্রণকে **হিমমিশ্রণ** (freezing mixture) বলে। হিমমিশ্রণের উষ্ণতা 0°C থেকে কম, প্রায় -20°C-এর মত। একটি ছোট পাত্রে (beaker) কয়েকটুকরা বরফ নিয়ে পাত্রটিকে হিমমিশ্রণে রেখে দিলে তার উষ্ণতা 0°C-এর নীচে নেমে যাবে। এবার পাত্রটিকে হিমমিশ্রণ থেকে উঠিয়ে নিয়ে জলভর্তি একটি বড় পাত্রের মধ্যে রাখা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি থার্মোমিটার ছোট পাত্রের বরফের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হল (Fig. 3.2a)। জলের উষ্ণতা সর্বত্র সমান রাখার জন্য আন্দোলকটি (stirrer) মাঝে মাঝে নেড়ে, বড় পাত্রের জলকে বার্নারের আগুনে ধীরে ধীরে গরম করা হল। ঘড়িতে সময় এবং থার্মোমিটারে উষ্ণতা দেখা হল। ছোট পাত্রের

বরফের উষ্ণতা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। উষ্ণতা বেড়ে 0°C হলে পাত্রে জল দেখা যাবে অর্থাৎ বরফ গলতে শুরু করেছে। **যতক্ষণ না সমস্ত বরফ গলে জল হয় ততক্ষণ দেখা যাবে মিশ্রণের উষ্ণতা একই অর্থাৎ 0°Cই রয়েছে।** (একটা কাঁচের সরু রড দিয়ে মাঝে মাঝে মিশ্রণটিকে ভালো করে নেড়ে দিতে হবে।) বরফ সম্পূর্ণ গলে যাবার পর তরলের উষ্ণতা বাড়তে শুরু করবে। Fig. 3.2bতে পরীক্ষার ফলাফল লেখের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। **বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপে (1 atmos.) কোন কঠিন পদার্থ যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলে পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে পদার্থটির গলনাঙ্ক** (melting point বা m.p.) বলে। বরফের গলনাঙ্ক 0°C।

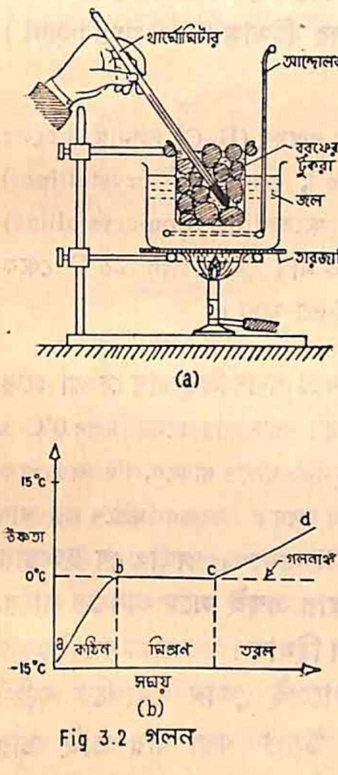


Fig 3.2 গলন

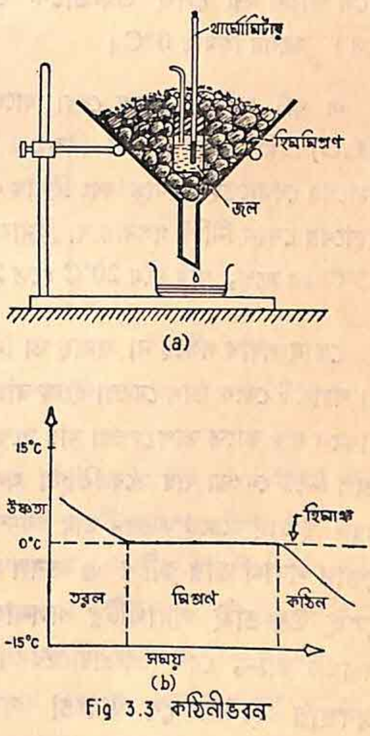


Fig 3.3 কঠিনীভবন

2 নং পরীক্ষা ঃ একটি পাত্রে কিছু পরিস্রুত জল নিয়ে, তাকে ভালো করে ফুটিয়ে, পরে ঠাণ্ডা করা হল। একটি ছোট কাঁচের মোটা টিউবে ঐ জল

কিছুটা নিয়ে টিউবের মুখ রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। ছিপির মধ্যে দুটি ছিদ্র দিয়ে একটি সরু কাঁচের নল (বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য) ও থার্মোমিটার (উষ্ণতা মাপার জন্য) ঢোকানো হল। একটি বড় ফানেলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ হিমমিশ্রণ নিয়ে তার মধ্যে টিউবটি রেখে চার দিক হিমমিশ্রণে ঢেকে দেওয়া হল (Fig. 3.3a)। ঘড়িতে সময় এবং থার্মোমিটারে উষ্ণতা মাপা হলে দেখা যাবে যে টিউবের ভিতরের জলের উষ্ণতা ক্রমশ কমছে। কমতে কমতে উষ্ণতা 0°C-এ এলে দেখা যাবে বরফ জমতে শুরু করেছে। **পুরোটা জমে বরফ না হওয়া পর্যন্ত দেখা যাবে যে উষ্ণতা একই অর্থাৎ 0°C-এই রয়েছে ;** এর পরে বরফের উষ্ণতা ধীরে ধীরে 0°C-এর নীচে নামতে থাকবে (Fig. 3.3b)। **সাধারণ চাপে যে উষ্ণতায় কোন তরল জমে কঠিন হয় সেই উষ্ণতাকে তরলের হিমাঙ্ক** (freezing point) বলে। জলের হিমাঙ্ক 0°C।

এ দুটি পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বরফের (H_2O) গলনাঙ্ক ও জলের (H_2O) হিমাঙ্ক একই। সব বিশুদ্ধ (pure), কেলাসিত (crystalline) পদার্থের বেলাতেই গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক এক। অকেলাসিত (non-crystalline) পদার্থের কোন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক থাকে না। মাখন গলে 28°C থেকে 33°C-এর মধ্যে, আর জমে 20°C হতে 23°C-এর মধ্যে।

কোন পদার্থ গলছে না জমছে তা নির্ভর করে পদার্থ টিতে তাপ দেওয়া হচ্ছে না পদার্থটি থেকে তাপ নেওয়া হচ্ছে তার উপর। বরফ আর জলের মিশ্রণ 0°C-এ থাকলে যদি তাতে তাপ দেওয়া যায় তবে কিছু বরফ গলতে থাকবে, যদি তার থেকে তাপ নিয়ে নেওয়া যায় তবে কিছুটা জল জমে যাবে। যতক্ষণ মিশ্রণে জল আর বরফ দুটোই রয়েছে ততক্ষণ তার উষ্ণতা 0°Cই থাকবে। **অর্থাৎ যে উষ্ণতায় কোন পদার্থ তার কঠিন ও তরল অবস্থায় একই সঙ্গে থাকতে পারে, সেই উষ্ণতাই পদার্থটির গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক।** গলনাঙ্কের কম উষ্ণতায় পদার্থটি কঠিন, বেশী উষ্ণতায় তরল। **কাজেই কোন পদার্থকে কঠিন অবস্থায় সর্বোচ্চ যে উষ্ণতা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায় তাই তার গলনাঙ্ক।**

3. স্ফুটন (boiling) ও বাষ্পায়ন (evaporation)

1 নং পরীক্ষায় বরফ গলে জল হয়ে যাবার পরও গরম করতে থাকলে জলের উষ্ণতা বাড়তে থাকে। বেশী উষ্ণতা পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্য পরীক্ষাটি একটু অন্যরকমভাবে করা হল। একটা বড় চ্যাপ্টা তলাওয়ালা গোল ফ্লাস্কে (flat bottomed round flask) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জল নিয়ে মুখটি শক্ত রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। ছিপিতে তিনটি ছিদ্র করে ছিদ্রগুলিতে একটি থার্মোমিটার, একটি নির্গমনল ও একটি আংশিক পারদপূর্ণ U নল বা চাপমান যন্ত্র (manometer) লাগানো হল (Fig. 3.4a)। ঘড়িতে সময় এবং থার্মোমিটারে উষ্ণতা দেখা হল। ফ্লাস্কটিকে ধীরে ধীরে গরম করা হলে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে জলের মধ্যে ছোট ছোট বুদবুদ ওঠে। অবশেষে জলের সব অংশ থেকেই এত বেশী বুদবুদ উঠতে থাকে যে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে আরম্ভ

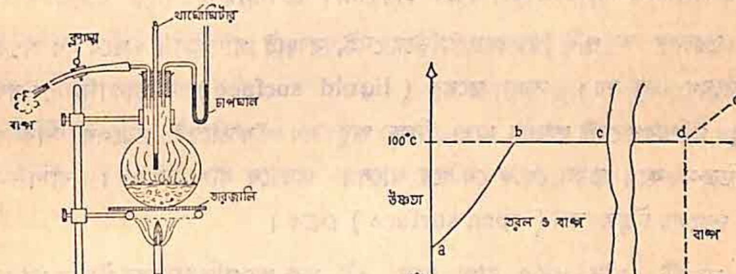


Fig 3.4 স্ফুটন।

করে। এই অবস্থাকে জলের **স্ফুটন** (boiling) বলে। **যতক্ষণ স্ফুটন চলতে থাকে ততক্ষণ তরলের উষ্ণতা একই থাকে** (Fig. 3.4b); এই সময় নির্গমনল দিয়ে প্রচুর বাষ্প বেরিয়ে আসতে থাকে। স্ফুটন বেশ কিছুক্ষণ চললে ফ্লাস্কের ভিতরে আর বায়ু থাকে না, বাষ্পে ভরে যায়। স্ফুটনের সময়ে চাপমানের দুই বাহুতেই পারদের উচ্চতা সমান থাকে অর্থাৎ ফ্লাস্কের ভিতরে বাষ্পের চাপ বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। **বায়ুমণ্ডলের চাপে যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলে স্ফুটন হয় তাকে তরলের স্ফুটনাঙ্ক** (boiling point বা b.p.) বলে।

কোন তরল যে কেবল তার স্ফুটনাঙ্কেই বাষ্পে (vapour) পরিণত হয় তা নয়। পুকুরের জল সারা বৎসর নিঃশব্দে শুকায়। ভিজে কাপড় মেলে দিলে শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই সেটা শুকিয়ে যায়। ঘরের মেঝে জল দিয়ে মুছলে কিছুক্ষণ পরেই শুকিয়ে যায়। অল্প তুলো স্পিরিট, পেট্রোল বা ইথারে ভিজিয়ে রেখে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তরলটি উবে যায়। এসব ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে সব তাপ ও উষ্ণতাতেই প্রতিটি তরল বাষ্পে পরিণত হয়। **তরল পদার্থের ধীরে ধীরে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হওয়াকে বাষ্পায়ন** (evaporation) বলে।

বাষ্পায়ন সাধারণত ধীর গতিতে হলেও কোন কোন তরলে যথেষ্ট দ্রুত হয়। এদের **উদ্বায়ী** (volatile) বলা হয়। পেট্রোল, ইথার ইত্যাদি উদ্বায়ী তরল। যার স্ফুটনাঙ্ক যত কম, সেটা তত উদ্বায়ী। ইথার (b.p. 35°C), অ্যালকোহল (b.p. 78°C) থেকে তাড়াতাড়ি উবে যায়।

তরলের অণুগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, সর্বদাই গতিশীল। তবে সব অণুর গতিবেগ এক নয়। তরল তলের (liquid surface) কাছাকাছি যে-সব অণুর গতিবেগ বেশী তাদের মধ্যে কিছু অণু সব উষ্ণতাতেই তরলের আকর্ষণ অতিক্রম করে তরল থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে বাষ্পায়ন হয়। বাষ্পায়ন হয় তরলের উন্মুক্ত তল (open surface) থেকে।

তরলটি কোন পাত্রে রাখা হলে, এই মুক্ত অণুগুলি তরলের উপরে ফাঁকা জায়গায় ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে করতে পাত্রের গায়ে এবং তরলের উন্মুক্ত তলে ধাক্কা খায়। এভাবে এই বাষ্পও পাত্রের গায়ে এবং তরল তলে কিছু চাপ প্রয়োগ করে। এই চাপকে **তরলের বাষ্পের চাপ** (vapour pressure of the liquid) বলে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বাষ্পের চাপ বাড়ে। **যখন তরলের বাষ্পের চাপ তরল তলে বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হয় তখন তরল ফুটতে থাকে।**

কাজেই কোন তরলের স্ফুটনাঙ্ক হল এমন একটি উষ্ণতা, যে উষ্ণতায় তরলের বাষ্পের চাপ বাইরের চাপের সমান।

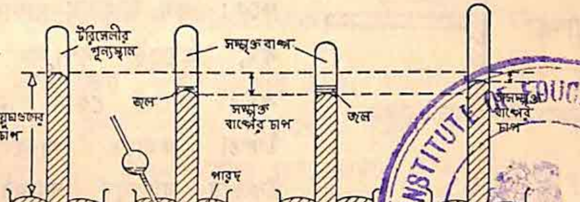
বাষ্পায়ন ও স্ফুটন দুটিতেই **বাষ্পীভবন** (vaporisation) হয়। তবে এ দুটির মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

(a) যে-কোন চাপে এবং যে-কোন উষ্ণতাতেই বাষ্পায়ন হয়। কোন নির্দিষ্ট চাপে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই স্ফুটন হয়।

(b) বাষ্পায়ন তরলের উপর তল থেকে হয়; স্ফুটনে বাষ্পীভবন হয় তরলের সব জায়গা থেকেই।

4. **ঘনীভবন** (condensation)

বাষ্পের যে চাপ আছে তা একটি সহজ পরীক্ষাতেই দেখানো যায়। একটি এক মিটার লম্বা কাঁচের নলকে শুষ্ক করে সম্পূর্ণ পারদপূর্ণ করা হল এবং একটি পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপুড় করে রাখা হল (**Fig. 3.5a**)। কাঁচের নলে পারদস্তম্ভের উচ্চতা (প্রায় 76 cm) বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্দেশ করবে। এবার একটি বাঁকানো পিপেট দিয়ে কোন তরল ফোঁটা ফোঁটা করে নলের মধ্যে ঢোকানো হতে থাকল। এই তরল পারদ অপেক্ষা হাল্কা বলে উপরে উঠে টরিসেলীর শূন্য স্থানে প্রবেশ করে বাষ্পীভূত হবে (**Fig. 3.5b**)। দেখা যাবে পারদস্তম্ভ নীচে নেমে যাচ্ছে। **এর কারণ হল বাষ্পের চাপ।** এই চাপের পরিমাণ পারদস্তম্ভ কতটুকু নেমেছে তার থেকে নির্ণয় করা যায়। তরলের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে একসময় দেখা যাবে কিছু তরল থেকেই যাচ্ছে,



(a) পারদস্তম্ভের উচ্চতা বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্দেশ করে। (b) যখন কিছু তরল থেকেই যায় তখন বাষ্প সম্পৃক্ত। (c) আয়তন কমিয়ে চাপ বাড়াবার চেষ্টা করলে সম্পৃক্ত বাষ্প তরলে পরিণত হয়। (d) যখন স্থানটি আরও বাষ্পধারণ করতে পারে তখন বাষ্প অসম্পৃক্ত।

Fig 3.5 নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন স্থানের বাষ্পধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ

আর বাষ্প হচ্ছে না। **অর্থাৎ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও আয়তনে কোন স্থানের বাষ্প ধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।** যখন সবচেয়ে বেশী বাষ্পে স্থানটি পূর্ণ হয় তখন বাষ্প **সম্পৃক্ত** (saturated) হয়েছে বলা হয়। ঐ সময় বাষ্পের চাপ

সর্বাধিক। কাঁচের নলটি পারদপাত্রের মধ্যে আরো নামিয়ে দেওয়া হল। এভাবে বাষ্পপূর্ণ স্থানের আয়তন কমিয়ে চাপ বাড়াবার চেষ্টা করলে দেখা যায়, **কিছু বাষ্প তরলে পরিণত হয়,** কিন্তু সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ একই থাকে (Fig. 3.5c)। কাঁচের নলটি উপরে ওঠালে, বাষ্পপূর্ণ স্থানের আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং সব তরল বাষ্প হয়ে যাবে। এই অবস্থায় যদি বাষ্পপূর্ণ স্থানটি আরো বাষ্প ধারণ করতে পারে তবে ঐ স্থানের বাষ্প **অসম্পৃক্ত** (unsaturated) (Fig.3.5d)। একই উষ্ণতায় অসম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ অপেক্ষা কম।

আমরা আগেই বলেছি যে গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরলে পরিণত হওয়াকে ঘনীভবন বলে। কোন উষ্ণতায় বাষ্পকে তরলে পরিণত করতে হলে চাপ প্রয়োগ করে তার আয়তন কমিয়ে আনতে হবে (Fig. 3.6)। একসময় বাষ্পপূর্ণ স্থানটি সম্পৃক্ত হয়ে উঠবে। এটা ঘটবে যখন প্রযুক্ত চাপ ঐ উষ্ণতায় পদার্থটির সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপের সমান। চাপ বাড়িয়ে আয়তন কমাবার চেষ্টা করা হলে বাষ্প তরলে পরিণত হতে আরম্ভ করবে।

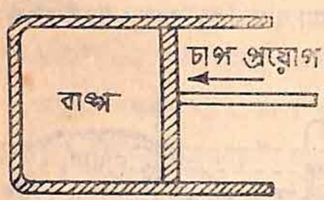


Fig 3.6

কোন নির্দিষ্ট আয়তনের বাষ্প-ধারণের ক্ষমতা উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। কম উষ্ণতায় বাষ্পধারণ ক্ষমতা কম, কাজেই সম্পৃক্ত বাষ্পচাপও কম। কাজেই কোন নির্দিষ্ট চাপে উষ্ণতা কমাতে থাকলে একটা উষ্ণতায় বাষ্পপূর্ণ স্থানের ঐ বাষ্প ধারণের আর ক্ষমতা থাকে না অর্থাৎ স্থানটি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। উষ্ণতা আরো কমালে বাষ্প তরলে পরিণত হতে আরম্ভ করে।

তবে, প্রত্যেক বাষ্পেরই এমন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে যার থেকে বেশী উষ্ণতায় বাষ্পটি থাকলে তার উপর যতই চাপ প্রয়োগ করা হোক না কেন বাষ্পটি তরলে ঘনীভূত হয় না। এই নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে **সংকট উষ্ণতা** (critical temperature) বলা হয়। কাজেই কোন পদার্থ

বায়বীয় অবস্থায় থাকলে, তাকে ঘনীভূত করতে হলে প্রথমে তাকে ঠাণ্ডা করে তার উষ্ণতা সংকট উষ্ণতার নীচে কমিয়ে আনতে হবে। পরে উপযুক্ত চাপ (ঐ উষ্ণতায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের সমান) প্রয়োগ করলে বাষ্পটি ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হবে। উষ্ণতা যত কম হবে তত কম চাপে ঘনীভবন করা যাবে। সংকট উষ্ণতায় সবচেয়ে কম যে চাপে বাষ্পকে তরলে রূপান্তরিত করা যায় তাকে **সংকট চাপ** (critical pressure) বলে। নীচে কয়েকটি পদার্থের সংকট উষ্ণতা ও চাপ দেওয়া হল।

পদার্থ	সংকট উষ্ণতা (°C)	সংকট চাপ (atmos.)
কার্বন ডাইঅক্সাইড	31	73·0
এ্যাসিটিলিন	35·5	61·7
অ্যামোনিয়া	132	112
হাইড্রোজেন	– 240	13

5. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কোন্ কোন্ জিনিসের উপর নির্ভর করে?

বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। কোন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বাইরের চাপ ও পদার্থের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে।

(ক) **গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব :** চাপ বাড়লে গলনাঙ্কের হ্রাস ও বৃদ্ধি দুটোই সম্ভব। সাধারণত কঠিন পদার্থ তরল হলে তার আয়তন বেড়ে যায়। যেমন—সোনা, রূপা, তামা, মোম ইত্যাদিতে। এদের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে সেটা আয়তনবৃদ্ধিতে বাধা দেয় অর্থাৎ পদার্থটির তরল হতে বিঘ্ন ঘটায়। এই বাধা অতিক্রম করে পদার্থটি তরল হতে পারে বেশী উষ্ণতায়। **কাজেই কঠিন অবস্থা থেকে তরল হতে যাদের আয়তন বাড়ে তাদের বেলায় চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।** কিছু কিছু পদার্থ কিন্তু কঠিন অবস্থা থেকে তরল হলে আয়তনে কমে অর্থাৎ তরল থেকে কঠিন হলে আয়তনে বাড়ে। যেমন জল বরফ হলে আয়তনে বাড়ে। চাপ বাড়ালেও আয়তন কমে, কাজেই চাপবৃদ্ধি পদার্থটির তরল হতে সাহায্য করে, ফলে পদার্থটি তরল হয় কম উষ্ণতায়। **সুতরাং কঠিন থেকে তরল হতে**

যাদের আয়তন কমে তাদের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বরফ, এ্যান্টিমনি, বিসমাথ, ঢালাই লোহা, টাইপের ধাতু (type metal) ইত্যাদি। বরফের ক্ষেত্রে 1 atmos চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক 0·0075°C হ্রাস পায়।

দুটুকরো বরফ হাতে নিয়ে হাত দিয়ে খুব জোরে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখে পরে ছেড়ে দিলে টুকরো দুটি একসঙ্গে জুড়ে যায়। চাপ দিলে বরফের গলনাঙ্ক 0°C-এর কম হয়, কাজেই বরফ দুটির সংযোগস্থলে উষ্ণতা (0°C) ঐ জায়গার বরফের গলনাঙ্কের থেকে বেশী হওয়ায় সেখানে বরফ গলে জল হয়। বরফ গলে জল হতে কিছু তাপ লাগে (এই লীন তাপের কথা একটু পরেই আলোচনা করা হবে), ফলে সংযোগস্থলের উষ্ণতা 0°C-এর নীচে নেমে যায়। এবার চাপ সরিয়ে নিলে জলের হিমাঙ্ক 0°C-তে ফিরে আসে। সংযোগস্থলের উষ্ণতা 0°C-এর কম হওয়ায় **এই গলা জল আবার জমে বরফ হয়ে যায়,** ফলে টুকরা দুটি জোড়া লেগে যায়। এই ব্যাপারটিকে **পুনঃশিলীভবন** (regelation বা refreezing) বলে।

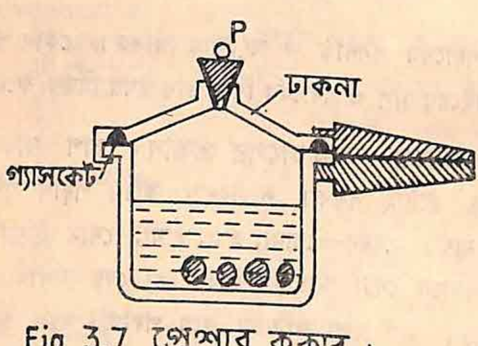


Fig 3.7 প্রেশার কুকার।
(P ভারটি ভিতরের চাপ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে।)

(খ) **স্ফুটনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব:** আমরা আগেই বলেছি যে, যে উষ্ণতায় তরলের বাষ্পের চাপ বাইরের প্রযুক্ত চাপের সমান হয়, তরল ফোটে সেই উষ্ণতাতেই এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে বাষ্পের চাপ বাড়ে।

কাজেই বাইরের চাপ বৃদ্ধি পেলে, বাষ্পের চাপ বাড়িয়ে তার সমান না করলে তরল ফুটবে না। বাষ্পের চাপ বাড়াতে উষ্ণতা বাড়াতে হবে। **কাজেই চাপ বৃদ্ধি করলে স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়, চাপ হ্রাস করলে স্ফুটনাঙ্ক হ্রাস পায়।**

সমুদ্রের তল (sea level) থেকে পাহাড়ের উপরে বায়ুর চাপ কম। সেজন্য কলকাতায় জল যে উষ্ণতায় ফোটে, দার্জিলিং-এ তার চেয়ে কম উষ্ণতাতেই ফুটবে। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে যে প্রতি হাজার ফিট উচ্চতা বৃদ্ধিতে জলের স্ফুটনাঙ্ক 1°C করে কমে। মাউণ্ট এভারেস্টের চূড়ায় জল ফুটবে প্রায় 70°C-এর কাছাকাছি। বেশী উষ্ণতায় খাদ্য দ্রব্য তাড়াতাড়ি এবং সহজে সিদ্ধ হয় বলে প্রেশার কুকার (pressure cooker) ব্যবহার করা হয়ে থাকে (Fig. 3.7)। ভাতের হাড়ির ঢাকনার উপর কিছু ভার চাপিয়ে দিলে ভাত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। এসব ক্ষেত্রে চাপ বাড়ে বলে ভিতরের জল ফোটে অনেক বেশী উষ্ণতায়।

অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই তরলকে ফোটাতে হয় সাধারণ স্ফুটনাঙ্ক (1 atmos চাপ) থেকে অনেক কম উষ্ণতায়। সেক্ষেত্রে তরলটি ফোটাতে হয় নিম্নচাপে (under reduced pressure)। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (H_2O_2) তৈরীর সময় তাকে নিম্নচাপে পাতিত (distil) করতে হয়। সাধারণ চাপে ফোটালে H_2O_2 বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। নিম্নচাপে কিভাবে পাতন করা হয় তা Fig. 3.8-এ দেখানো হল।

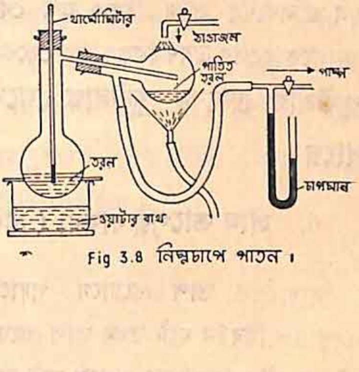


Fig 3.8 নিম্নচাপে পাতন।

(গ) **গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের উপর দ্রবীভূত বস্তুর প্রভাব :**

(i) তরল বিশুদ্ধ না হলে তার হিমাঙ্ক বিশুদ্ধ তরলের হিমাঙ্ক অপেক্ষা কম হয়। **কাজেই তরলে অন্য কোন পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে হিমাঙ্ক কমে যায়।** শীতের দেশে গাড়ীর ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করতে যে জল ব্যবহার করা হয় তা জমে যায়। এই জল যাতে জমে না যায় সেজন্য জলের সঙ্গে অ্যান্টিফ্রিজ

(antifreeze) বলে কিছু জিনিস মিশিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে হিমাঙ্ক অনেক নেমে যায়। জলে লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণের (saturated solution) হিমাঙ্ক প্রায় −20°C। হিমাঙ্ক হল সেই উষ্ণতা যে উষ্ণতায় তরল ও কঠিন অবস্থা একসঙ্গে স্থিতাবস্থায় (equilibrium) থাকে। এই সম্পৃক্ত দ্রবণকে ঠাণ্ডা করলে দ্রবণটি −20°C-এ জমতে শুরু করে এবং বরফের টুকরো দ্রবণ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। কাজেই বরফের টুকরো এবং লবণের দ্রবণ −20°C-এ স্থিতাবস্থায় থাকে, যেমন বরফ ও জল থাকে 0°C-এ। 0°C-এ বরফ (চার ভাগ) ও ঘরের উষ্ণতায় লবণ (এক ভাগ) মিশালে লবণ ঠাণ্ডা হয় এবং সেই তাপ গ্রহণ করে বরফ জল হয়। লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ ও বরফ যেহেতু 0°C-এ স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না সেজন্য আরো বরফ গলতে থাকে। বরফ গলবার সময় মিশ্রণ থেকে লীন তাপ গ্রহণ করে। ফলে মিশ্রণের উষ্ণতা কমতে থাকে। অবশেষে −20°C-এ বরফ ও লবণের মিশ্রণ স্থিতাবস্থায় আসে। এই মিশ্রণকে **হিমমিশ্রণ** (freezing mixture) বলে।

(ii) তরল বিশুদ্ধ না হলে তার স্ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাঙ্কের সমান হয় না। তরল পদার্থে কোন দ্রাব দ্রবীভূত থাকলে স্ফুটনাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। জল ও লবণের দ্রবণ বিশুদ্ধ জল থেকে বেশী উষ্ণতায় ফোটে কিন্তু জল ও অ্যালকোহলের দ্রবণ বিশুদ্ধ জল থেকে কম উষ্ণতায় ফোটে। **কাজেই দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক দ্রাবের স্ফুটনাঙ্ক থেকে বেশীও হতে পারে কমও হতে পারে।**

6. লীন তাপের ধারণা (idea of latent heat)

সাধারণত তাপ প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে কিন্তু যখন পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন তাপ প্রয়োগ করলেও উষ্ণতা বাড়ে না। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এই তাপশক্তির প্রকাশ ঘটে না বলে এই তাপকে **লীন তাপ** (latent heat) বলে। এই তাপশক্তি কোথায় যায়? তরল বা কঠিন অবস্থায় পদার্থের অণুগুলি যথেষ্ট কাছাকাছি থাকে। ফলে তারা পরস্পরের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং অণুগুলির গতিশক্তি (kinetic energy) ছাড়াও পারস্পরিক অন্তরকর্ষণ (interaction)-জনিত যথেষ্ট স্থিতিশক্তিও বর্তমান থাকে। যখন বাইরে থেকে তাপশক্তি প্রয়োগ করা হয় তখন তার কিছুটা

যায় অণুগুলির গতিশক্তি পরিবর্তন করতে আর কিছুটা যায় তাদের মধ্যে অন্তরকর্ষণজনিত স্থিতিশক্তি পরিবর্তন করতে। পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব অনুযায়ী তাপ দিলে যদি পদার্থের অণুর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় তবে পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। যে তাপে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে তাকে **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাপ** (sensible heat) বলে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাপ কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় কেননা এই তাপে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে না। এই তাপের ফলে অণুগুলির স্থিতিশক্তির পরিবর্তন ঘটে। এই তাপকেই লীন তাপ বলে। কঠিন পদার্থকে তরলে পরিণত করতে গেলে পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ কমিয়ে তাদের পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। এজন্যে গলনাঙ্কে এক গ্রাম কঠিন পদার্থকে তরলে পরিণত করতে যে তাপ লাগে তাকে **গলনের লীন তাপ** (latent heat of fusion) বলে। তরলকে কঠিন অবস্থায় ঘনীভূত করতে অণুগুলিকে পরস্পরের কাছে আনতে হয়। এজন্য এক গ্রাম তরল থেকে তার গলনাঙ্কে যতখানি তাপ নিয়ে নিতে হয় তার পরিমাণও গলনের লীন তাপের সমান। 1 gm বরফ 0°C-এ জলে পরিণত করতে 80 ক্যালরি তাপ লাগে। সুতরাং বরফের গলনের লীন তাপ হল 80 cal/gm। তরলের অণু-গুলিকে পরস্পরের আকর্ষণমুক্ত করে বাষ্পে পরিণত করতেও লীন তাপ লাগে। স্ফুটনাঙ্কে এক গ্রাম তরলকে বাষ্পে পরিণত করতে যে তাপ লাগে তাকে **বাষ্পীভবনের লীন তাপ** (latent heat of vaporisation) বলে। এক গ্রাম বাষ্পকে স্ফুটনাঙ্কে তরল করতে সমপরিমাণ তাপ বাষ্প থেকে নিয়ে নিতে হয়। জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপ হল 537 cal/gm।

প্রশ্নাবলী

1. কোন পদার্থের গলনাঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করবে? লীন তাপ কাকে বলে? বরফের লীন তাপ 80 cal/gm বললে কি বোঝায়?

2. বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য কি? কোন তরলের স্ফুটনাঙ্ক কোন্ কোন্ জিনিসের উপর নির্ভর করে?

3. ঘনীভবন কাকে বলে ? কোন বায়বীয় পদার্থকে কিভাবে ঘনীভূত করা যায় ?

4. শুদ্ধ কর :—

(i) অকেলাসিত পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সবসময়েই সমান হয়।

(ii) চাপবৃদ্ধি করলে বরফের হিমাঙ্ক বৃদ্ধি পায় কেননা জল বরফ হলে আয়তনে বাড়ে।

(iii) দ্রাবের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক সব সময়েই কম হয়।

(iv) যে তাপে উষ্ণতাবৃদ্ধি ঘটে তাকে লীন তাপ বলে।

প্রথম অধ্যায়

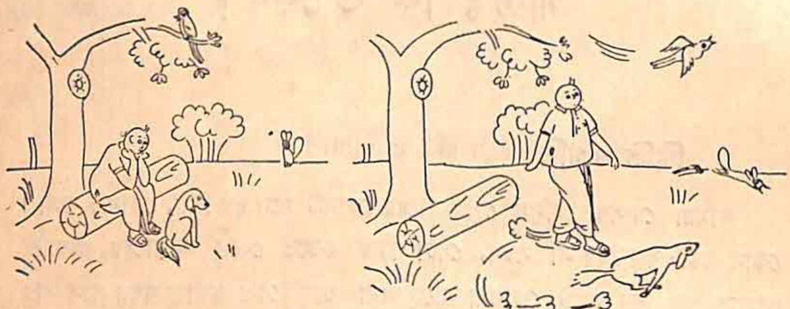
গতি : কি ও কেন ?

1. স্থিতি ও গতি (rest and motion)

আমরা যে-সব জিনিস দেখি তাদের কোনটি মনে হয় স্থির, কোনটি সচল। কোন একটি বস্তু স্থির না সচল, সেটা ঠিক করতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানতে হয় এখন বস্তুটি কোথায় আছে অর্থাৎ চারদিকের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, তাদের পারস্পরিক দূরত্বই বা কত ইত্যাদি। যেমন, তোমার পড়ার টেবিলটি এখন রয়েছে পড়ার ঘরে, পুবের দেওয়াল থেকে দু'হাত আর উত্তরের দেওয়াল থেকে তিন হাত দূরে, এ কথাটি বললে তোমার টেবিলের বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। এবার যদি দেখা যায় যে বস্তুটির অবস্থান পরেও পাল্টাচ্ছে না অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে অবস্থান একই থাকছে তবে আমরা সিদ্ধান্ত করি বস্তুটি স্থির রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বস্তুটির অবস্থান বিভিন্ন হলে সিদ্ধান্ত করি বস্তুটি সচল বা গতিশীল। আপাতদৃষ্টিতে যে বস্তুটিকে স্থির বলে মনে হয় তারও গতি আছে। Fig. 1.1-এতে গাছটিকে বা কাঠের গুড়িটিকে আমাদের স্থির বলে মনে হলেও পৃথিবীর বাইরের অন্য কোন গ্রহ থেকে দেখলে মনে হবে এরা পৃথিবীর সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে। কাজেই গাছটির স্থিতি আপেক্ষিক (relative) মাত্র।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। সূর্য ছায়াপথের (Milky Way) কোটি কোটি তারার একটি এবং ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে সূর্যও ছুটে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, প্রায় 3×10^7 সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। দেখা গেছে যে এই ছায়াপথও স্থির নয়। এই মহাবিশ্বে এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই যা

পরম স্থিতিশীল (at absolute rest)। জানা সম্ভবও নয়। কেননা, কোন বস্তু পরম স্থিতিশীল কি না সে কথাটা আর একটি পরম স্থির বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা করেই কেবল বলা সম্ভব। কোন বস্তুর পরমগতির (absolute motion) কথা জানতে হলেও কোন পরম নিশ্চল বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা করতে হয়। সুতরাং কোন বস্তুর পরম গতি জানাও সম্ভব নয়। **যা জানা সম্ভব তা হল বস্তুর আপেক্ষিক স্থিতি ও গতি।**



(a) স্থিতি (rest)
পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যার অবস্থানের পরিবর্তন হয় না তাকে স্থির বলা হয়।

Fig 1.1

(b) গতি (motion)
পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যার অবস্থানের পরিবর্তন হয় তার গতি আছে।

পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না তাকেই সাধারণত আমরা **স্থির** বলি, যার অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাকে **সচল** বলি। পৃথিবীর উপরে সব রকম গতির বর্ণনা করতে পৃথিবীপৃষ্ঠকেই স্থির বলে ধরা হয়।

A. সরণ (displacement)

কোন সচল বস্তু এক অবস্থান থেকে সরে অন্য অবস্থানে গেল। প্রথম অবস্থান থেকে **কতটুকু দূরে সরেছে** এবং **কোন্ দিকে সরেছে** জানলে পরবর্তী অবস্থানটি পাওয়া যাবে। O থেকে Pতে গেলে (Fig. 1.2), OP সরলরেখা বরাবর দূরত্ব (5 মিটার) এবং OP রেখাটির দিক (OP রেখাটি X অক্ষের সঙ্গে θ কোণ করেছে, যেখানে $\sin\theta = \frac{3}{5}$) জানলেই P বিন্দুটি কোথায় তা জানা গেল।

কোন চলমান বস্তুর, কোন নির্দিষ্ট সময়ে, প্রথম অবস্থান থেকে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরলরৈখিক দূরত্বকে (ঐ সময়ে) সরণ (displacement) বলে।

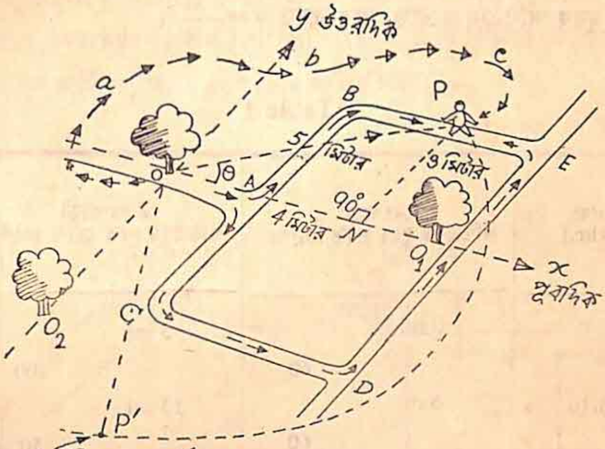


Fig 1.2 সরণ।

কাজেই এক্ষেত্রে OP রেখা বরাবর সরণ ঘটেছে। O থেকে বিভিন্ন পথে (যেমন **OABP, OACDEP** বা **OabcP** প্রভৃতি পথে) Pতে যাওয়া যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সরণ এক। কতখানি সরণ হল বলতে গেলে, সরণের **মান (magnitude)** ও **দিক (direction)** দুটিই বলতে হবে। কোন একটিকে কেবল বললে হবে না। যেমন O বিন্দু থেকে 5 মিটার সরণ হয়েছে বললে, O বিন্দুকে কেন্দ্র করে 5 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর যে-কোন বিন্দুই শেষ অবস্থান হতে পারে। যে-সব রাশির মান ও দিক এ দুই-ই আছে, তেমন দিক্‌ধর্মী রাশিকে **ভেক্টর (vector)** বলা হয়। সরণ একটি ভেক্টর রাশি। সরণের মান যদি d হয় তবে সরণের যে দিকও আছে এটা বোঝাতে d-এর উপরে একটি তীরচিহ্ন দিয়ে অর্থাৎ $\vec{d}$ দিয়ে সরণকে সূচিত করা হবে।

B. দ্রুতি (speed)

কোন বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ঐ বস্তুর দ্রুতি বলে। দ্রুতি মাপতে বস্তুটি কি ধরনের পথে যাচ্ছে তা জানার দরকার নেই। পথটি সরলও হতে পারে, বক্রও হতে পারে। যদি দেখা যায় t সময়ে বস্তুটি d দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তবে দ্রুতি $v = \frac{d}{t}$।

Table 1

সময় (hr.)	1 নং গাড়ী অতিক্রান্ত দূরত্ব	1 নং গাড়ী দ্রুতি mi/hr.	2 নং গাড়ী অতিক্রান্ত দূরত্ব	2 নং গাড়ী দ্রুতি mi/hr.
0.0	0 mi		5 mi	
		60		100
0.10	6 mi		15 mi	
		60		50
0.20	12 mi		20 mi	
		60		0
0.30	18 mi		20 mi	
		60		50
0.40	24 mi		25 mi	
		60		50
0.50	30 mi		30 mi	

দুটি গাড়ী বিভিন্ন সময়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা Table 1-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গাড়ী দুটির দ্রুতিও পাশে দেখানো হয়েছে। Fig. 1.3 (a) ও (b)তে লেখের সাহায্যে এই তথ্যগুলিই উপস্থাপিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, দুটি গাড়ীই আধ ঘণ্টায় 30 মাইল পথ অতিক্রম করেছে। 1 নং গাড়ীর দ্রুতি সমস্তটা পথেই ঘণ্টায় 60 মাইল ছিল। 2 নং গাড়ী কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রুতিতে চলেছে ; এমন কি 0.20 hr. থেকে 0.30 hr. পর্যন্ত গাড়ীটি থেমেই ছিল।

যদি কোন গতিশীল বস্তু সমান সময়ে (সময়ের অন্তর যত ছোটই হোক না কেন) সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তবে বস্তুটি **সমদ্রুতি** (uniform speed) সম্পন্ন। যেমন 1 নং গাড়ীটি। 2 নং গাড়ীটি কিন্তু **অসমদ্রুতিতে** (non-uniform speed) গিয়েছে। অসমদ্রুতির ক্ষেত্রে d/t সম্বন্ধটি থেকে ঐ t সময়ে **গড়দ্রুতি** (average speed) পাওয়া যাবে। 2 নং গাড়ীর ক্ষেত্রে গড়দ্রুতি হল 60 মাইল প্রতি ঘণ্টায়, 1 নং গাড়ীর দ্রুতির সমান।

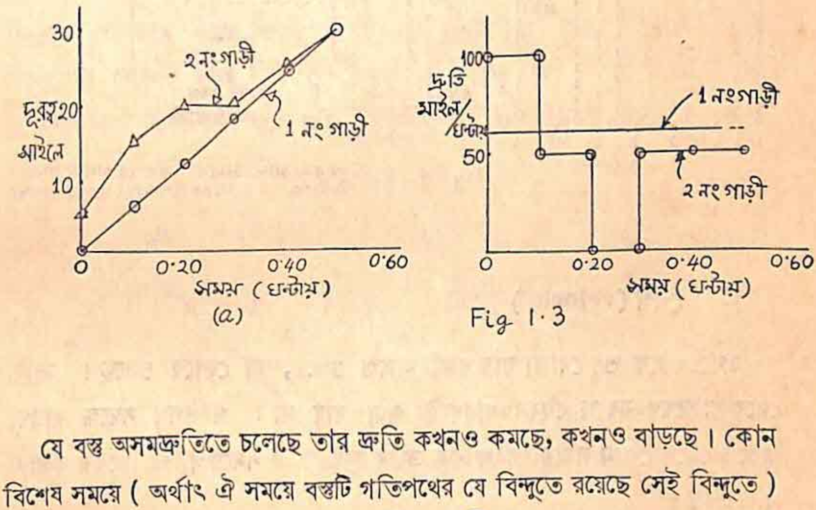


Fig 1·3

যে বস্তু অসমদ্রুতিতে চলেছে তার দ্রুতি কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। কোন বিশেষ সময়ে (অর্থাৎ ঐ সময়ে বস্তুটি গতিপথের যে বিন্দুতে রয়েছে সেই বিন্দুতে) তার দ্রুতিকে সেই সময়ে বস্তুটির **তাৎক্ষণিক দ্রুতি** (instantaneous speed) বলে। ধরা যাক, P বিন্দুতে 0.40 ঘণ্টা সময়ে তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয় করতে হবে। 0.40 hr.কে মধ্যবর্তী নিয়ে এমন একটা ক্ষুদ্র সময়ের অন্তর t′ নেওয়া হল (Fig. 1.4 B) যার মধ্যে দ্রুতি প্রায় একই থাকে। ঐ সময়ে বস্তুটি d′ দূরত্ব অতিক্রম করলে তাৎক্ষণিক দ্রুতি হল $v_i = d'/t'$।

Fig. 1.4 B থেকে $t' = 0.401 - 0.399 = 0.002$ ঘণ্টা

এবং $d' = 17.02 - 16.98 = 0.040$ মাইল

অতএব P বিন্দুতে তাৎক্ষণিক দ্রুতি হল 0.040 মাইল/0.002 ঘণ্টা

= 20 মাইল প্রতি ঘণ্টায়।

কাজেই গতিপথের সর্বত্র তাৎক্ষণিক দ্রুতি অপরিবর্তিত থাকলে বস্তুটি সমদ্রুতিসম্পন্ন, বিভিন্ন সময়ে তাৎক্ষণিক দ্রুতি বিভিন্ন হলে বস্তুটি অসমদ্রুতি-সম্পন্ন।

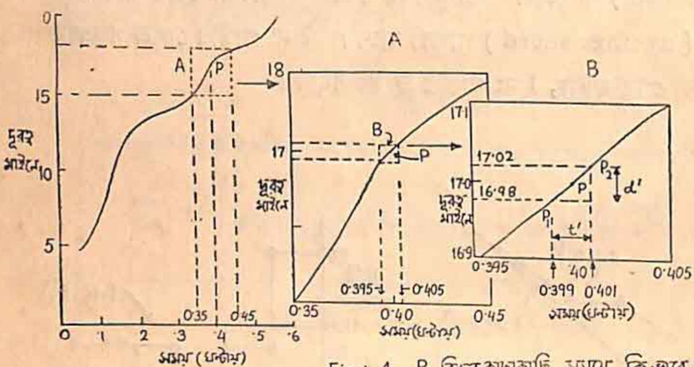


Fig 1.4 P বিন্দুর কাছাকাছি সময়ে কি ভাবে সময়ের সাথে দূরত্ব পাল্টাচ্ছে তা A ও B তে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

C. বেগ (velocity)

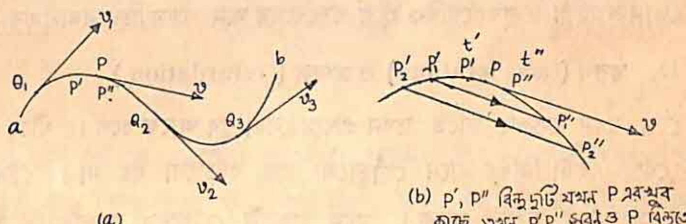
দ্রুতি থেকে শুধু বোঝা যায় বস্তুটি আস্তে চলছে, না জোরে চলছে। দ্রুতি থেকে গতিপথ সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে কোন সময়ে তাৎক্ষণিক দ্রুতি ছাড়াও ঐ সময়ে গতির দিকের কথাও বলতে হয়।

কোন বিশেষ সময়ে গতির দিকে তাৎক্ষণিক দ্রুতিকে ঐ সময়ে বস্তুর তাৎক্ষণিক বেগ (instantaneous velocity) বা বেগ বলা হয়।

বেগের দিক ও মান রয়েছে। সরণের মত বেগও একটি ভেক্টর রাশি। দ্রুতির মত বেগও **সম** (uniform) বা **অসম** (non-uniform) হতে পারে। যখন কোন বস্তু একই দিকে, অর্থাৎ দিক পরিবর্তন না করে, সমদ্রুতিতে চলে তখন তার বেগকে **সমবেগ** (uniform velocity) বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে বেগ বিভিন্ন হলে ঐ বেগ অসমবেগ। তিন রকম ভাবে

বেগের পরিবর্তন হতে পারে, **শুধু দিক পরিবর্তিত হলে, শুধু মান পরিবর্তিত হলে বা দিক ও মান উভয়েই একসঙ্গে পরিবর্তিত হলে।**

ধরা যাক, $aQ_1Q_2Q_3b$ পথে বস্তুটি a থেকে bতে চলছে (Fig. 1.5)। গতিপথের কোন বিন্দু pতে গতির দিক হল ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের (tangent) দিকে। কাজেই কোন বিন্দুতে বেগ হল ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের দিকে তাৎক্ষণিক দ্রুতি। ধরা যাক, p বিন্দুতে পৌছবার একটু আগে (t′ সময়ে) বস্তুটি p′ বিন্দুতে পৌছেছে এবং একটু পরেই (t″ সময়ে) p″ বিন্দুতে গেছে। p′p″ সরলরেখা বরাবর দূরত্ব হল p′ থেকে p″ পর্যন্ত সরণ। p′ ও p″ বিন্দুদ্বয় p বিন্দুর খুব নিকটবর্তী হলে p′p″ সরলরেখাটি p বিন্দুতে স্পর্শক। অর্থাৎ



(b) p′, p″ বিন্দু দুটি যখন P এর খুব কাছে তখন p′p″ সরণ ও P বিন্দুতে বেগ একই দিকে হবে।

Fig 1.5

এই সরণের দিক ও বেগের দিক এক। এছাড়া p বিন্দুতে তাৎক্ষণিক দ্রুতি হল (p′p″ দূরত্ব)/(t″ – t′)। **কাজেই বেগকে সরণের হার বা একক সময়ে সরণও বলা যেতে পারে।**

যদি কোন সময় tতে সরণ $\vec{d}$ হয় তবে গড়বেগ (average velocity) $\vec{v}=\vec{d}/t$। তাৎক্ষণিক বেগের মান তাৎক্ষণিক দ্রুতি হলেও গড় বেগের মান সাধারণত গড়দ্রুতির সমান হয় না। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটিকে একটু স্পষ্ট করা যাক।

একটা বৃত্তাকার ট্র্যাকে (track) দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দৌড়ের আরম্ভও (Start) S বিন্দুতে, শেষও (Stop) ঐ একই বিন্দুতে। ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য 1600 মিটার। প্রতি মিনিটে 400 মিটার হারে একজন দৌড়বীর 4 মিনিটে দৌড় শেষ করল। এক্ষেত্রে দ্রুতি সমদ্রুতি। কিন্তু বেগ অসমবেগ, গতিপথের সর্বত্রই বেগের দিক পরিবর্তিত হয়েছে। তাৎক্ষণিক বেগের মান, তাৎক্ষণিক দ্রুতির সমান। গড়দ্রুতি হল 400 মিটার প্রতি মিনিটে। গড়বেগ কিন্তু শূন্য, কেননা ঐ 4 মিনিটে শেষ পর্যন্ত কোন সরণই হয়নি।

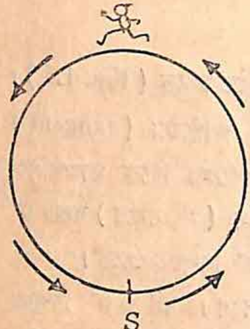


Fig 1·6

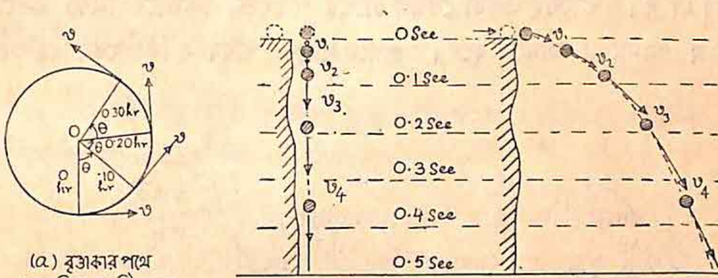
কোন বস্তুর গতি সরলরৈখিক হলে গড়বেগের মান গড়দ্রুতির সমান হয়।

D. **ত্বরণ** (acceleration) ও **মন্দন** (retardation)

ট্রেন যখন স্টেশন ছাড়ে তখন প্রথমে সেটা খুব আস্তে চলে। ধীরে ধীরে দ্রুতি বেড়ে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌছালে আর বাড়ানো হয় না। ট্রেন ঐ নির্দিষ্ট দ্রুতিতেই চলতে থাকে। যখন পরবর্তী স্টেশনের কাছাকাছি আসে তখন চালক ব্রেক প্রয়োগ করে। ফলে ট্রেনের দ্রুতি কমতে থাকে এবং অবশেষে পরের স্টেশনে এসে ট্রেনটি থেমে যায়। যখন দ্রুতি বাড়ছিল তখন আমরা বলি ট্রেনটি ত্বরান্বিত (accelerated) হচ্ছে, যখন দ্রুতি কমছে তখন বলি ট্রেনের গতি মন্দীভূত (retarded) হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুতির পরিবর্তন হয়েছে। বেগের পরিবর্তন যে তিন ভাবে হতে পারে তা আগেই বলেছি। Fig. 1.7-এ তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে। এই সংজ্ঞানুযায়ী ত্বরণ = বেগের পরিবর্তন / সময়। অর্থাৎ ত্বরণের একক হবে $\frac{L}{T}/T = LT^{-2}$। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হল 1 cm/sec² বা 1 cm per sec per sec.

ত্বরণের দিক ও মান রয়েছে। কাজেই এটিও একটি ভেক্টর রাশি। ত্বরণের দিক ও মান অপরিবর্তিত থাকলে তাকে **সমত্বরণ** (uniform acceleration) বলে। পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে বাধাহীনভাবে পড়ন্ত বস্তুর (freely falling body) গতি ত্বরান্বিত। এই ত্বরণ সমত্বরণ। একে অভিকর্ষজ ত্বরণ (acceleration due to gravity) বলা হয়। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান 32.2 ft/sec^2।



(a) বৃত্তাকার পথে সমদ্রুতিতে বস্তুটি ঘুরছে। বেগের মান একই রয়েছে, শুধু দিকে পাল্টাচ্ছে।

(b) স্থির অবস্থা থেকে বস্তুটি ভূপৃষ্ঠের দিকে পড়ছে। এখানে দিক একই রয়েছে, বেগের মান পাল্টাচ্ছে।

(c) অনুভূমিক ভাবে ছুঁড়ে দেওয়া বস্তুটি নীচের দিকে পড়ছে। বেগের দিক ও মান দুটোই পাল্টাচ্ছে।

Fig 1.7

একক সময়ে বেগের হ্রাসকে মন্দন বলে। কাজেই ত্বরণ ঋণাত্মক (negative) হলে তাকে মন্দন বলা হয়। একটা উদাহরণের সাহায্যে কথাটা একটু পরিষ্কার করা যাক। মনে কর, তুমি একটা ঢিল সোজা উপর দিকে ছুঁড়েছ। ছোঁড়ার মুহূর্তে বেগ ছিল 160 ft/sec। 4 সেকেণ্ড পরে ঐ বেগ কমে দাঁড়াল 32 ft/sec। প্রথমে মন্দন নির্ণয় করা যাক। এ ক্ষেত্রে বেগের হ্রাস = 160 ft / sec − 32 ft / sec = 128 ft/sec। সময় লেগেছে 4 sec।

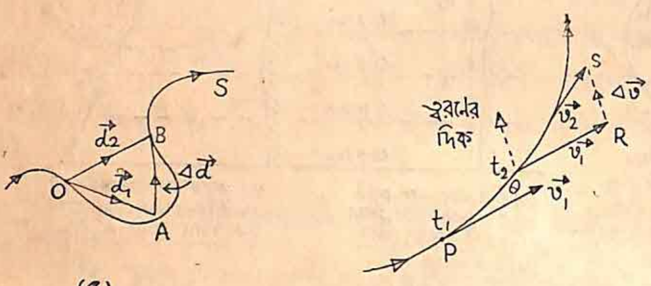
অতএব মন্দন = 128 ft/sec/ 4 sec = 32 ft/sec^2

এবার দেখা যাক এক্ষেত্রে ত্বরণ কত। বেগের পরিবর্তন = চূড়ান্ত বেগ − প্রাথমিক বেগ = 32 ft/sec − 160 ft/sec = − 128 ft/sec।

অতএব ত্বরণ = − 128 ft / sec / 4 sec = − 32 ft/ sec^2 = − মন্দন।

কাজেই বেগের পরিবর্তন হলেই আমরা ত্বরণ হচ্ছে বলব। **ত্বরণ ঋণাত্মক হলে বুঝতে হবে মন্দন হচ্ছে।**

যখন বেগের দিক বদলাচ্ছে না, অর্থাৎ বস্তুটি সরলরেখায় যাচ্ছে, তখনই কেবল বেগের মানের পরিবর্তন থেকে সহজেই মন্দন বা ত্বরণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ত্বরণের দিক বেগের দিকে অথবা (মন্দনের ক্ষেত্রে) বেগের বিপরীত দিকে। বেগের দিক পরিবর্তিত হলে অবশ্য এত সহজে ত্বরণ নির্ণয় করা যায় না। ত্বরণ নির্ণয় করতে হলে বেগের পরিবর্তন নির্ণয় করতে হবে। বেগ একটি ভেক্টর রাশি। কাজেই একটা ভেক্টর রাশির পরিবর্তন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমাদের জানতে হবে। প্রথমে সরণের পরিবর্তন কিভাবে নির্ণয় করা



(b) বেগের পরিবর্তন $\Delta\vec{v}$, সময় লেগেছে $t_2 - t_1 = \Delta t$; ত্বরণ $= \Delta\vec{v}/\Delta t$; ত্বরণের দিক, $\Delta\vec{v}$ এর দিকে।

Fig 1·8

যায় দেখা যাক। Fig. 1.8-এ S পথের উপরে কোন বস্তু O থেকে A হয়ে Bতে গিয়েছে। স্পষ্টতই, O থেকে A পর্যন্ত $\vec{d_1}$ সরণ হবার পর যদি A থেকে B পর্যন্ত আবার $\vec{\Delta d}$ (△ বা ডেল্টা মানে পরিবর্তন) সরণ হয় তবে বস্তুটির মোট সরণ হল O থেকে B পর্যন্ত $\vec{d_2}$ সরণ। এক্ষেত্রে $\vec{\Delta d}$ সরণ যোগ করতেই $\vec{d_1}$ সরণ পরিবর্তিত হয়ে $\vec{d_2}$ সরণ হয়েছে। কাজেই $\vec{d_1}$কে প্রাথমিক সরণ ও $\vec{d_2}$কে চূড়ান্ত সরণ ধরলে $\vec{d_1}$ ও $\vec{d_2}$র প্রান্তভাগ দুটি যোগ করলে সরণের পরিবর্তন $\vec{\Delta d}$ পাওয়া যাবে। $\vec{\Delta d}$-এর দিক হচ্ছে সরণের পরিবর্তনের দিক এবং $\vec{\Delta d}$-এর মান হচ্ছে সরণের পরিবর্তনের মান। একই

উপায়ে অন্য ভেক্টর রাশির পরিবর্তনও নির্ণয় করা যায়। Fig. 1.8(b)তে বস্তুটি t_1 সময়ে Pতে এবং t_2 সময়ে Qতে ছিল। এই দুই বিন্দুতে বস্তুটির বেগ যথাক্রমে $\vec{v}_1$ ও $\vec{v}_2$। $\Delta\vec{v}$ বেগের পরিবর্তন। t_1 ও t_2 খুব কাছাকাছি হলে ত্বরণ হবে $\Delta\vec{v}$-এর দিকে। Fig. 1.7 (a)-এতে বস্তুটির বেগ সব সময়েই বৃত্তের স্পর্শকের দিকে, ত্বরণ সব সময়েই বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে। (একটু চিন্তা করলেই এটা স্পষ্ট হবে।)

2. নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় সূত্র (Newton's law of motion) ও বলের সংজ্ঞা (definition of force)

আমরা এতক্ষণ দেখেছি কিভাবে কোন বস্তুর গতির বর্ণনা করা যায়। যদি কোন নির্দিষ্ট সময় tতে কোন বস্তুর অবস্থান ও বেগ জানা থাকে ও বস্তুটির ত্বরণ কত তাও জানা থাকে, তবে পরবর্তী কোন সময় $t+\Delta t$তে বস্তুটির বেগ ও অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এভাবে পর পর বিভিন্ন সময়ে অবস্থান ও বেগ নির্ণয় করতে পারলে গতিপথটি কেমন এবং ঐ পথে গতির প্রকৃতি কি তা জানা যায়।

প্রকৃতিতে কত বিচিত্র গতিই না আমরা প্রত্যক্ষ করি। পাকা ফলটি বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে, জাহাজ ভাসে জলে, প্লেন ওড়ে আকাশে, সমুদ্রের বুকে জোয়ার-ভাঁটা হয়ে চলে নির্ভুল ছন্দে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গতির এই আপাতবৈচিত্র্যের পিছনে প্রকৃতির কোন নিয়ম কাজ করছে কি? গতি হয় কেন?

গতি সম্বন্ধে এসব জিজ্ঞাসা বহু শতাব্দীর। তবে গ্যালিলিও (1564-1642) ও নিউটনের (1642-1727) আগে আমরা এসব জিজ্ঞাসার কোন সুসংগত উত্তর পাইনি।

আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে কোন ভারী জিনিস সরাতে গেলে অনেক শারীরিক কসরৎ করতে হয়, যেমন একটা টেবিলকে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে যথেষ্ট ধাক্কা (push) বা টান (pull) লাগে। টেবিলের ওপরে বইটাকে পাশে সরিয়ে দিতে অবশ্য কম

ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কা বা টানকে আমরা **বল** (Force) বলি। সাধারণ ভাষায়, এসব ক্ষেত্রে বস্তুর গতি সঞ্চার করতে আমরা বলপ্রয়োগ করে থাকি। বিজ্ঞানে বলের ধারণাটি এরকম সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ সংযোগ (direct contact) ছাড়াও যে টান বা ধাক্কা প্রযুক্ত হতে পারে ক্রমশ সে অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে। একটি লোহার কাঁটাকে দূর থেকেই একটা চুম্বকে টানে। এই টানের ফলে কাঁটার যে গতি হয়, কাঁটাটিতে সুতো বেঁধে হাত দিয়ে টেনেও একই রকম গতি কাঁটাটিতে সঞ্চার করা যায়। একটা চুম্বকের এক প্রান্তের কাছে অন্য একটি চুম্বকের সমমেরু (similar pole) প্রান্ত আনলে তারা পরস্পরকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এভাবে সব রকম গতির পিছনেই আমরা **কোন না কোনভাবে** (প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়াও) টান বা ধাক্কা প্রযুক্ত হতে দেখি। অতএব **গতি মাত্রেরই কারণ হল বল।**

গতির প্রকৃতি কিভাবে বলের উপর নির্ভর করে? ঠেলাগাড়ীর

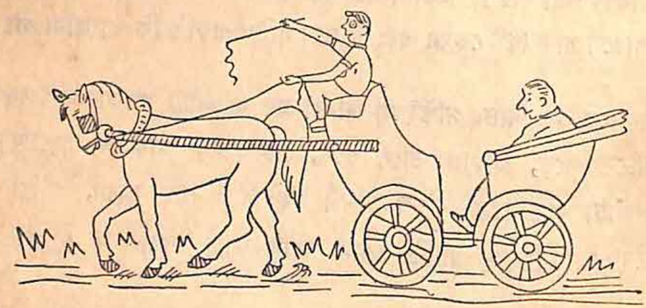


Fig 1.7 একই গতিতে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে ঘোড়াকে ক্রমাগত একই বলে টানতে হয়, থামলে চলে না।

কথাটাই ধর। যতক্ষণ ঠেলছ ততক্ষণ চলছে, ঠেলা বন্ধ কর, চলাও বন্ধ হবে। এ ধরনের অজস্র ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে **একইভাবে নির্দিষ্ট গতিতে কোন বস্তুকে চালিয়ে নিতে গেলে অবিরাম বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং বলপ্রয়োগ বন্ধ করলেই গতি থেমে যায়।**

গাছ থেকে যে ফলটি পড়ছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে ফলটি পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে ত্বরান্বিত হচ্ছে। আবার গ্রহনক্ষত্রের গতির ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণভাবে এটাই মনে হয় যে কোন প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ ছাড়াই এদের গতি চিরন্তন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে বল ও গতির সম্বন্ধ বিচিত্র বলে মনে হবে, কখনও নির্দিষ্ট বলে নির্দিষ্ট বেগ উৎপন্ন হচ্ছে, কখনও বলপ্রয়োগে ত্বরণ হচ্ছে, আবার কখনও বল ছাড়াই গতি সম্ভব হচ্ছে। এই আপাতবৈচিত্র্যের পিছনে ঐক্যের সূত্রটি খুঁজে বার করেন গ্যালিলিও সপ্তদশ শতাব্দীতে।

আনত সমতলে (inclined plane) বস্তুর গতি-প্রকৃতি নিয়ে গ্যালিলিও পরীক্ষা করছিলেন। তিনি দেখলেন যে, আনত তলে বস্তুটির গতি নিম্নমুখী হলে বেগ বৃদ্ধি পায়, গতি ঊর্ধ্বমুখী হলে বেগ হ্রাস পায়। কাজেই সমতলটি আনত না হয়ে অনুভূমিক হলে বেগের বৃদ্ধি বা হ্রাস কোনটাই হওয়া উচিৎ নয়। অর্থাৎ বেগ একই থাকার কথা। গ্যালিলিও দেখলেন যে কার্যত যদিও এক্ষেত্রে বেগ কমতে থাকে তবে তার কারণ হল বস্তুটির সঙ্গে তলের ঘর্ষণজনিত বাধা (friction)। তল ও বস্তুটিকে খুব মসৃণ করে ঘর্ষণ যত কমিয়ে ফেলা যায় বস্তুটি তত বেশি দূর পর্যন্ত যায় প্রায় একই বেগে। যদি কল্পনা করি যে ঘর্ষণ বা অন্য কোন বাধাই নেই, তবে সে রকম আদর্শ অবস্থায় (ideal condition) বেগের কোন রকম

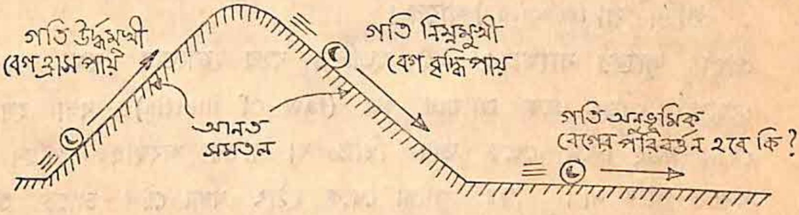


Fig 1·10 অনুভূমিক সমতলে ঘর্ষন বা অন্য কোন বাধা না থাকলে বেগের কোন পরিবর্তন হবে না।

পরিবর্তনই হবে না। সুতরাং গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করলেন যে কোন বস্তুতে একবার কোন বেগ সঞ্চার করা হলে বস্তুটি অপরিবর্তিত বেগেই চলতে থাকে, বেগের পরিবর্তন তখনই হয় যখন বস্তুটির উপর কোন বল ক্রিয়া করে।

বলপ্রয়োগ না করলে যে স্থির বস্তু স্থির অবস্থাতেই থাকে, এটা আগেই জানা ছিল। গ্যালিলিও দেখালেন যে গতির ক্ষেত্রেও জাড্য (inertia) আছে,

বল প্রযুক্ত না হলে বস্তুর বেগও অপরিবর্তিত থাকে। এভাবে বলের অবর্তমানেও চিরন্তন গতি সম্ভব। বল প্রযুক্ত না হলেও বস্তুর বেগ থাকা সম্ভব, **কিন্তু বল ব্যতীত ত্বরণ হয় না।**

গ্যালিলিও পথপ্রদর্শক। নিউটন উত্তরসূরী। গ্যালিলিওর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে গতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরীক্ষা ও ঘটনার বিশ্লেষণ করে নিউটন তাঁর সিদ্ধান্তগুলি তিনটি সুনির্দিষ্ট সূত্রের আকারে উপস্থাপিত করেন। এইগুলি **নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র** (Newton's laws of motion) নামে পরিচিত। গতি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণা এই সূত্রগুলির উপরই দাঁড়িয়ে আছে।

নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র :—

প্রথম সূত্র : বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থাতেই থাকে এবং সচল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরল রেখায় চলে।

দ্বিতীয় সূত্র : কোন বস্তুর ভরবেগের (momentum) পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে-দিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সে-দিকে ঘটে।

তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক ক্রিয়ারই (action) একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction) থাকে।

প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা :—এই সূত্রটিতে বস্তুর জাড্যের কথা বলা হয়েছে। সেজন্য একে জাড্যের সূত্র (law of inertia)ও বলা হয়। কোন বস্তুই নিজে থেকে তার স্থিতি বা গতির অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। স্থির অবস্থা থেকে হঠাৎ যখন ট্রেন চলতে শুরু করে তখন আরোহীরা সকলেই পিছন দিকে হেলে পড়ে। এর কারণ হল শরীরের নিম্নাংশ ট্রেনের সংস্পর্শে হঠাৎ গতিশীল হয়ে উঠলেও ঊর্ধ্বাংশ পূর্ববৎ স্থির থাকবার চেষ্টা করে। এটা স্থিতি জাড্য। আবার চলন্ত ট্রেন হঠাৎ ব্রেক কষে থামালে যাত্রীরা সব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে শরীরের নিম্নাংশ হঠাৎ থেমে গেলেও ঊর্ধ্বাংশ আগের বেগেই চলার চেষ্টা করে। এটা গতি জাড্য।

এই সূত্রটিতে বলের সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে। **যা প্রয়োগ করে অবস্থার**

পরিবর্তন হয় বা অবস্থার পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা হয় তাই বল। প্রযুক্ত বলটিই যে বস্তুর উপর একমাত্র বল তা নাও হতে পারে। একটি বস্তুর উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বলের উৎস কি সেটা অনেক সময়েই সহজে ধরা যায় না। একটা টেবিলে ধাক্কা দিয়েও যখন সেটা সরে না, তখন টেবিলের উপর দেওয়া ধাক্কাটাই একমাত্র বল নয়। টেবিল ও মেঝের মধ্যে ঘর্ষণজনিত বলও উৎপন্ন হচ্ছে এবং তুমি যে দিকে সরাতে চাচ্ছ তার উল্টো দিক বাধা দিচ্ছে। যতক্ষণ ধাক্কা ও ঘর্ষণ সমান ততক্ষণ টেবিলের উপর মোট প্রযুক্ত বল শূন্য। কাজেই টেবিলটি নড়ছে না। এই ঘর্ষণের জন্যই একই গতিতে গাড়ীকে চালিয়ে নিয়ে যেতে ঘোড়াকে ক্রমাগত একই বলে গাড়ীকে টানতে হয় (Fig. 1 9)।

দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা :—দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে অনেক কথাই বলা হয়েছে।

(ক) বলের মান ও দিক আছে। অতএব বল একটি ভেক্টর রাশি।

(খ) কোন বল যে-দিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও ঘটে সে-দিকে। এই পরিবর্তন ঘটে ততক্ষণই যতক্ষণ বলটি প্রযুক্ত হচ্ছে। আলোচ্য বলটি যতক্ষণ প্রযুক্ত হচ্ছে সেই সময়ে, তার আগে বা তার পরেও অন্যান্য বল প্রযুক্ত হতে পারে। প্রত্যেক বলই তার নিজের দিকে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটাবে। একের পরিবর্তন অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুর গতি বা স্থিতির যে-কোন অবস্থাতেই যদি কোন বল প্রয়োগ করা যায় তবে সেই বলের জন্য ভরবেগের পরিবর্তনের হার ও দিক কেবলমাত্র ঐ বলের পরিমাণ ও দিকের উপরই নির্ভর করবে। একে **বলের নিরপেক্ষ নীতি** (physical independence of forces) বলে।

(গ) ভরবেগের পরিবর্তনের হার মেপে বলের পরিমাপ করা সম্ভব। এখানে ভরবেগ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভরবেগ হল ভর ও বেগের গুণফল। ধর t সময় ধরে p বলটি প্রযুক্ত হবার ফলে বেগ $\vec{v}$ হতে পরিবর্তিত হয়ে $\vec{v}+\triangle\vec{v}$ হয়েছে। কাজেই ভর m হলে, ভরবেগের পরিবর্তন হল $m(\vec{v}+\triangle\vec{v})-m\vec{v}$ $=m\triangle\vec{v}$।

$$\text{ভরবেগের পরিবর্তনের হার} = m\triangle\vec{v}/t$$

$$= m\vec{f} \;(\text{এখানে } \vec{f} = \frac{\triangle\vec{v}}{t} = \text{ত্বরণ})$$

দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী, $\vec{p} \propto m\vec{f}$

$$\vec{p} = k\,m\vec{f} \text{ (k একটি ধ্রুবক)}$$

ধ্রুবকটির মান বলের এককের উপর নির্ভর করে। একক ভরের উপর প্রযুক্ত হয়ে যে বল একক ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাকে যদি বলের একক নিই, তবে $m=1$, $\vec{f}=1$ ও $\vec{p}=1$ ($\vec{p}$-এর মান p, $\vec{f}$-এর মান f, তীরচিহ্নটি শুধু দিক আছে একথা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ; $\vec{p}$ ও $\vec{f}$ একই দিকে)। কাজেই $k=1$। এভাবে বলের একক নির্দিষ্ট হলে,

$$\vec{p} = m\vec{f}$$

অথবা, **বল = ভর × ত্বরণ**

এই সমীকরণকে গতিসম্বন্ধীয় মূল সমীকরণ বলা হয়। কি করে বল মাপতে হবে তার নির্দেশও এই সমীকরণে রয়েছে। সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে বলের একক হল gm cm/sec^2। এই এককে বলা হয় ডাইন (Dyne)। এফ্. পি. এস. পদ্ধতিতে বলের একক হল lb − ft/sec^2 বা **পাউণ্ডাল** (Poundal)। একক ভরের ওজনকে বলের একক ধরে আর এক ধরনের একক প্রচলিত আছে। এদের **বলের অভিকর্ষীয় একক** (gravitational unit of force) বলা হয়। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে এক গ্রাম ভরের ওজনের সমান **গ্রাম-ভার** (gram weight বা gm-wt.) এবং এফ্. পি. এস. পদ্ধতিতে এক পাউণ্ড ভরের ওজনের সমান **পাউণ্ড-ভার** (lb-wt) হল অভিকর্ষীয় একক। সুতরাং 1 গ্রাম-ভার = g ডাইন = 981 ডাইন এবং 1 পাউণ্ড-ভার = g পাউণ্ডাল = 32·2 পাউণ্ডাল।

উদাহরণ : 10 ডাইন বল 5 গ্রাম একটি বস্তুর উপর কাজ করছে। বস্তুটি প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল। 10 সেকেণ্ডে বস্তুটির বেগ কত হবে ?

ত্বরণ = বল/ভর = 10 ডাইন/5 গ্রাম = 2 cm/sec^2

প্রাথমিক বেগ = 0, 10 সেকেণ্ড পরে বেগ = v,

$$\text{কাজেই ত্বরণ} = \frac{v}{t} = \frac{v}{10 \text{ সেকেণ্ড}}$$

∴ বেগ v = ত্বরণ × সময় = 2cm/sec^2 × 10 sec = 20 cm/sec .

তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা :— ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলেরই নামান্তর। কোন বস্তু A যদি অন্য কোন বস্তু B-র উপর বল প্রয়োগ করে (যাকে ক্রিয়া বলা হয়েছে) তবে B বস্তুটিও A বস্তুর উপরে সমান ও বিপরীত বল (বা প্রতিক্রিয়া) প্রয়োগ করবে। টেবিলের উপর বইটি রাখা হয়েছে। বইটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণই হল তার ওজন। সেই ওজন গিয়ে পড়েছে টেবিলের উপর। এটিই টেবিলের উপর বইয়ের ক্রিয়া। বইটির উপর টেবিলের প্রতিক্রিয়াও সমান, তবে বিপরীত দিকে। কাজেই বই-এর উপর একই সঙ্গে দুটি বল কাজ করছে, তার ওজন নীচের দিকে, আর টেবিলের প্রতিক্রিয়া, ওজনের সমান কিন্তু উপর দিকে। অর্থাৎ বইটির উপর নীট বল শূন্য। কাজেই বইটি স্থির অবস্থায় আছে। **ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বস্তুর উপর কাজ করে না।** এখানে ক্রিয়া টেবিলের উপর এবং প্রতিক্রিয়া বই-এর উপর কাজ করছে। ক্রিয়া থাকলেই প্রতিক্রিয়া থাকবে। প্রকৃতিতে বল কখনও এককভাবে থাকে না, **থাকে জোড়ায়** (in pairs)।

কোন বস্তুর গতি কেমন হবে জানতে হলে ঐ বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলগুলিকে নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে বস্তুটির উপর যে-সব বল প্রযুক্ত হয়েছে তাদেরই কেবল ধরতে হবে, **বস্তুটি অন্যদের উপর যে বল প্রয়োগ করছে তা ধরা চলবে না।** যদি এই সব বল একই সঙ্গে প্রযুক্ত হবার ফলে মোট বল শূন্য হয় তবে বস্তুটির অবস্থার পরিবর্তন হবে না, মোট বল শূন্য না হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

প্রশ্নাবলী

1. স্থিতি ও গতি কাকে বলে? পরম গতি বা পরম স্থিতি জানা সম্ভব কি?

2. বেগ, দ্রুতি, ত্বরণ, সরণ ইত্যাদির সংজ্ঞা কি? সি. জি. এস. পদ্ধতিতে প্রতিটির একক বল। এদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি ভেক্টর রাশি?

3. নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় সূত্রগুলি বল। **বল** কিভাবে মাপা যায়? সি. জি. এস. পদ্ধতিতে বলের একক কি?

4. (i) চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নামা এত বিপজ্জনক কেন? কোন্ দিকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা?

(ii) বরফের উপর দিয়ে গাড়ী চালানো নিরাপদ নয় কেন?

(iii) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যদি সমান এবং বিপরীতই হয়, তবে গতি সম্ভব হয় কিভাবে?

5. ভুল থাকলে সংশোধন কর:—

(i) ক্রিয়া সব সময়েই প্রতিক্রিয়া থেকে বেশি।

(ii) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই দিকে কাজ করে।

(iii) আপেল ও পৃথিবী পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। আপেল পৃথিবীর দিকে পড়ে, কেননা পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি।

(iv) একটি বস্তু সমবেগে চলছে। কাজেই বস্তুটির উপর মোট বল কখনই শূন্য হতে পারে না।

6. 10 গ্রাম ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু স্থির অবস্থায় ছিল। বস্তুটির উপর 5 সেকেণ্ড ধরে 20 ডাইন বল প্রযুক্ত হবার পর বস্তুটি 10 সেকেণ্ড ধরে বলশূন্য অবস্থায় চলল। এর পরে 4 সেকেণ্ড ধরে 15 ডাইন বল গতির বিপরীত দিকে প্রয়োগ করা হলে বস্তুটির চূড়ান্ত বেগ কত হবে?

পরিশিষ্ট :—আমরা এই বইয়ের দু-তিনটি জায়গায় $\cos\theta$ ও $\sin\theta$ বলে দুটি পদ ব্যবহার করেছি। এ সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি কথা জেনে রাখ। Fig. 1.2 (পদার্থবিদ্যা)তে OP ও ON বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ $\angle PON=\theta$; OP বাহুর P বিন্দু থেকে ভূমি ON-এর উপর PN লম্ব টানা হয়েছে। এই সমকোণী ত্রিভুজ PON-এর ভূমি ON, লম্ব PN এবং অতিভুজ OP। লম্ব/অতিভুজ এবং ভূমি/অতিভুজ এই দুটি অনুপাতকে যথাক্রমে θ কোণের সাইন ও কোসাইন বলা হয়। এদের $\sin\theta$ (সাইন থিটা) ও $\cos\theta$ (কস্ থিটা) দিয়ে সূচিত করা হয়। অর্থাৎ PON ত্রিভুজে $\sin\theta = PN/OP$ এবং $\cos\theta = ON/OP$.

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজ : কাজের সুবিধার জন্যই যন্ত্র

1. কার্য (Work)

যখন কাঠুরে কাঠ কাটে, মালী কুয়ো থেকে জল তোলে, কিম্বা রাজমিস্ত্রির জোগানদার ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে মই বেয়ে ওপরে ওঠে, তখন আমরা বলি তারা কাজ করছে। কাজ বলতে আমরা সাধারণত এমন কিছু বুঝি যার ফলে পরিশ্রম হয়, ক্লান্তি আসে। বিজ্ঞানে কার্য কথাটিকে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় তা কাজ সম্বন্ধে আমাদের এই সাধারণ ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে।

মালী এক বালতি জল তুলতে যে কাজ করে, দু'বালতি জল তুললে আমরা বলি সে দ্বিগুণ কাজ করেছে। এক বালতি জল তুলতে মালী যতটুকু পরিশ্রান্ত হয়, দু'বালতি জল তুলতে তার চেয়ে বেশী পরিশ্রান্ত হয়। সুতরাং কাজের পরিমাণ দু'ভাবে মাপা যেতে পারে; একই কাজ কবার করল তার সংখ্যা থেকে বা কাজ করতে কতটুকু পরিশ্রান্ত হল তা দেখে।

কাজ করতে করতে যখন আমরা খুব শ্রান্ত হয়ে পড়ি তখন আমাদের বিশ্রাম ও খাদ্যের দরকার হয়। কাজ করতে গেলে আমাদের যেমন খাদ্যের দরকার হয়, ইঞ্জিনের তেমনি লাগে জ্বালানি। ইঞ্জিন যত বেশী কাজ করে তত বেশী জ্বালানি লাগে। **কতটুকু জ্বালানি লাগল তা মেপে কাজের পরিমাণ মাপা সম্ভব।** পরিশ্রমের ব্যাপারটা গোলমেলে, কিন্তু ইঞ্জিনে কতটুকু জ্বালানি পুড়ল তা সঠিকভাবে মাপা কষ্টসাধ্য নয়।

ধর, একটা ইঞ্জিনের কাজ হল 100 কেজির এক ঝুড়ি কয়লাকে 100 মিটার উপরে তোলা (Fig. 2.1)। ঝুড়িটিকে ওঠানোর জন্য ব্যবহৃত দড়িটি দিয়ে ঝুড়ির উপর যে টান প্রযুক্ত হচ্ছে, ধরা যাক, তার মান হল F। ঝুড়িটিকে 100 মিটার ওঠাতে যত জ্বালানি খরচ হয়, 100 মিটার উঠিয়ে আরো 100 মিটার ওঠালে

দ্বিগুণ জ্বালানি খরচ হবে। অর্থাৎ টান সমান রেখে দ্বিগুণ ওঠালে জ্বালানির খরচ বা কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে।

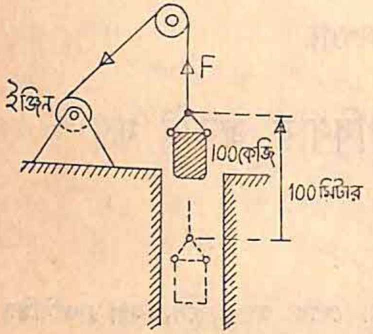


Fig 2·1

একই রকম 100 কেজির দুটি ঝুড়ি আলাদা দড়ি দিয়ে (প্রতিটি দড়ির উপর টান F) ঐ একই ইঞ্জিন দিয়ে যদি 100 মিটার ওঠানো যায় তবে ইঞ্জিনে দ্বিগুণ কাজ হবে, জ্বালানি দ্বিগুণ পুড়বে। দুটি ঝুড়িকেই যদি একই দড়ি দিয়ে ওঠানো হয় তাহলেও জ্বালানি দ্বিগুণ পুড়বে অর্থাৎ ইঞ্জিন দ্বিগুণ কাজ করেছে। এক্ষেত্রে দড়িতে টান পড়বে 2F। কাজেই দ্বিগুণ টানে সমান দূরত্ব গেলেও দ্বিগুণ জ্বালানি খরচ হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ কাজ করা হয়। অতএব কাজের পরিমাণ বা জ্বালানির খরচ প্রযুক্ত বলের মান F এবং বলের প্রয়োগবিন্দু যতটুকু সরেছে (S) তার সমানুপাতিক। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই আমরা বলতে পারি যে,

কোন বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করলে যদি বলের প্রয়োগবিন্দু স্থানচ্যুত হয় তবে প্রযুক্ত বল কার্য (work) করছে এবং প্রযুক্ত বল (F) ও বলের দিকে সরণ (S)-এর গুণফল দিয়ে এই কার্যের (W) পরিমাপ করা যায়। সুতরাং,

$$\text{কার্য} = \text{বল} \times \text{দূরত্ব} \quad \text{বা} \quad W = FS$$

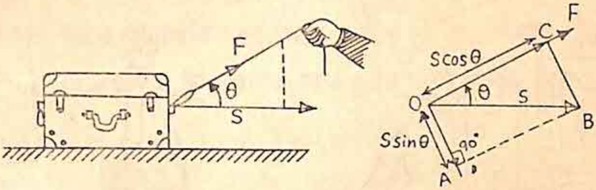
এরকম বহু উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে কার্যের এই সংজ্ঞাটি খুবই উপযুক্ত হয়েছে এবং বিজ্ঞানে এটাই হল কার্যের সংজ্ঞা।

যখন প্রযুক্ত বলের দিক আর সরণের দিক পৃথক (Fig. 2.2b), দুটির মধ্যে কোণ θ, তখন প্রযুক্ত বলের দিকে সরণের উপাংশ (component) হল $S \cos \theta$। কাজেই কার্যের সংজ্ঞানুসারে,

$$W = F \times S \cos \theta = FS \cos \theta = (F \cos \theta) \times S$$

$$= \text{সরণের দিকে বলের উপাংশ} \times \text{সরণ।}$$

ধর, একটা ট্রাঙ্ককে দড়ি দিয়ে টেনে মেঝের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ (Fig. 2.2a)। এখানে F বলটি পুরোপুরি কার্যকর নয়, F-এর অনুভূমিক উপাংশ $f = F \cos\theta$ই কেবল কার্যকর। এক্ষেত্রে ট্রাঙ্কটি S দূরত্ব সরলে কার্য হবে $fS = (F \cos\theta)\,S$, FS নয়।



(a)

(b) সরণ OB একটি ভেক্টর ($\vec{S}$)
সরণ OB = সরণ OA + সরণ AB
সরণ AB = সরণ OC = F বলের দিকে সরণ OB র উপাংশ।

Fig 2·2

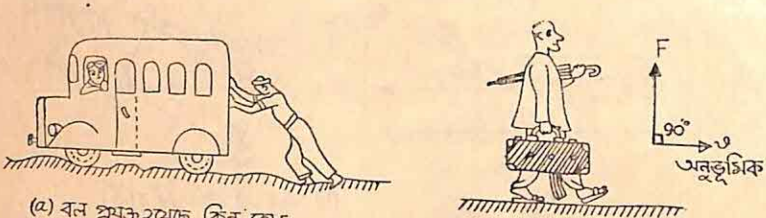
কার্যের সংজ্ঞায় দুটি রাশি রয়েছে, প্রযুক্ত বল ও প্রযুক্ত বলের দিকে সরণ। এদের মধ্যে যে-কোন একটি না থাকলে কার্য হবে না। একটা ভারী জিনিসকে ধাক্কা দিলে সেটা যদি একটুও না সরে (Fig. 2.3a) তবে যতই পরিশ্রম হোক না কেন কার্য হবে না। একটা সুটকেশকে হাতে ঝুলিয়ে রাখতে উপর দিকে বলপ্রয়োগ করতে হয়। সুটকেশটিকে হাতে ঝুলিয়ে অনুভূমিক তলে হেঁটে গেলে কোন কাজ হবে না (Fig. 2.3b) কেননা এক্ষেত্রে $\theta = 90^\circ$ এবং $\cos 90^\circ = 0$।

যদি বলের প্রয়োগবিন্দু বলের অভিমুখের বিপরীত দিকে সরে যায় ($\theta = 180^\circ$ এবং $\cos\theta = \cos 180^\circ = -1$) তবে কার্য $W = -FS$ অর্থাৎ ঋণাত্মক। এক্ষেত্রে বলের বিরুদ্ধে কার্য করা হচ্ছে বলা হয়। কোন ভারী জিনিসকে উপরে তুলতে অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে কার্য করতে হয়।

কার্যের একক = বলের একক × দৈর্ঘ্যের একক।

(ক) **পরম একক** (absolute units): সি. জি. এস. পদ্ধতিতে 1 ডাইন বল প্রযুক্ত হলে প্রয়োগবিন্দু 1 সে. মি. সরলে যতটুকু কার্য হয় তাকে 1 ডাইন-সেমি বা 1 আর্গ (erg) বলে। এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে একক হল 1 পাউণ্ডাল × 1 ফুট = 1 ফুট-পাউণ্ডাল (ft-poundal)।

(খ) অভিকর্ষীয় একক (gravitational units) : সি. জি. এস. পদ্ধতিতে 1 গ্রাম ভরসম্পন্ন বস্তুকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে 1 সেন্টিমিটার তুলতে যে কাজ করতে হয় তাকে 1 গ্রাম-সেন্টিমিটার (gm-cm) বলে। অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে 1 gm-cm = g dyne-cm = g erg। এফ.পি.এস. পদ্ধতিতে একক হল ফুট-পাউণ্ড (ft-pound)। 1 ft-pound = g ft-poundal।



(a) বল প্রযুক্ত হয়েছে কিন্তু কোন সরণ হয়নি : কাজ হচ্ছে না।

(b) হাতের টান উপর দিকে। সরণ অনুভূমিক। কোন কাজ হবে না।

Fig 2.3

(গ) ব্যবহারিক একক (practical units) : সাধারণ কাজকর্মের জন্য আর্গ এককটি খুব ছোট। এই উদ্দেশ্যে যে বড় এককটি ব্যবহার করা হয় তার নাম জুল (Joule)। 1 Joule = 10^7 erg।

2. শক্তি (Energy)

কাজ করতে করতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন বলি আমাদের শক্তি ফুরিয়ে গেছে, কাজ করার আর সামর্থ্য নেই। বিশ্রাম করে, খাদ্য গ্রহণ করে আমরা যখন তাজা হয়ে উঠি তখন আবার কাজ করার সামর্থ্য ফিরে পাই, বলি শক্তি ফিরে পেয়েছি। খাদ্য আমাদের শক্তি যোগায়। শক্তির এই সাধারণ ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানে শক্তি শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। বিজ্ঞানে, যা কাজ করতে পারে তারই শক্তি আছে বলে ধরা হয়। শক্তি কোন বস্তুকে কাজ করার সামর্থ্য জোগায়।

সংজ্ঞা : কোন বস্তুর কার্য করার সামর্থ্যকে তার শক্তি বলে।

শক্তি কি করে মাপব? ইঞ্জিনের কাজ করবার সামর্থ্য আসে তার জ্বালানি থেকে। শরীরকে একটা ইঞ্জিন বলে ধরলে তার জ্বালানি হল খাদ্য।

ইঞ্জিন যখন কাজ করতে থাকে, তার জ্বালানি ফুরিয়ে যেতে থাকে, ফলে তার কাজ করার সামর্থ্যও কমতে থাকে। জ্বালানি একেবারে ফুরিয়ে গেলে কাজ করার সামর্থ্যও আর থাকে না। কাজ করার সামর্থ্য কমলে শক্তিও কমে। ইঞ্জিন যত কাজ করছে তত তার শক্তি কমছে। এই শক্তি যাচ্ছে কোথায়? শক্তির ধ্বংসও নেই, সৃষ্টিও নেই। কাজেই কোন বস্তু যখন কাজ করে তখন তার শক্তি অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। শক্তি যে একই রূপে স্থানান্তরিত হয় তা নয়, অন্য রূপেও স্থানান্তরিত হতে পারে। রেলগাড়ী যখন চলে তখন

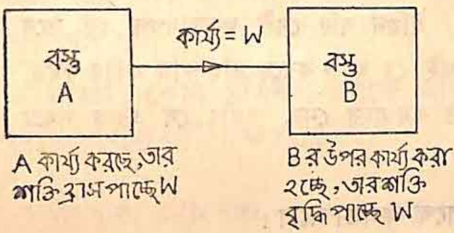


Fig 2·4
কার্য্যের মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তর (বা রূপান্তর) ঘটে।

গাড়ীর ইঞ্জিনের জ্বালানিতে সঞ্চিত শক্তি রূপান্তরিত হয় ছুটন্ত গাড়ীর শক্তিতে। তুমি যখন ঢিল ছোড় তখন তোমার মাংসপেশী যতটুকু শক্তি খরচ করে তা সঞ্চারিত হয় উৎক্ষিপ্ত ঢিলের শক্তিতে। প্রকৃতিতে যখনই কোন কার্য হয় তখন কোন বস্তুর শক্তি কমে, সে কার্য করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন বস্তুর শক্তি বাড়ে, তার উপর কার্যের মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তর বা রূপান্তর ঘটে। কার্য করার ফলে কোন বস্তুর কতটুকু শক্তি কমল অথবা কতটুকু শক্তি স্থানান্তরিত হল তা ঐ কার্যের পরিমাণ দিয়ে মাপা সম্ভব। কতটুকু জ্বালানি খরচ হল তার পরিমাণ দিয়েও ইঞ্জিনের কতটুকু শক্তি খরচ হল তা মাপা সম্ভব।

কোন বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় সে কতখানি কার্য করতে পারে তা দিয়ে। সুতরাং শক্তি ও কার্যের একক একই—আর্গ, ফুট-পাউণ্ডাল, ফুট-পাউণ্ড, জুল ইত্যাদি।

3. **ক্ষমতা (Power)**

আমাদের ইঞ্জিনটি প্রতিবার 100 কেজি কয়লা 100 মিটার উঁচুতে তোলে। কয়লার ঝুড়িটি খুব তাড়াতাড়ি ওঠালে ইঞ্জিন যে পরিমাণ কাজ করে, আস্তে ওঠালেও একই পরিমাণ কাজ করে। দুক্ষেত্রেই সমান জ্বালানি খরচ হয়। সুতরাং ইঞ্জিন কতটুকু কার্য করল সেটা জানলেই, ইঞ্জিন আস্তে না দ্রুত কাজ করছে তা বোঝা যাবে না। একজন শ্রমিক যদি মাথায় করে ঐ কয়লা উপরে ওঠায় তবে একবারে পারবে না। শ্রমিকটি দুর্বল হলে অনেক বার একটু একটু করে ওঠাবে, তাতে সময় লাগবে বেশী। একজন খুব জোয়ান শ্রমিক অনেক কম সময়েই কাজটি করতে পারবে। ইঞ্জিন একবারেই ঝুড়িটি ওঠাবে এবং আরো কম সময়ে। ইঞ্জিন যদি বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন হয় তবে সময় আরো কম লাগবে। কাজেই যে কাজ করছে তার কাজ করার ক্ষমতা যত বেশী, কোন কাজ করতে সে তত কম সময় নেয়, অর্থাৎ সে একক সময়ে তত বেশী কাজ করে।

সংজ্ঞা : কার্য করবার হারকে ক্ষমতা বলে।

অর্থাৎ **ক্ষমতা = কার্য/সময়।**

কোন বস্তু t সময়ে W কার্য করলে তার ক্ষমতা $P = W/t$

যদি বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা বিভিন্ন হয় তবে উপরের সম্বন্ধ থেকে যা পাওয়া যাবে তা হল ঐ t সময়ে বস্তুটির গড় ক্ষমতা (average power)।

ক্ষমতার একক :

(ক) **পরম একক :** সি. জি. এস. পদ্ধতিতে 1 আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে এবং এফ.পি.এস. পদ্ধতিতে 1 ফুট-পাউণ্ডাল প্রতি সেকেণ্ডে।

(খ) **ব্যবহারিক একক :** সি. জি. এস. পদ্ধতিতে একক হল 1 জুল প্রতি সেকেণ্ডে বা 1 ওয়াট (Watt)। 1000 ওয়াটকে 1 কিলোওয়াট (kilowatt বা KW) বলা হয়। এটি একটি বড় একক। এফ.পি. এস. পদ্ধতিতে ব্যবহারিক একক হল **অশ্বক্ষমতা** বা **হর্স-পাওয়ার** (Horse power বা H.P)। এক অশ্বক্ষমতা বলতে 550 ফুট-পাউণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে বোঝায়। 1 H.P প্রায় 746 ওয়াটের সমান।

4. **স্থিতিশক্তি (Potential energy) ও গতিশক্তি (Kinetic energy)**

শক্তি কিভাবে মাপতে হবে তা আমরা একটু আগে দেখলাম। এবার পদ্ধতিটি যান্ত্রিক শক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক। যান্ত্রিক শক্তি দু'রকমের, বস্তুর গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গতিশক্তি এবং বস্তুর অবস্থান বা স্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থিতিশক্তি।

(ক) **গতিশক্তি :** পাহাড়ী নদীর তীব্র স্রোতে বড় বড় পাথরের টুকরা পর্যন্ত স্থানচ্যুত হয়ে গড়াতে গড়াতে চলে। একটা হাতুড়ী জোরে চালিয়ে দেওয়ালে পেরেক ঢোকানো যায়। পাথর সরাতে বা পেরেক ঠুকতে কিছু কাজ করতে হয়। এজন্য শক্তি লাগে। জল বা হাতুড়ীর কাজ করার শক্তি এসেছে তাদের গতি থেকে।

সংজ্ঞা : কোন গতিশীল বস্তুতে তার গতির জন্য যে শক্তি বর্তায় তাকে বস্তুটির গতিশক্তি বলে।

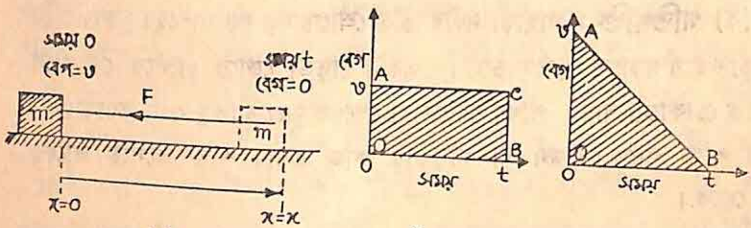
ধরা যাক, কোন বস্তুর ভর m এবং কোন সময়ে তার বেগ $\vec{v}$। গতির এই অবস্থায় বস্তুটির গতিশক্তি কত? এই বস্তুটিকে বল প্রয়োগ করে থামাতে গেলে থেমে যাবার আগে পর্যন্ত ঐ বলের বিরুদ্ধে বস্তুটি যতখানি কার্য করতে পারবে তাই বস্তুটির গতিশক্তির পরিমাপ। এই কার্যের পরিমাণ হল $\frac{1}{2}mv^2$।

বস্তুটির গতির বিপরীত দিকে একটা নির্দিষ্ট বল F প্রয়োগ করলে বস্তুটির বেগ কমতে থাকবে এবং আস্তে আস্তে থেমে যাবে। যতক্ষণ না বস্তুটি থামছে ততক্ষণ বল প্রয়োগ করা হল, থামার সঙ্গে সঙ্গে বলও সরিয়ে নেওয়া হল। ধরা যাক, t সময় ধরে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সময়ে বস্তুটি গিয়েছে x দূরত্ব (Fig. 2.5a)। কাজেই বস্তুটি কার্য করেছে $W = Fx$। বস্তুটির ভর m, প্রযুক্ত বল F, অতএব মন্দন $f = F/m$ অর্থাৎ $F = mf$। স্থতরাং $W = mfx =$ গতি-শক্তি। কিন্তু $x = \frac{1}{2}vt$ (Fig. 2.5c) এবং $f = v/t$, স্থতরাং $fx = \frac{1}{2}vt.\ v/t = \frac{1}{2}v^2$ এবং $W = \frac{1}{2}mv^2$।

কাজেই বস্তুটির বেগ যখন $\vec{v}$ তখন বস্তুটির গতিশক্তি $= \frac{1}{2}mv^2$।

কোন বস্তুর উপর গতির দিকে বল প্রয়োগ করা হলে তার বেগ বাড়ে, ফলে গতিশক্তি বাড়ে। **কাজেই কোন বস্তুর উপর কার্য করা হলে সেই**

বস্তুর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। বস্তুর গতির উল্টো দিকে বল প্রয়োগ করা হলে বেগ কমে, গতিশক্তিও কমে। এক্ষেত্রে বস্তুটি বলের বিরুদ্ধে কার্য করছে। কাজেই **বস্তুটি কার্য করলে তার গতিশক্তি কমে ;** গতিশক্তি যতখানি কমে বস্তুটি ততখানি কার্য করে।



(a)

(b) বেগ একই রয়েছে। t সময়ে দূরত্ব অতিক্রান্ত = v×t = OBCA আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।

(c) বেগ কমছে নির্দিষ্ট হারে। এখানেও দূরত্ব অতিক্রান্ত হল AOB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল। অর্থাৎ $x = \frac{1}{2} v \times t$ ।

Fig 2.5

(খ) **স্থিতিশক্তি :** ধর তুমি একটি ঢিলকে উপর দিকে ছুঁড়লে। ঢিল আর পৃথিবীর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের জন্য ঢিলটা কিছুদূর পর্যন্ত উপরে উঠে আবার মাটিতে ফিরে আসে। এই সমস্তটা পথে ঢিলের বেগ বদলায়, যত উপরে ওঠে তত বেগ কমে, একটা উচ্চতায় গতিবেগ শূন্য হয় এবং সেখান থেকে নীচে পড়তে থাকে। কাজেই ঢিলের গতিপথে গতিশক্তি সব সময় সমান থাকে না। যত উপরে উঠতে থাকে গতিশক্তি তত কমতে থাকে, এক সময় শূন্য হয়ে যায়, নামার সময় ঢিলটি আবার গতিশক্তি ফিরে পায়, যত নামতে থাকে গতিশক্তি তত বাড়তে থাকে। যখন গতিশক্তি কম ছিল তখন সেই শক্তি কোথায় গেল ? পরে যখন গতিশক্তি আবার ফিরে পাওয়া গেল তখন নিশ্চয়ই অন্তর্বর্তী সময়ে শক্তি কোথাও জমা হয়ে ছিল। এই জমা-হয়ে-থাকা শক্তিকে বলা হয় **স্থিতিশক্তি**। বস্তু আর তার পারিপার্শ্বিকের বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানের জন্যই বস্তুর এই শক্তি।

সংজ্ঞা : অবস্থা বা অবস্থানের জন্য বস্তুতে যে শক্তি বর্তায় তাই তার স্থিতিশক্তি। অবস্থা বা অবস্থান পরিবর্তিত হলে স্থিতিশক্তিও

পরিবর্তিত হয়। অবস্থা বা অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বস্তুটি যতটুকু কার্য করতে পারে সেটাই বস্তুটির স্থিতিশক্তির পরিবর্তনের পরিমাপ।

m ভরসম্পন্ন বস্তুকে উপর দিকে (খুব আস্তে আস্তে) তুলতে (কম করে) mg বল লাগে (Fig. 2.6)। বস্তুটিকে মাটি থেকে h উচ্চতা পর্যন্ত তুলতে বস্তুটির উপর কার্যের পরিমাণ হল $W = mgh$ = বস্তুটির স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি।

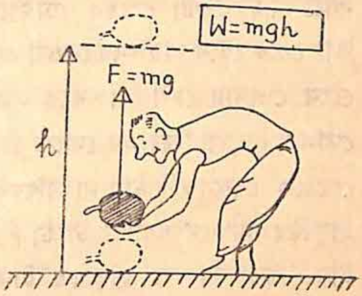


Fig 2.6

গতির ক্ষেত্রে বেগ $\vec{v}$ হলে, গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2$। mgh কিন্তু (পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছে অভিকর্ষের জন্য) **স্থিতিশক্তির পরিবর্তনমাত্র,** পরম স্থিতিশক্তি নয়। পরম স্থিতিশক্তি জানতে হলে তা মাপতে হবে সেই অবস্থা থেকে যে অবস্থায় পরম স্থিতিশক্তি (U) শূন্য। প্রশ্ন হল, সেই অবস্থা কোন্‌টা (Fig. 2.7)? আসলে, যে-কোন একটা অবস্থাতে স্থিতিশক্তি শূন্য ধরে নিলেই চলে। পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থিতিশক্তি শূন্য ধরলে, বস্তুটিকে h উচ্চতায় ওঠালে স্থিতিশক্তি বাড়ে mgh। পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থিতিশক্তি শূন্য ধরলে, ধরা যাক, পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থিতিশক্তি U_0 এবং তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় স্থিতিশক্তি $U_0 + mgh$। কাজেই উপর দিকে h উচ্চতায় বস্তুটিকে ওঠালে স্থিতিশক্তির পরিবর্তন $= (U_0 + mgh) - U_0 = mgh$। স্থিতিশক্তির শূন্য যেখানেই ধরি না কেন, স্থিতিশক্তির পরিবর্তন সঠিকই পাব। যখন তুমি ঢিলটি ছুঁড়লে তখন ঢিলের গতিশক্তি ছিল $\frac{1}{2}mv^2$। ঢিলটি h উচ্চতা পর্যন্ত উঠে আবার নীচের দিকে নামল। h উচ্চতায় যখন পৌছাল তখন তার স্থিতিশক্তি বেড়েছে mgh আর গতিশক্তি কমেছে $\frac{1}{2}mv^2$। আমরা আগেই দেখেছি যে $fx = \frac{1}{2}v^2$। এখানে $f = g$, অভিকর্ষজ ত্বরণ এবং $x = h$। কাজেই $\frac{1}{2}mv^2 = m(\frac{1}{2}v^2) = mgh$। অর্থাৎ গতিশক্তির হ্রাস = স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি। মোট শক্তির পরিমাণ একই থাকছে।

5. **সরল যন্ত্রাদি** (Simple machines)

কাজ করতে গেলে বল প্রয়োগ করে প্রয়োগবিন্দুর সরণ ঘটাতে হয়। অনেক সময় সোজাসুজি বল প্রয়োগ করলে এই সরণ ঘটানো সম্ভব হয় না। যেমন কাঠে যদি একটা পেরেক ঢোকানো থাকে তবে শুধু আঙুল দিয়ে পেরেকটিকে কাঠ থেকে টেনে বার করে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই শুধু আঙুলে টেনে তোলার চেষ্টা না করে একটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। পেরেক তোলার হাতুড়ি দিয়ে এক মোচড় দিলে পেরেক সহজেই উঠে আসে। এক্ষেত্রে পেরেকে সোজাসুজি টান না দিয়ে তুমি হাতুড়ির হাতলে বল প্রয়োগ করছ। হাতুড়ির মাধ্যমে অবশেষে টানটা গিয়ে পড়ে পেরেকে। আঙুলে তুমি যতখানি টান দিতে পারতে, হাতুড়ির টানটা অবশ্যই তার চেয়ে বেশী, পেরেকটির উঠে আসতে যত বাধা সব অতিক্রম করতে সক্ষম। হাতুড়ির হাতলে বল প্রয়োগ করে তুমি পেরেকে বেশী বল প্রয়োগ করতে পেরেছ। এরকম কৌশলকে **যন্ত্র** বলে।

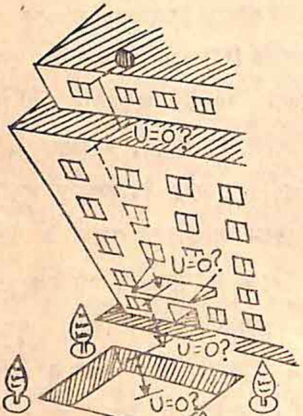


Fig 2·7 কোথা থেকে পরম স্থিতিশক্তি মাপব?

সংজ্ঞা: যে কৌশলের সাহায্যে এক জায়গায় কোন বল প্রয়োগ করে অন্যত্র কোন বল (সাধারণত বেশী) উৎপন্ন করা যায়, তাকে যন্ত্র বলে। যন্ত্রের উপর প্রযুক্ত বলকে **উদ্যম** (effort)

বলা হয়। যন্ত্রে উৎপন্ন বল দিয়ে কোন বাধা (esistance) বা ভার (load) সরানো যেতে পারে।

যন্ত্রের একটা সুবিধা হল যে উদ্যম প্রয়োগ করা যায় সুবিধাজনক জায়গায়। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে তুমি পাড়ে বসে ছিপের এক প্রান্তে বল প্রয়োগ করে পাড় থেকে অনেক দূরে ছিপের আর এক প্রান্তে সুতোয় টান দিতে পার। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রে কম বল প্রয়োগ করে বেশী বল উৎপন্ন করা যায়, যেমন পেরেক তোলার হাতুড়িতে (Fig. 2.10e)। তৃতীয়ত, প্রযুক্ত বলের সরণ কম হলেও বাধাকে অনেক দূর পর্যন্ত সরানো যেতে পারে, যেমন ছিপের এক প্রান্তে একটু মোচড় দিয়েই মাছকে জল থেকে ডাঙায় এনে ফেলা যায় (Fig. 2.11e)। যন্ত্রের এ সমস্ত সুবিধার জন্যই দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতি পদে কোন না কোন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি।

যন্ত্র যতই জটিল হোক না কেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তারা কয়েকটি মূল অংশের সমষ্টি। এই মূল অংশগুলিও নিজেরা এক একটি যন্ত্র বিশেষ। এরা হল (i) আনত তল (inclined plane) (ii) লিভার (lever) (iii) চাকা ও অক্ষদণ্ড (wheel and axle) ইত্যাদি। এদের **সরল যন্ত্র** (Simple machines) বলা হয়। সব সরল যন্ত্রেরই মূল কার্য-প্রণালীটি এক (Fig. 2.8)। বাধা (w)কে y দূরত্ব সরাতে যন্ত্রকে কার্য করতে হয় wy। যন্ত্রকে দিয়ে এই কাজ করাতে উদ্যম Fকে কার্য করতে হয় FS। যন্ত্রে ঘর্ষণ ইত্যাদি থাকলে তার বিরুদ্ধেও কার্য করতে হয়। তার পরিমাণ W_f হলে, শক্তির নিত্যতার সূত্রানুযায়ী

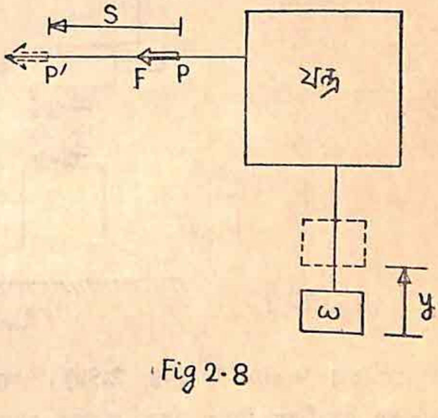


Fig 2·8

$$FS = wy + W_f$$

কেবল আদর্শ অবস্থাতেই $W_f = 0$ হয় এবং তখন $FS = wy$ হতে

পারে। যেহেতু কিছু না কিছু ঘর্ষণ সব সময়েই থাকে, সেজন্য wy সব সময়েই FS থেকে কম। যন্ত্রকে চালাতে যতটুকু কার্য করা হয় যন্ত্র সব সময়েই তার থেকে কিছু কম কার্য করে। **যন্ত্র কম কার্য করে, যন্ত্র থেকে কখনই বেশী কার্য পাওয়া সম্ভব নয়।**

(ক) **আনত তল :** মসৃণ আনত তলে কোন ভার তুলতে, ভার-এর থেকে অনেক কম বল প্রয়োগ করলেই চলে। আনত তল AB বরাবর বস্তুটির ভার-এর

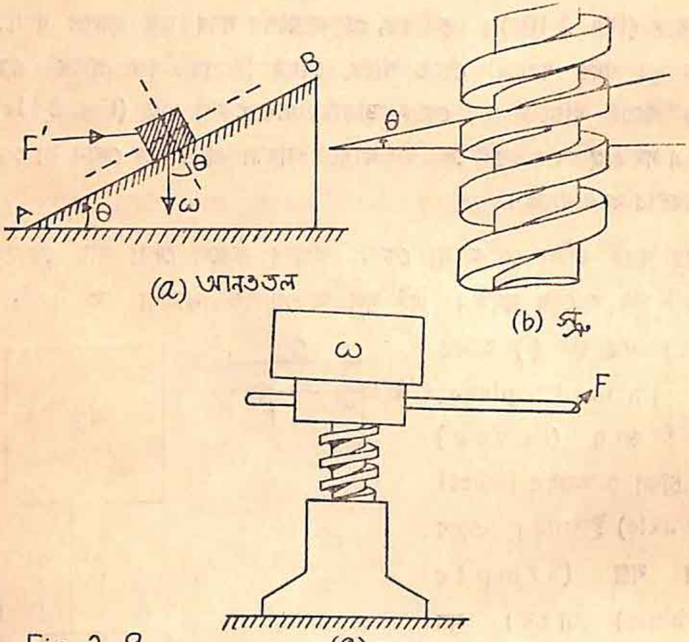


Fig 2·9

উপাংশ হল w sin θ (Fig. 2.9a)। আনত তল বরাবর এই বল প্রয়োগ করলেই ভারটিকে উপর দিকে সরানো যাবে। যখন আনত কোণ θ ছোট তখন sin $\theta << 1$। কাজেই w sin $\theta << w$। আনত তলের একটি উদাহরণ হল স্ক্রু। স্ক্রুতে একটি আনত তল যেন একটি অক্ষকে পেঁচিয়ে রয়েছে (Fig. 2.9b)। গাড়ী তুলতে যে স্ক্রু-জ্যাক (Screw jack) (Fig. 2.9c) ব্যবহৃত হয় তা বা বই বাঁধাইয়ের স্ক্রু-প্রেস্ (Screw press) আনত তলেরই উদাহরণ।

(খ) **লিভার :** একটি রড বা দণ্ডকে যদি কোন একটি স্থির বিন্দুর (fixed point) সাপেক্ষে ঘোরানো যায় তবে সেটি একটি লিভার। স্থির বিন্দুটিকে **আলম্ব** (fulcrum) বলে। আলম্ব রডটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে। তাদের লিভারের বাহু (arm) বলা হয়। লিভারে উদ্যম ও বাধা আলম্বের দু'দিকে হতে পারে (Fig. 2.10)। এদের **প্রথম শ্রেণীর লিভার** বলা হয়। লিভারে উদ্যম ও বাধা আলম্বের একই দিকে হতে পারে (Fig. 2.11)। এক্ষেত্রে বাধা আলম্বের নিকটতর হলে তাকে **দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার** এবং উদ্যম আলম্বের নিকটতর হলে তাকে **তৃতীয় শ্রেণীর লিভার** বলা হয়। কতরকমভাবে আমরা লিভার ব্যবহার করি, তা Fig. 2.10 ও Fig. 2.11-এ দেখানো হয়েছে। যদি কোন লিভারকে বল প্রয়োগ করে θ কোণে ঘোরানো হয় তবে (Fig. 2.10a) $S = a\theta$ এবং $y = b\theta$ (θ ছোট হলে)। কাজেই (ঘর্ষণ না থাকলে) $wy = wb\theta = FS = Fa\theta$ ।

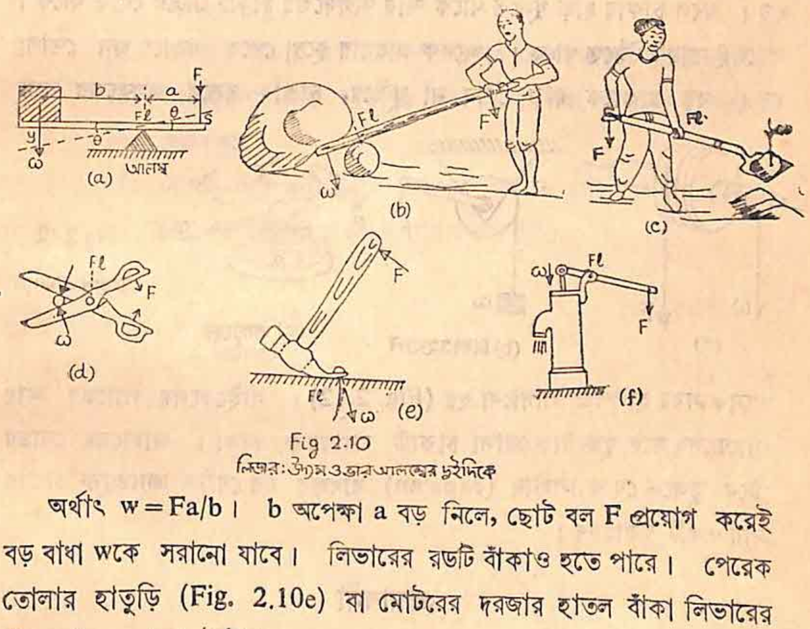


Fig 2.10
লিভার: উদ্যম ও ভার আলম্বের দুইদিকে

অর্থাৎ $w = Fa/b$ । b অপেক্ষা a বড় নিলে, ছোট বল F প্রয়োগ করেই বড় বাধা wকে সরানো যাবে। লিভারের রডটি বাঁকাও হতে পারে। পেরেক তোলার হাতুড়ি (Fig. 2.10e) বা মোটরের দরজার হাতল বাঁকা লিভারের (bent levers) প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(গ) **চাকা ও অক্ষদণ্ড :** এটিও এক রকম লিভার। অক্ষদণ্ডটি বেলানাকৃতি একটি দণ্ড। চাকাটিও বেলনাকৃতি এবং অক্ষদণ্ডের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত। চাকা

ও অক্ষদণ্ড দুটি একই সঙ্গে ঘোরে। অক্ষদণ্ড ও চাকার ব্যাস বিভিন্ন। অক্ষদণ্ডে একটি দড়ি প্যাঁচানো থাকে। এই দড়ির এক প্রান্ত অক্ষদণ্ডে লাগানো থাকে। অন্য প্রান্তে থাকে ভার w। চাকাতে আর একটি দড়ি উল্টোভাবে প্যাঁচানো থাকে। এই দড়ির এক প্রান্ত চাকায় লাগানো। অন্য প্রান্তে বল-প্রয়োগ করা

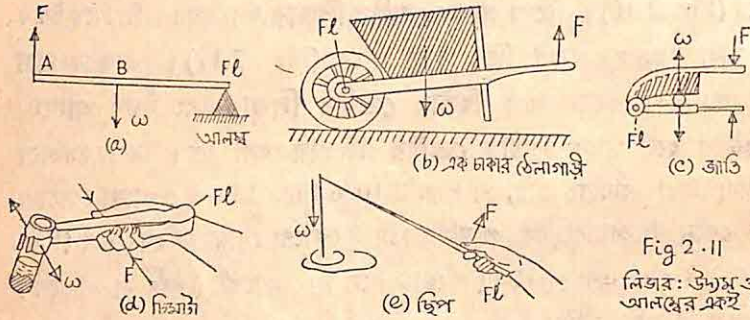


Fig 2.11
লিভার: উদ্যম ও ভার আলম্বের একই দিকে।

হয়। ফলে চাকায় দড়ি খুলতে থাকে আর অক্ষদণ্ডের দড়িটি গুটিয়ে যেতে থাকে। কাজেই ভারটি উঠতে থাকে। অনেক জায়গায় কূয়ো থেকে এভাবে জল তোলা হয়। বড় চাকাকে দড়ি টেনে না ঘুরিয়ে, চাকার বদলে অক্ষদণ্ডের সঙ্গে

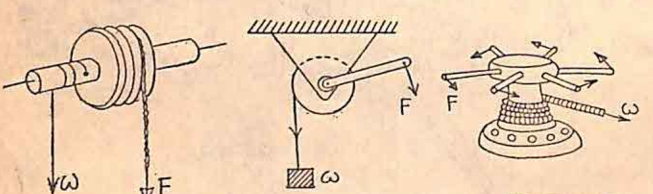


Fig 2.12
চাকা ও অক্ষদণ্ড

অনেক সময় হাতলও লাগানো হয় (Fig. 2.12)। সাইকেলের প্যাডেল আর প্যাডেলের সঙ্গে যুক্ত দাঁতওয়ালা চাকাটি ক্র্যাঙ্কযুক্ত চাকা। জাহাজের নোঙর টেনে তুলতে যে ক্যাপস্টান (capstan) ব্যবহৃত হয় সেটিও ক্র্যাঙ্কযুক্ত চাকার আর একটি উদাহরণ।

প্রশ্নাবলী

1. কার্য কাকে বলে? কার্য কিভাবে মাপবে? সি.জি.এস্. পদ্ধতিতে কার্যের পরম, অভিকর্ষীয় এবং ব্যবহারিক একক কি? কোন্ অবস্থায় কার্য হয় না?

2. শক্তি কাকে বলে? কোন বস্তুর শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস কিভাবে মাপা সম্ভব? শক্তির একক কি? শক্তি ও ক্ষমতা বলতে কি একই জিনিস বোঝায়? তাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

3. স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি বলতে কি বোঝায় তা উদাহরণ সহকারে বল। কোন বস্তুর পরম স্থিতিশক্তি কি মাপা সম্ভব? কোন বস্তুর গতিশক্তি কোন্ কোন্ রাশির উপর নির্ভর করে?

4. যন্ত্র কি? লিভার কাকে বলে? বাঁকা লিভারের কয়েকটি উদাহরণ দাও। স্ক্রু-জ্যাক কি পদ্ধতিতে কাজ করে?

5. ভুল থাকলে সংশোধন কর :—

(a) কার্য করবার সামর্থ্যকে ক্ষমতা বলে।

(b) যে যত দ্রুত কাজ করতে পারে তার শক্তি তত বেশী।

(c) যন্ত্র চালাতে কম শক্তি খরচ হয়, যন্ত্র দিয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়।

(d) স্থপারি কাটার জাতি আনত তলের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(e) পেরেক-তোলার হাতুড়ি, ক্যাপস্টান এবং স্ক্রু একই ধরনের সরল যন্ত্র।

(f) মাথায় ভারী ট্রাঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম হয়; কারণ, এজন্য প্রচুর কার্য করতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

তাপের স্বরূপ

1. তাপ (Heat) ও উষ্ণতা (Temperature)

উনুনের গন্‌গনে আগুনে একটা লোহার শিকের একপ্রান্ত ঢুকিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর প্রান্তটি গরম হয়ে উঠতে থাকবে। শেষে এমন গরম হবে যে হাতে আর ছোঁয়া যাবে না। **যে কারণে ঠাণ্ডা জিনিস গরম হয়ে ওঠে তাকে বলা হয় তাপ।** দুটি বস্তু, একটি গরম একটি ঠাণ্ডা, পাশাপাশি গায়ে গা ছুঁইয়ে রাখলে দেখা যায় গরম বস্তুটি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা বস্তুটি ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে। ঠাণ্ডা বস্তুটি গরম হয়ে উঠলে আমরা বলি তাতে তাপের সঞ্চার হয়েছে এবং তাপ সঞ্চারিত হয়েছে গরম বস্তুটি থেকে। কোন বস্তুতে তাপ সঞ্চারিত হলে যে সেটা কেবল আরো গরম হয়ে ওঠে তাই নয়। এক কেটলি জল উনুনে চাপিয়ে দাও, জল গরম থেকে আরো গরম হয়ে অবশেষে ফুটতে থাকবে। তাপের সঞ্চারে যে বরফ গলে জল হয় বা জল ফুটে বাষ্প হয় এ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা।

তাপ নেই কোন্ জিনিসে? কুয়োর জল ঠাণ্ডা, কিন্তু তাতে এক টুকরো বরফ ফেলে দিলে সেটা কুয়োর জলের তাপে গলে জল হবে। বরফের চাঁই (slab)-এর মধ্যে বাটির মত গর্ত করে তাতে তরল অক্সিজেন (liquid oxygen) ঢেলে দাও, দেখবে বরফের তাপে তরল অক্সিজেন টগ্‌বগ্ করে ফুটছে।

এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চারিত হবে কি হবে না তা কিন্তু বস্তু দুটির তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এক গামলা জল থেকে ছোট এক বাটি জল আলাদা করে নিলে, বাটির জল থেকে গামলার জলেই বেশী তাপ থাকবে, কিন্তু গামলা আর বাটি গায়ে গা ঠেকিয়ে রাখলে কোন

রকম পরিবর্তন দেখা যাবে না। **এক বস্তু থেকে তাপ অন্যত্র সঞ্চারিত হবে কি না এ ব্যাপারটি যে কারণের উপর নির্ভর করে তাকে উষ্ণতা বলে।** দুটি বস্তু পরস্পরকে স্পর্শ করলে যদি একটি থেকে অন্যটিতে তাপের সঞ্চার না হয় তবে বস্তু দুটির উষ্ণতা এক। যদি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপের সঞ্চার হয় তবে প্রথমটির উষ্ণতা অন্যটির অপেক্ষা বেশী বলে ধরা হয়।

কোন জিনিসের উষ্ণতা কি রকম তা আমরা স্পর্শদ্বারা অনুমান করতে পারি। আমাদের হাতেরও একটা উষ্ণতা আছে। যে-জিনিস হাতের চেয়ে উষ্ণ তা হাতে গরম ঠেকে; যা হাতের চেয়ে কম উষ্ণ, তা হাতে ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। তবে স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে না। এক হাত ঠাণ্ডা জলে, অন্য হাত খুব গরম জলে কিছুক্ষণ রেখে দুটি হাতই একসঙ্গে অল্প গরম জলে রাখলে সেই একই জল এক হাতে গরম অন্য হাতে ঠাণ্ডা বলে বোধ হয় (Fig. 3.1)।

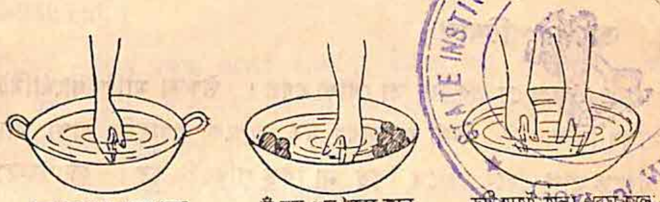


Fig. 3.1 : কোনটা তপ্ত, কোনটা শীতল তা স্পর্শ দিয়ে বোঝা যায়, তবে খুব সঠিক ভাবে নয়।

উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সব জিনিসেরই কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়। কঠিন, তরল, বায়বীয় সব পদার্থই সাধারণত যত উষ্ণ হয় তত আয়তনে বাড়ে। এই আয়তনের বৃদ্ধি থেকে উষ্ণতার পরিমাপ করা যায়। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন উষ্ণতা-মাপক যন্ত্র বা থার্মোমিটার নির্মিত। বৈজ্ঞানিক কাজে উষ্ণতা মাপা হয় থার্মোমিটারে।

তাপ ও উষ্ণতা এক নয়। উষ্ণতা তাপের একটি লক্ষণ মাত্র। দুটি বস্তুর উষ্ণতা এক হলেও তাপের পরিমাণে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে। আবার একই তাপ দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের উষ্ণতা বৃদ্ধি বিভিন্ন হতে পারে। এক মগ

ফুটন্ত জল ঢাললে বালতির জল যে গরম হয় তা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু পুকুরে ঢাললে টেরই পাওয়া যায় না। দুটি বস্তুর তাপের পরিমাণে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উষ্ণতায় পার্থক্য না থাকলে একটি থেকে অন্যটিতে তাপের সঞ্চার হয় না।

পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব থেকে আমরা তাপ ও উষ্ণতার যে ব্যাখ্যা পাই তা সংক্ষেপে এরকম। পদার্থ মাত্রেরই অণুগুলি গতিশীল, তাদের গতিশক্তি আছে। অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক অন্তরকর্ষণের (interaction) জন্য তাদের স্থিতিশক্তিও রয়েছে। উষ্ণতা অণুগুলির গতিশক্তির পরিচায়ক। অণুগুলির সম্মিলিত গতি ও স্থিতিশক্তির উপর তাপ নির্ভর করে। যখন গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় তখন তাপও বৃদ্ধি পায়, উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়। যখন শুধু স্থিতিশক্তির পরিবর্তন হয় (যেমন অবস্থার পরিবর্তনে), তখন তাপশক্তির পরিবর্তন হয় কিন্তু উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকে।

2. তাপের পরিমাপ

তাপ ও উষ্ণতা যে এক নয় তা বোঝা গেল। উষ্ণতা মাপি থার্মোমিটারে। তাপ মাপব কিভাবে? দৈর্ঘ্য বা ভরের মত তাপকে সরাসরি মাপা যায় না। কোন বস্তুতে তাপ দিলে তাতে কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়। হয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় নতুবা দশান্তর (change of phase) ঘটে। কতটুকু পরিবর্তন হল তা দেখে কতখানি তাপ ঐ পরিবর্তনের জন্য দায়ী তা অনুমান করা সম্ভব। এভাবেই তাপ মাপা হয়ে থাকে এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন পরিবর্তন ঘটাতে যতটুকু তাপ লাগে তাকে তাপের একক হিসাবে নেওয়া হয়। সাধারণত তাপের একক নির্দিষ্ট করা হয় উষ্ণতার পরিবর্তন থেকে।

তাপের একক : বিশুদ্ধ জলের একক ভরের উষ্ণতা এক ডিগ্রি বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকেই একক তাপ বলা হয়।

এই সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাপের তিনটি একক প্রচলিত। তারা হল **ক্যালরি** (calorie বা cal.), **কিলো-ক্যালরি** (kilo-calorie বা kcal.) এবং **ব্রিটিশ তাপ একক** (British thermal unit বা Btu)। এ ছাড়া একটি মিশ্র এককও রয়েছে।

(i) **ক্যালরি :** এক গ্রাম জলের উষ্ণতা $1^\circ C$ বৃদ্ধি করতে যে তাপ লাগে তাকে **ক্যালরি** বলে। এটি সি.জি.এস. একক।

এক কিলো-ক্যালরি বা **বড় ক্যালরি** 1000 ক্যালরির সমান। (ii) **ব্রিটিশ তাপ একক :** এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা $1^\circ F$ (ফারেনহাইট) বৃদ্ধি করতে যে তাপ লাগে তাকে **ব্রিটিশ তাপ একক** বলে। এটি এফ. পি. এস. একক।

(iii) **পাউণ্ড ডিগ্রি সেলসিয়াস একক :** এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা $1^\circ C$ বৃদ্ধি করতে যে তাপ লাগে তাকে **পাউণ্ড ডিগ্রি সেলসিয়াস** একক (pound degree Celsius বা lb°C) বলে। এটি এফ. পি. এস.-সি. জি. এস. মিশ্র একক।

যেহেতু 1 lb = 454 gm, $1^\circ F = 5/9^\circ C$, অতএব এক ব্রিটিশ তাপ এককে 454 gm জলের উষ্ণতা $5/9^\circ C$ বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং $1 \text{ Btu} = 454 \times 5/9$ cal. = 252 cal.।

উপরের সংজ্ঞায় কিন্তু জলের প্রাথমিক উষ্ণতা কত ছিল তা বলা হয়নি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন প্রাথমিক উষ্ণতায় 1 ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ লাগে। $0^\circ C$ থেকে $1^\circ C$ পর্যন্ত বা $50^\circ C$ থেকে $51^\circ C$ পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যে তাপ লাগে তাদের পরিমাণ সমান নয়। কাজেই তাপের এককের সংজ্ঞায় প্রাথমিক উষ্ণতাটিও নির্দিষ্ট করা দরকার। সি.জি.এস. পদ্ধতিতে সাধারণত এই উষ্ণতা বৃদ্ধি ধরা হয় $14.5^\circ C$ থেকে $15.5^\circ C$ পর্যন্ত এবং ক্যালরি বলতে এই $15^\circ C$ ক্যালরিকেই বোঝায়। এফ.পি.এস. পদ্ধতিতে এই উষ্ণতা বৃদ্ধি ধরা হয় $63^\circ F$ থেকে $64^\circ F$ পর্যন্ত।

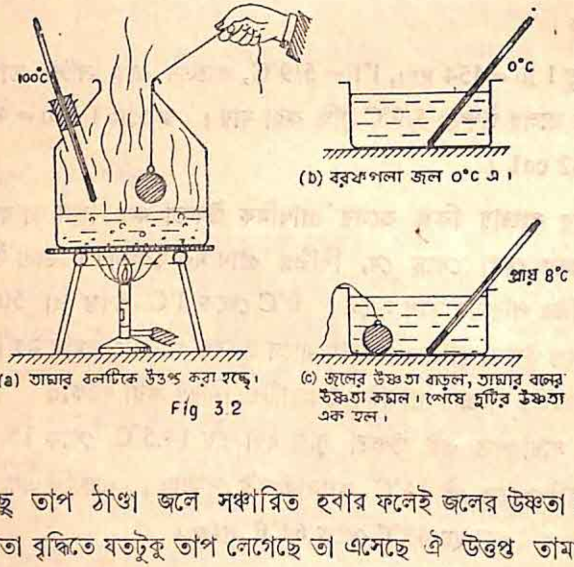
তাপের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে ?

কোন বস্তুর উষ্ণতার পরিবর্তন করতে যে তাপ লাগে তার পরিমাণ কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। মনে কর, এক কিলো তেলে কিছু তাপ দেওয়ায় তার উষ্ণতা 20 ডিগ্রি বাড়ল। আর এক কিলো তেলে ঠিক ততটা তাপ দিলে উষ্ণতাও আগের সমান অর্থাৎ 20 ডিগ্রিই বাড়বে। কাজেই 20 ডিগ্রি উষ্ণতা বাড়াতে এক কিলো তেলে যতটা তাপ লাগে, দুই কিলোতে তার দ্বিগুণ, তিন কিলোতে তার তিনগুণ লাগবে। **সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা**

বৃদ্ধির জন্য যে তাপ লাগে তার পরিমাণ বস্তুর ভরের সমানুপাতী। উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বস্তুতে যতটুকু তাপ দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ H হলে

$$H \propto m \text{ (m বস্তুর ভর)}$$

এক কিলো বরফজল (0°C) নাও। এক কিলো তামাকে 100°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করে এই জলের মধ্যে ফেলে দিলে দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যে দুইয়েরই উষ্ণতা সমান হয়েছে, প্রায় 8°C-এর মত (**Fig. 3.2**)। জলের উষ্ণতা যৎসামান্য বেড়েছে কিন্তু তামার উষ্ণতা কমেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। উত্তপ্ত তামা



(b) বরফগলা জল 0°C এ।

(a) তামার বলটিকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে।

(c) জলের উষ্ণতা বাড়ল, তামার বলের উষ্ণতা কমল। শেষে দুটির উষ্ণতা এক হল।

Fig 3.2

থেকে কিছু তাপ ঠাণ্ডা জলে সঞ্চারিত হবার ফলেই জলের উষ্ণতা বেড়েছে। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যতটুকু তাপ লেগেছে তা এসেছে ঐ উত্তপ্ত তামা থেকে; উত্তপ্ত তামার পিণ্ডটি ঠাণ্ডা হবার সময় সমপরিমাণ তাপ হারিয়েছে। যে তাপ হারাবার ফলে এক কিলো তামার উষ্ণতা 100°C থেকে প্রায় 8°C-এ নামল সেই একই তাপে সমপরিমাণ জলের উষ্ণতা বেড়েছে মাত্র 8°C-এর মত। অর্থাৎ একই তাপে বিভিন্ন জিনিসের উষ্ণতা বৃদ্ধি বিভিন্ন হয়। **কাজেই একই উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য তাপের পরিমাণ পদার্থের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এই তাপের পরিমাণ বিভিন্ন হয়।**

একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নিয়ে তাকে নির্দিষ্ট সময় ধরে গরম করে দেখা গেল ΔT ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়েছে (Fig. 3.3)। ঐ

পাত্রের জল ফেলে আবার সমপরিমাণ জল ঐ সমান সময় ধরে গরম করলে যদি দেখা যায় এবারও উষ্ণতা বৃদ্ধি $\triangle T$ (উচ্চারণ ডেল্‌টা টি) ডিগ্রিই হয়েছে তবে বোঝা গেল যে বার্নারটি একটি নির্দিষ্ট হারে তাপ দিচ্ছে। জলটি গরম করতে থাকলে দেখা যাবে যে ঐ সময়ের দ্বিগুণ সময়ে উষ্ণতা বৃদ্ধি হচ্ছে দ্বিগুণ, তিনগুণ সময়ে উষ্ণতা বৃদ্ধি হচ্ছে তিনগুণ অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধি $\triangle T \propto$ সময়।

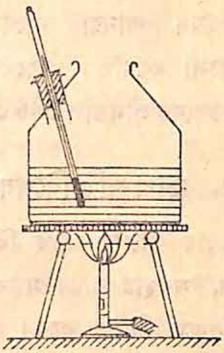


Fig. 3.3

যেহেতু বার্নার থেকে জলপূর্ণ পাত্রটি নির্দিষ্ট হারে তাপ গ্রহণ করছে, অতএব গৃহীত তাপ $H \propto$ সময়।

কাজেই গৃহীত তাপ $H \propto$ উষ্ণতা বৃদ্ধি $\triangle T$

অর্থাৎ **কোন বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বস্তু কর্তৃক গৃহীত তাপের সমানুপাতিক।**

অতএব দেখা যাচ্ছে যে,

$$H \propto m$$

এবং $H \propto \triangle T$

কাজেই $H = Sm \triangle T$

S ধ্রুবকটির মান পদার্থের উপর নির্ভর করে। Sকে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ (specific heat capacity) বলা হয়। সি.জি.এস. পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপের একক হল cal./gm°C। এই এককে তামার আপেক্ষিক তাপ 0.091, বরফের 0.5, লোহার 0.113 এবং এ্যালুমিনিয়ামের 0.217।

অবস্থার পরিবর্তনের সময় উষ্ণতা একই থাকে। এক্ষেত্রে তাপের পরিমাণ পদার্থের যতটুকু ভরের অবস্থান্তর ঘটল তার সমানুপাতী। এক কিলো বরফ গলাতে যে তাপ লাগে, দুই কিলো বরফ গলাতে স্বভাবতই তার দ্বিগুণ লাগবে। অর্থাৎ

$$H \propto m$$

কাজেই $H = Lm$

L ধ্রুবকটির মান পদার্থের উপর এবং কি ধরনের অবস্থান্তর হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। Lকে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য লীনতাপ (latent heat) বলা হয়। আমরা আগের একটি পরিচ্ছেদে ইতিমধ্যেই লীনতাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বরফের গলনের লীনতাপ 80 cal./gm এবং জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ 546 cal./gm।

3. তাপ শক্তিবিশেষ (Heat is a form of energy)

এবার তাপের স্বরূপ কি সেই আলোচনায় আসা যাক। তাপ উষ্ণতা বাড়ায়, অবস্থার পরিবর্তন করে, পদার্থের প্রসারণ ঘটায়, যৌগিক পদার্থকে মূল পদার্থসমূহে বিশ্লিষ্ট করে। কঠিন, তরল ও বায়বীয় সব পদার্থের মধ্য দিয়েই তাপ সঞ্চালিত হয়। ধাতুর মত নিরেট কঠিন পদার্থও তাপ সঞ্চালনে সহায়তা করে। শূন্যস্থানের মধ্য দিয়েও তাপের সঞ্চালন ঘটে, কেননা সূর্যের তাপ মহাশূন্যের মধ্য দিয়েও পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই ধারণা ছিল তাপ এক রকমের অতি সূক্ষ্ম ভারহীন জড় পদার্থ। এত সূক্ষ্ম যে, এই জড় পদার্থ যে-কোন পদার্থের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করতে পারে। এই কল্পিত জড় পদার্থের নাম দেওয়া হয় **ক্যালরিক** (caloric)। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, পদার্থে ক্যালরিক প্রবেশ করলে তার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, পদার্থ থেকে ক্যালরিক বেরিয়ে গেলে তার উষ্ণতা হ্রাস পায়; যে পদার্থ যত উষ্ণ তাতে ক্যালরিকের পরিমাণ তত বেশী; ক্যালরিক সর্বদাই উষ্ণ পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ পদার্থের দিকে ধাবিত হয়।

তাপ যে জড় পদার্থ নয় তা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় দু'শ বছর আগে কাউন্ট রামফোর্ড (Count Rumford) প্রমাণ করেন যে, যথেচ্ছ পরিমাণ তাপ সৃষ্টি করা যায়। ম্যুনিখ অস্ত্রাগারে একটি কামানের ছিদ্র করা পরিদর্শন করতে গিয়ে কাউন্ট দেখতে পান যে ছেঁদা করার সময় কামান ও তুরপুন (drill) দুটিই ভীষণ গরম হয়ে উঠছে। কামানটি যাতে খুব বেশী গরম না হয়ে ওঠে সেজন্য ছিদ্রটি জলে ভর্তি করে রাখা হয়। ছেঁদা করার সময় ঐ গরমে জল ফুটতে ফুটতে বাষ্প হতে থাকে। বাষ্প হয়ে জল কমে যেতে থাকায় ছিদ্রে ক্রমাগত

আরো জল দিতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, যখন তুরপুনটি একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে, কামানের লোহা মোটেই কাটছে না—তখনও তুরপুনটি চালিয়ে যেতে থাকলে ক্রমাগত তাপ উৎপন্ন হতে থাকে। ঠাণ্ডা করার জন্য তখনও ক্রমাগত জল দিয়ে যেতে হয়, আর ঐ তাপে জল গরম হয়ে বাষ্প হয়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ ভোঁতা তুরপুনকে কামানের লোহায় ক্রমাগত ঘষে কাজ করে যেতে থাকলে ক্রমাগত তাপও উৎপন্ন হতে থাকে।

প্রায় একই সময়ে স্যর হাম্‌ফ্রী ডেভী (Sir Humphrey Davy) পরীক্ষা করে দেখান যে দুটি বরফের টুকরাকে পরস্পরের সঙ্গে ঘষলেও এত তাপ উৎপন্ন হয় যে বরফ দুটি গলে যায়। পরীক্ষাটি করা হয়েছিল বায়ুশূন্য স্থানে $-2^{\circ}C$ উষ্ণতায়। চারপাশের উষ্ণতা বরফের থেকে কম হওয়ায় বাইরে থেকে বরফে তাপ আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। স্পষ্টতই এখানে তাপ উৎপন্ন হয়েছে ঘর্ষণের ফলে।

কিন্তু পদার্থের তো সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। **অতএব তাপ জড় পদার্থ নয়।** তাহলে তাপ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে রামফোর্ড দেখলেন যে তাঁর পরীক্ষায় আপাতদৃষ্টিতে দুটি জিনিসের পরিবর্তন হচ্ছে : তুরপুন ঘোরাতে ক্রমাগত কার্য করার ফলে যান্ত্রিক শক্তি এক থাকছে না, ক্রমাগত তাপ উৎপন্ন হবার ফলে তাপের পরিমাণও এক থাকছে না। শক্তির নিত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস যখন ক্রমশই দৃঢ় হয়ে উঠছে, ঠিক সে সময়েই তাতে সন্দেহ করার কারণ উপস্থিত হল। তবে এই সমস্যার একটা সমাধানও রামফোর্ড দেখতে পেলেন। তিনি বললেন যে, তাপ ক্যালরিক বলে আলাদা কোন বস্তু নয়, **তাপ শক্তিরই একটি রূপ মাত্র** ; তাঁর পরীক্ষায় যান্ত্রিক শক্তিরও ধ্বংস হচ্ছে না, তাপেরও সৃষ্টি হচ্ছে না ; যান্ত্রিক শক্তি **রূপান্তরিত** হয়ে পরিণত হচ্ছে তাপশক্তিতে। ফলে শক্তির পরিমাণ একই থাকছে।

তাপ যে শক্তিবিশেষ এরকম একটি ধারণা অবশ্য অনেক আগে থেকেই ছিল। বেকন (Bacon), গ্যালিলিও (Galileo), বয়েল (Boyle), নিউটন (Newton) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে পদার্থের উত্তাপের সঙ্গে পদার্থকণিকার গতিশক্তির সম্পর্ক রয়েছে। একটা লোহার পেরেক কাঠে পুরোটা ঢুকে যাবার পরও তার মাথায় ঠুকতে থাকলে দেখা যায় পেরেকটা গরম হয়ে উঠেছে। হাতুড়ির গতিশক্তি তখন পুরো পেরেকে সঞ্চারিত না হয়ে যাচ্ছে

লোহার কণিকাতে, তাদের গতিশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে পেরেকের উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপ যে শক্তিই এ কথাটি স্বীকৃতি লাভ করেছে কিন্তু অনেক দেরীতে, রামফোর্ড ও ডেভীর পরীক্ষারও প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, জার্মান বিজ্ঞানী মায়ার (Julius Robert Meyer) এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জুলের (James Prescott Joule) বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে।

4. কার্যের সঙ্গে তাপের সম্পর্ক (Relation of heat with work)

জুল তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষাগুলি করেন 1843 খৃঃ থেকে 1878 খৃস্টাব্দের মধ্যে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে,

(i) যান্ত্রিক শক্তিকে পুরোপুরিই তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব,

(ii) নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তিকে পুরোপুরি তাপে রূপান্তরিত করলে সব সময় একই তাপ পাওয়া যায়।

যান্ত্রিক শক্তি মাপা হয় ঐ শক্তি দিয়ে কতটুকু কার্য করা যায় তার পরিমাণ দিয়ে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্য W করার ফলে উৎপন্ন তাপ H ঐ কার্যের সমানুপাতী। অর্থাৎ

$$W \propto H$$

বা $$W = JH$$

Jকে বলা হয় **তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক** (mechanical equivalent of heat)।

তাপ মাপা হয় ঐ তাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি থেকে। যান্ত্রিক শক্তি ও তাপ যদি সমতুল (equivalent) হয় তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলকে উত্তপ্ত করলে সব সময় একই উষ্ণতা বৃদ্ধি হবে। কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্য করার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের কতটুকু উষ্ণতা বৃদ্ধি হল তা মেপে এই তুল্যাঙ্কের মান নির্ণয় করা যায়।

আরো নানাভাবে শক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করা যায়। সব ক্ষেত্রেই জুল দেখলেন যে কার্য ও তাপের তুল্যাঙ্ক একই; 4.185 জুল কার্য করা হলে সব সময়েই 1 গ্রাম জলের 1 ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ 1 ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধি কেবলমাত্র কতটুকু যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হয়েছে তার উপর নির্ভর

করে, কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তার উপর নয়। J-এর মান একটি ধ্রুবক, ক্যালরি-প্রতি প্রায় 4.185 জুল। J-এর মানের ধ্রুবত্ব থেকে যান্ত্রিক শক্তি ও তাপের সমতুল্যতা আরো স্পষ্ট হল। তাপ যে শক্তিরই বিশেষ রূপ, এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

তাপ শক্তিবিশেষ হলেও তাপ মাপতে আমরা সাধারণত ক্যালরি এককটি ব্যবহার করি, কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি মাপি কার্যের একক জুলে। এর কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। ক্যালরি এককটি যখন ঠিক করা হয় তখন তাপ যে শক্তিই একথা সকলে মানতেন না। শক্তি যেমন জুলে মাপা যায় তেমনি ক্যালরিতেও মাপা যায়। একটা 4.185 কিলোগ্রাম বেড়াল সেকেণ্ডে 2 মিটার বেগে দৌড়ালে তার গতিশক্তি হয় $\frac{1}{2}(4.185\times10^3\text{gm})\times(2\times10^2\ \text{cm/sec})^2$ $=2\times4.185\times10^7$ আর্গ $=2\times4.185$ জুল $=2$ ক্যালরি। গতিশক্তি 2 ক্যালরি বললে একটু অদ্ভুত শোনায় বটে, তবে ভুল হয় না।

আর একটি কথা। যান্ত্রিক শক্তিকে পুরোপুরিই তাপে রূপান্তরিত করা যায়, প্রতি জুল শক্তিকে প্রতি জুল তাপে, কিন্তু তাপকে কি সেভাবে পুরোপুরি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়? তাপশক্তি থেকেও যে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায় তার মস্ত উদাহরণ হল স্টীম ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের কোথায় তাপ ঢুকছে, আর কোথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় কতটুকু কাজ হচ্ছে তার খুঁটিনাটির হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যায় যে তাপের যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের সময়েও ঐ একই নিয়ম, 1 ক্যালরি তাপ রূপান্তরিত হয় 1 ক্যালরি বা 4.185 জুল যান্ত্রিক শক্তিতে। অর্থাৎ তাপশক্তিকেও পুরোপুরি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তবে এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। **যান্ত্রিক শক্তির সবটাই যেমন পুরোপুরিভাবে তাপে রূপান্তরিত করা যায়, ঠিক সেভাবে তাপের সবটাই পুরোপুরিভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না।** নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাপ গ্রহণ করে ঐ শক্তির সাহায্যে কাজ করতে গেলে সব ইঞ্জিনকেই ঐ তাপের কিছুটা বর্জন করতে হয়, দিয়ে দিতে হয় অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতার কোন বস্তুকে। কিছুটা তাপ ইঞ্জিনে ঢুকল, তার কিছুটা ইঞ্জিনকে বর্জন করতে হল, বাকীটুকুই কেবল যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হল। যতটুকু রূপান্তরিত হল তার ক্ষেত্রে কিন্তু 4.185 জুল তাপে অর্থাৎ 1 ক্যালরি তাপে পাওয়া যাবে 4.185 জুল যান্ত্রিক শক্তি।

প্রশ্নাবলী

1. তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কি? কিভাবে তাপ মাপা হয়?

2. তাপ কি? তাপ ও যান্ত্রিক শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ কি?

3. (a) ক্যালরি কাকে বলে? তাপের এফ.পি.এস. একক সি.জি. এস. এককের কত গুণ বড়?

(b) 1 জুল যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে কত ক্যালরি তাপে পরিণত হবে?

(c) 1 ক্যালরি তাপ যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হলে তার পরিমাণ কত?

4. শুদ্ধ কর :—

(a) উষ্ণতার একক হল ক্যালরি।

(b) দুটি বস্তুর উষ্ণতা সমান হলে বস্তু দুটিতে তাপের পরিমাণও সমান।

(c) যান্ত্রিক শক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করা গেলেও তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।

5. এ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ 0.217 cal./gm$^{\circ}$C। একটি 10 গ্রাম এ্যালুমিনিয়ামের টুকরায় 100 ক্যালরি তাপ দিলে তার উষ্ণতা কতখানি বৃদ্ধি পাবে?

চতুর্থ অধ্যায়

আলো বিনা অন্ধকার

1. আলোর উৎস (Source of light)

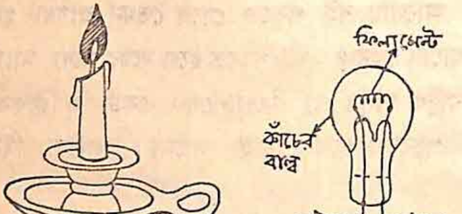
যতক্ষণ সূর্যের আলো ততক্ষণ দিন। দিনের আলোয় ঐ দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে যে শালিক পাখিটি পুচ্ছ তুলে নাচ্‌ছে সেটা দেখতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। তখন শালিক দেখা তো দূরের কথা ওটা কৃষ্ণচূড়া না শিমূল তাই বোঝা শক্ত। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে চাঁদের আলোয় বই পড়তে গেলে তেমন সুবিধা হবে না। তুমি বলবে, চাঁদের আলো কেন? বই পড়তে হলে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালব। টিউব আলো, ইলেকট্রিক বাল্‌ব বা নিদেনপক্ষে একটা হ্যারিকেন। ঠিক কথা। দেখতে হলে, পড়তে হলেই চাই আলো। আলো বিনা অন্ধকার।

কোন বস্তু থেকে আলো এসে চোখে পড়ল, চোখের ভিতরে গিয়ে অক্ষিপটে, আর তখনই সেটি দৃষ্টিগোচর হল। **যদি বস্তুটি নিজেই আলোকশক্তি বিকিরণ করে তবে সেটি স্বয়ংপ্রভ** (Self-luminous)। স্বয়ংপ্রভ বস্তুদের **আলোর উৎস** (Source of light) বলা হয়। সূর্য আমাদের প্রধান আলোর উৎস। টিউব আলো, ইলেকট্রিক বাল্‌ব এমন কি টিম্‌টিমে প্রদীপের শিখাও স্বয়ংপ্রভ। কৃষ্ণচূড়ার ডালে যে শালিক পাখিটিকে দেখে তুমি মুগ্ধ হচ্ছিলে সেটি কিন্তু স্বয়ংপ্রভ নয়। সূর্যের আলো পাখিটির গায়ে পড়ে ঠিক্‌রে এসে তোমার চোখে পড়েছে বলেই তুমি ওকে দেখছ। যে-সব জিনিস নিজেরা আলো বিকিরণ করে না, অর্থাৎ **অপ্রভ** (non-luminous), স্বয়ংপ্রভ উৎসের আলো এসে পড়লে যাদের দেখা যায়, তারা **অন্যপ্রভ** (illuminated bodies)। যেমন

চাঁদ—নিজের কোন আলো নেই, সূর্যের আলোয় আলোকিত। বস্তুত বেশীর ভাগ জিনিসই অন্যপ্রভ।

সাধারণভাবে উৎস দু'রকমের—(i) **তাপনির্ভর উৎস** (thermal sources), যাদের আলোক বিকিরণ উৎসের প্রচণ্ড উত্তাপের উপর নির্ভরশীল এবং (ii) **তড়িৎক্ষরণ-নির্ভর উৎস** (electrical discharge type sources) বিশেষ কোন গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎক্ষরণের ফলে যাদের মধ্যে আলোক বিকিরণ ঘটে।

চুলার আগুনে লোহার রড ঢুকিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে ওটা গন্‌গনে লাল হয়ে উঠেছে। এটা তাপের জন্য। মোমবাতি, প্রদীপ, হ্যারিকেন, গ্যাসবাতি, পেট্রোম্যাক্স এই সবগুলিতেই আলো হয় তাপের জন্য। আকাশে যে তারাদের জল্‌জল্ করতে দেখ তাদের উত্তাপ চুলার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশী। তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়েও কঠিন বস্তুর তাপ বাড়ানো যায়। হিটার তোমরা সকলেই দেখেছ। হিটারে থাকে একটি কুণ্ডলীকৃত (coiled) তার। এই হিটিং কয়েলের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে তারটি খুব উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে ওঠে 800°C – 1000°C)। অধিকাংশ বৈদ্যুতিক বাতির মূলনীতিটিও একই রকম। একটি কাঁচের বাল্বের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত তার বা কয়েলটি থাকে। এটিকে বলা হয় ফিলামেণ্ট (filament)।



(a) মোমবাতি

(b) ইলেকট্রিক বাল্ব; বাল্বের ভিতর বায়ুশূন্য করে কিছু আরগন গ্যাস ভরা হয়েছে

Fig. 4.1

কাঁচের বাল্বের ভিতরটা বায়ুশূন্য করে আরগন (Argon) গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বেশী গরমে বাতাসের অক্সিজেনে তারটা জ্বলে-পুড়ে ছাই না হয়ে যায় (Fig. 4.1 b)। কুণ্ডলীর তারের উত্তাপ প্রায় 3000°C-এর মত। এত উত্তাপে বিকিরিত আলো **মোটামুটি সাদা**। এরকম **সাদা বাতি** (incandescent lamp) প্রথম সার্থকভাবে তৈরি করেন **টমাস আলভা এডিসন** (Thomas Alva Edison) 1879 খৃস্টাব্দে। বাঁশের তন্তু পুড়িয়ে কয়লা করে তা দিয়ে

এডিসন ফিলামেণ্ট তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে টাঙ্গস্টেন ধাতুর তার দিয়ে ফিলামেণ্ট তৈরি করা হয়ে থাকে। এর ফলে আলো বেশী হয়, টে কেও বেশী দিন।

আজকাল হাটে-বাজারে লাল রঙের নিয়নসাইন দিয়ে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। এই নিয়ন বাতিগুলিতে থাকে কাঁচের উপর টিউবে নিয়নগ্যাস, নিম্ন-চাপে (2 থেকে 3 সে. মি. Hg-এর মত)। দুই প্রান্তে দুটি তারের ইলেকট্রোড লাগানো থাকে (Fig. 4.2a)। ঐ ইলেকট্রোড দুটির মধ্যে তড়িৎ বিভব প্রয়োগ করলে ঐ গ্যাসের মধ্যে ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়তনের মাধ্যমে তড়িৎ-ক্ষরণ হতে থাকে। ত্বরান্বিত ইলেকট্রন ও আয়ন গ্যাসের অণুকে সজোরে আঘাত করলে এই সব অণু উত্তেজিত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। **বিকিরিত আলোর রঙ নির্ভর করে কোন্ গ্যাসটি নেওয়া হয়েছে তার উপর।** এধরনের বাতিকে **গ্যাস ডিসচার্জ বাতি** বলা হয়।

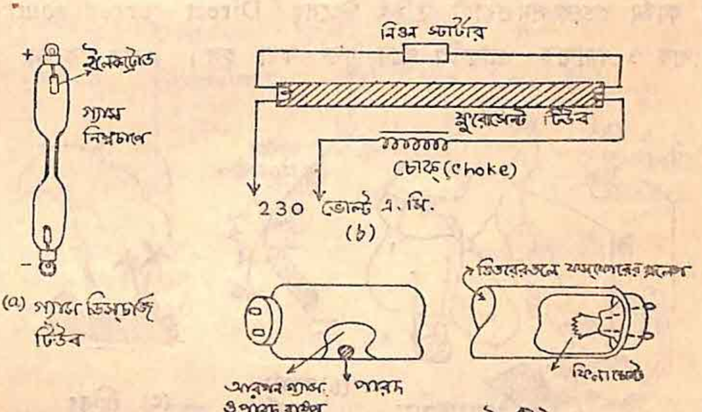


Fig. 4.2

রাস্তার আলোর জন্য সোডিয়াম ডিসচার্জ বাতি আজকাল খুব ব্যবহার করা হয়। ফ্লুরোসেণ্ট বাতিও (চলতি নাম টিউবলাইট) মূলত ডিসচার্জ বাতি (Fig. 4.2b)। এই বাতিতে তড়িৎক্ষরণের ফলে যে আলো বিকিরিত হয় তার মধ্যে **অতিবেগ্নী** (ultarviolet) আলোর পরিমাণই বেশী। অতিবেগ্নী আলো চোখে দেখা যায় না। সেজন্য ফস্ফোর

(**Phosphor**) নামে এক শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ টিউবের ভিতরের তলে দেওয়া হয়। এই ফস্‌ফোর অতিবেগ্‌নী আলোককে শুষে নেয় এবং নিজে দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে। বিকিরিত আলোর রঙ নির্ভর করে ফস্‌ফোরটির উপর। ফস্‌ফোরটি ক্যাডমিয়াম্ বোরেট (**Cadmium borate**) হলে আলো গোলাপী হয়, জিঙ্ক সিলিকেট্ (**Zinc silicate**) হলে আলো সবুজ এবং ক্যালসিয়াম টাঙ্গস্টেট্ (**Calcium tungstate**) হলে আলো নীল হয়। তিনটি মিশিয়ে প্রলেপ দিলে আলো সাদা হয়।

ওয়েল্ডিং-এর সাহায্যে লোহায় লোহায় জোড়া দিতে নিশ্চয়ই দেখেছ (**Fig. 4.3a**)। জোড়ার জায়গায় যে চোখ-ধাঁধানো আলো হয় তাকে বলে **আর্ক** (**arc**)। আর্কের সৃষ্টি হয় দুটি কাছাকাছি ইলেকট্রোডের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে তার মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহের ফলে। **কার্বন আর্ক** (**carbon arc**) আলোর উৎসগুলির মধ্যে উজ্জ্বলতম। দুটি কার্বন রডকে **সমপ্রবাহী** তড়িৎ উৎসের (**Direct current source**) ঋণাত্মক ও ধনাত্মক প্রান্তটির সঙ্গে যুক্ত করা হল। এবার কার্বন রড

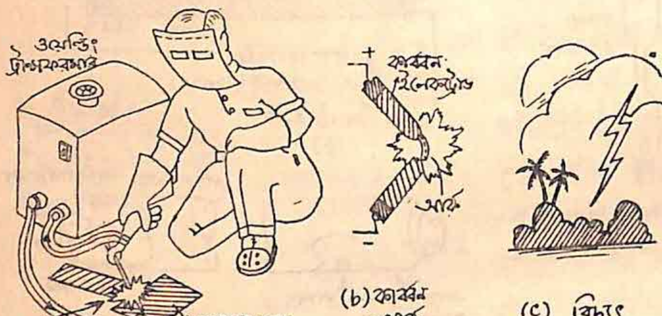


Fig 4.3

দুটির অপর দুটি প্রান্তকে পরস্পরের সঙ্গে ছুঁইয়েই যদি অল্প একটু ফাঁক করা হয় তবে ঐ ফাঁকের মধ্যে আর্ক সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রনের প্রচণ্ড স্রোত গিয়ে সজোরে পড়বে ধনাত্মক কার্বন রডের প্রান্তে এবং এটিকে দারুণভাবে উত্তপ্ত করবে (প্রায় 4000°C-এর মত)। এই উত্তপ্ত প্রান্তটিই আলোর উৎস। **কার্বন আর্কের আলো সাদা**। সিনেমার প্রজেক্টারে

কার্বন আর্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া রয়েছে পারদ আর্ক (Mercury arc), সোডিয়াম আর্ক (Sodium arc) বাতি ইত্যাদি। আলোর উৎস হিসাবে ল্যাবরেটরীতেও এরা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তড়িৎক্ষরণ-নির্ভর আলোর উৎস প্রকৃতিতেও রয়েছে। আকাশে মেঘের বুক চিরে যে বিদ্যুৎ চমকায় বা মেরুপ্রদেশে সারা আকাশ জুড়ে যে বিচিত্র বর্ণের আলোর ঝলমলে পর্দা দেখে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়, সেই **অরোরা বোরিয়ালিস্**ও (Aurora Borealis) এরকম আলোর উৎস।

যে-সব আলোর উৎসের কথা এপর্যন্ত বলেছি তাদের মধ্যে মোমবাতি, কার্বন আর্ক, ইলেকট্রিক বাল্‌ব ইত্যাদি মোটামুটিভাবে **বিন্দু উৎস** (point sources) এবং নিওন বাতি, ফ্লুরোসেন্ট বাতি ইত্যাদি মোটামুটিভাবে **রৈখিক উৎস** (linear sources)।

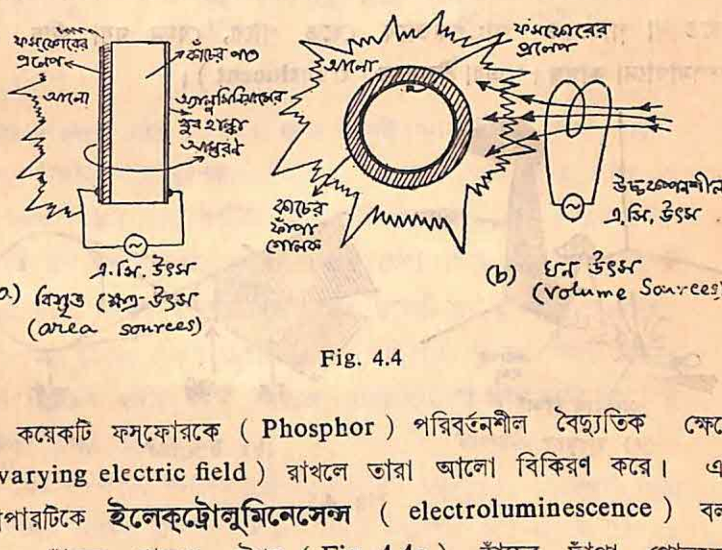


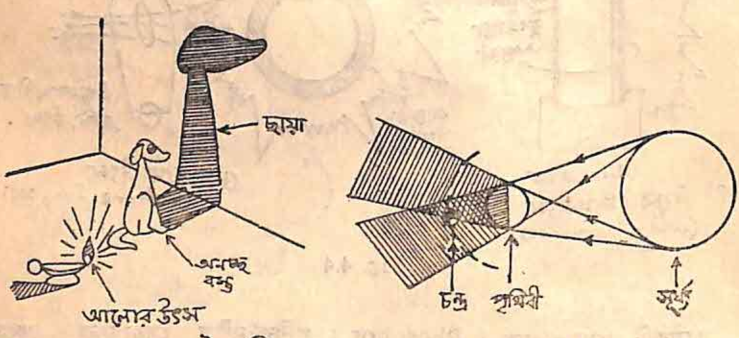
Fig. 4.4

কয়েকটি ফস্‌ফোরকে (Phosphor) পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে (varying electric field) রাখলে তারা আলো বিকিরণ করে। এই ব্যাপারটিকে **ইলেক্‌ট্রোলুমিনেসেন্স** (electroluminescence) বলা হয়। কাঁচের পাতের উপর (Fig. 4.4a) কাঁচের ফাঁপা গোলকের ভিতরে (Fig. 4.4b) এ ধরনের ফস্‌ফোরের প্রলেপ (প্রায় 1/40 সে. মি. পুরু) লাগিয়ে সেটাকে এ. সি. (alternating current) বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রাখলে **বিস্তৃত ক্ষেত্র উৎস** (area sources) বা **ঘন উৎস** (volume sources) পাওয়া যায়। ঘরের ভিতর, সিঁড়ি ইত্যাদিকে

মৃদু আলোয় সুষমভাবে (uniformly) আলোকিত করবার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিস্তৃত উৎসের ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে।

2. আলোক রশ্মি (Ray of light)

এতক্ষণ বিভিন্ন ধরনের আলোর উৎসের কথা বলা হল। উৎস থেকে আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো যায় তাকে বলে **আলোর মাধ্যম** (medium)। যদি মাধ্যমের গুণাবলী সব জায়গায় সমান হয় তবে সেটা **সমসত্ব** (homogeneous), তা না হলে **অসমসত্ব** (inhomogeneous)। যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো অবাধে যেতে পারে তা **স্বচ্ছ** (transparent), যেমন কাঁচ, পরিষ্কার জল ইত্যাদি। যার মধ্য দিয়ে আলো যায় না সেটা **অনচ্ছ** (opaque), যেমন কাঠ, লোহা ইত্যাদি। কিছু জিনিসের মধ্য দিয়ে আলো অবাধে যেতে না পারলেও আংশিকভাবে যেতে পারে, যেমন ঘসা কাঁচ বা তেলমাখানো কাগজ। এরা **ঈষদচ্ছ** (translucent)।

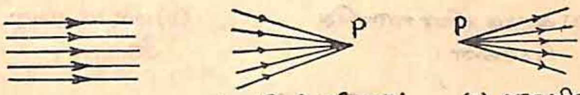


(a) ছায়ার উৎপত্তি (b) চন্দ্রগ্রহণ

Fig. 4.5

প্রশ্ন হল, উৎসটি যদি সমসত্ব মাধ্যমে থাকে তবে উৎস থেকে আলো কোন্ পথে যায়? সাধারণ অভিজ্ঞতা বলে যে আলো যায় সরলপথে (rectilinear path)। আলো সরলপথে চলে বলেই অনচ্ছ পদার্থের পিছনে তার ছায়া (shadow) পড়ে (Fig. 4.5a)। আর তাই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় (Fig. 4.5b)।

আলো সরলপথে চলে বলে আলোর পথকে রেখারূপে কল্পনা করা যায়। যে রেখা ধরে আলো মাধ্যমের এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দু পর্যন্ত যায় তাকে **রশ্মি** (ray) বলে। সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোকরশ্মিকে সরলরেখা দিয়ে দেখানো হয় এবং আলো যে-দিকে যাচ্ছে সে-দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে আলোর গতিপথ নির্দেশ করা হয়। অনেকগুলি রশ্মিকে একত্রে **রশ্মিগুচ্ছ** (beam or pencil of rays) বলা হয়। রশ্মিগুচ্ছ **সমান্তরাল** (parallel), **অভিসারী** (convergent) বা **অপসারী** (divergent) হতে পারে (Fig. 4.6)।



(a) সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ।

(b) অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ ; রশ্মিগুলি এক বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে।

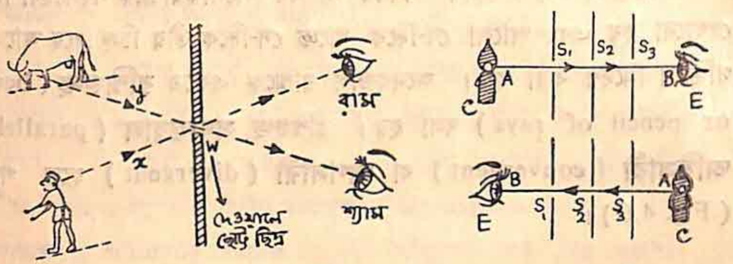
(c) অপসারী রশ্মিগুচ্ছ ; রশ্মিগুলি এক বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।

Fig. 4.6

রশ্মির ধারণাটি সহজ। আর সহজ বলেই আকর্ষণীয়। কিন্তু এখানে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। তোমার মনে হতে পারে যে আলো অনচ্ছ বস্তুকে পাশ কাটিয়ে একেবারেই যেতে পারে না। **এটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়।** সূক্ষ্ম পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, অনচ্ছ বস্তুটি খুব ছোট হলে, রশ্মির ধারণা থেকে তার ছায়াটি যে রকম হওয়া উচিৎ তেমনটি হয় না, ছায়ার মধ্যেও আলো গিয়ে পৌছায়। আমরা অবশ্য এখনই অত সূক্ষ্ম জিনিসে যাচ্ছি না। **আলো রশ্মি বরাবর যায় এটা ধরলেই আপাতত যথেষ্ট হবে।**

আলোকরশ্মি সম্বন্ধে আরো দুটি কথা জানা দরকার। w বিন্দুটি দিয়ে x রশ্মি গিয়েছে রামের চোখে (Fig. 4.7a)। এবার অন্য একটি রশ্মি y যদি ঐ একই বিন্দু w দিয়ে শ্যামের চোখে যায় তবে x রশ্মির জন্য y-এর এবং y রশ্মির জন্য x-এর প্রকৃতির কোন হেরফের হবে না। আলোকরশ্মির এই **পারস্পরিক নিরপেক্ষতার** (mutual independence) জন্য ঐ একই ছিদ্র দিয়ে রাম দেখবে রাখালটিকে আর শ্যাম গরুটিকে। রাখালের মাথায় গরুর শিং দেখা যাবে না।

এবার Fig. 4.7b র দিকে দেখ। তিনটি অনচ্ছ পর্দাকে পর পর এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে ঐ পর্দাগুলির S_1, S_2 ও S_3 ছিদ্র তিনটি



(a) আলোক রশ্মির পারস্পরিক নিরপেক্ষতা। (b) আলোক রশ্মির উভগম্যতা।

Fig. 4.7

সরলরেখা AB বরাবর রয়েছে। A বিন্দুতে আলোর উৎস থাকলে B বিন্দুতে চোখ রেখে BA বরাবর তাকালে উৎসটিকে দেখা যাবে। $AS_1S_2S_3B$ আলোর সম্ভাব্য পথ। এবার Bতে উৎস রাখলেও A থেকে দেখা যাবে। স্বতরাং $BS_3S_2S_1A$ও আলোর সম্ভাব্য পথ। **অর্থাৎ কোন একদিকে আলোকরশ্মির সম্ভাব্য পথ বিপরীত দিকেও সম্ভাব্য পথ।** আলোক-রশ্মির এই **উভগম্যতার** (reversibility) কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

3. আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ (Reflection and Refraction of Light)

ছটি সমসত্ত্ব মাধ্যমের বিভেদতলে (surface of separation) আলো এসে পড়লে, অর্থাৎ **আপতিত** (incident) হলে তার কিছুটা প্রথম মাধ্যমেই ফিরে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় **প্রতিফলন** (reflection)। আপতিত আলোর বাকীটা দ্বিতীয় মাধ্যমে চলে যায়। সাধারণত আলোর দিকও পরিবর্তিত হয়। ঘটনাটিকে বলা হয় আলোর **প্রতিসরণ** (refraction)। বিভেদতলটি মসৃণ (smooth) হলে প্রতিফলিত ও প্রতিস্থত রশ্মির দিক আপতিত রশ্মির দিকের উপর স্বনির্দিষ্টভাবে নির্ভর

করে। Fig. 4.8-এ আপতিত রশ্মি AO, দুটি মাধ্যমের বিভেদতল S-এর উপর **আপতন বিন্দু** Oতে এসে পড়েছে। O বিন্দুতে ON অভিলম্ব, OA″ প্রতিফলিত রশ্মি ও OA′ প্রতিসৃত রশ্মি। অভিলম্বের সঙ্গে আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি যথাক্রমে θ, θ'' ও θ' কোণ করেছে। এই কোণগুলিকে আপতন কোণ, প্রতিফলন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ্ বলা হয়। প্রতিফলন ও প্রতিসরণ যে নিয়মগুলি মেনে চলে তাদের সূত্রাকারে লেখা যায়।

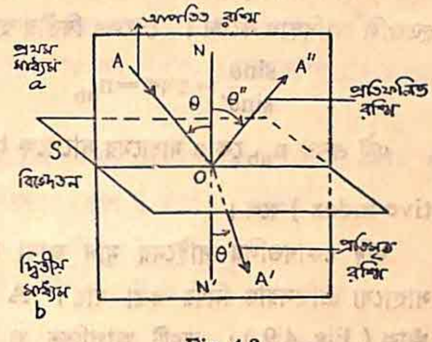


Fig. 4.8

প্রতিফলনের সূত্রাবলী (Laws of Reflection)

প্রথম সূত্র ঃ আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।

অর্থাৎ $\theta = \theta''$ (1)

এই দুটি সূত্রই যথেষ্ট পুরোনো। প্রথম সূত্রটির আবিষ্কর্তা হিসাবে ধরা হয় আরবীয় বিজ্ঞানী আলহাজেন্‌কে। দ্বিতীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেন ইউক্লিড 300 খৃস্টপূর্বাব্দে।

প্রতিসরণের সূত্রাবলী (Laws of Refraction)

প্রথম সূত্র ঃ আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ আপতন কোণ যাই হোক না কেন, আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক (constant) হয়। এই ধ্রুবকের মান মাধ্যম দুটির উপর এবং আলোর বর্ণের উপর নির্ভর করে।

প্রতিসরণের এই সূত্রগুলিকে **স্নেলের সূত্র** (Snell's laws) বলা হয়। লাইডেনের ভিলেব্রর্ড্ স্নেল (Willebrord Snell) 1621 খৃস্টাব্দে প্রতিসরণের সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। স্নেলের দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী,

$$\frac{\sin\theta}{\sin\theta'} = \text{ধ্রুবক} = n_{ab} \qquad (2)$$

এই ধ্রুবক n_{ab} কে a মাধ্যমের সাপেক্ষে b মাধ্যমের **প্রতিসরাঙ্ক** (refractive index) বলে।

যদি কোণগুলির সাইনের মান জানা না থাকে তবে একটি সহজ অঙ্কনের সাহায্যে প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। A বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁক (Fig. 4.9)। বৃত্তটি আপতিত ও প্রতিসৃত রশ্মিকে যথাক্রমে I ও R

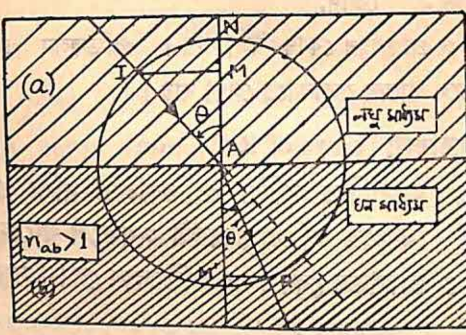


Fig. 4.9

বিন্দুতে ছেদ করেছে। I ও R বিন্দু থেকে অভিলম্ব AN-এর উপরে যথাক্রমে IM ও RM' লম্বদুটি টান। তাহলে

$$\sin\theta = IM/AI, \text{ এবং } \sin\theta' = RM'/AR$$

$$\text{কাজেই } n_{ab} = \frac{\sin\theta}{\sin\theta'} = \frac{IM}{AI}\Big/\frac{RM'}{AR} = \frac{IM}{RM'}, \text{ কেননা } AI = AR$$

অতএব উপরোক্ত অঙ্কনটি করে IM ও RM' দৈর্ঘ্য দুটি মাপলেই প্রতিসরাঙ্ক পাওয়া যাবে।

যদি $n_{ab} > 1$ হয় তবে $\sin\theta > \sin\theta'$ কাজেই $\theta > \theta'$। অর্থাৎ আলোক-রশ্মি b মাধ্যমে অভিলম্বের দিকে সরে যাবে। এক্ষেত্রে a মাধ্যমকে b মাধ্যম

অপেক্ষা **লঘুতর** (optically rarer) এবং b মাধ্যমকে a মাধ্যম অপেক্ষা **ঘনতর** (optically denser) বলা হয়। **মনে রাখতে হবে এই লঘুত্ব আর ঘনত্বের সঙ্গে আপেক্ষিক গুরুত্বের কোন সম্বন্ধ নেই।** তারপিন তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের থেকে কম হলেও, প্রতিসরণের ক্ষেত্রে তারপিনই ঘনতর মাধ্যম।

আলোকরশ্মির উভগম্যতার জন্য, b মাধ্যমে আপতন কোণ θ' হলে (Fig. 7.9), a মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ θ হবে। কাজেই

$$n_{ba} = \frac{\sin\theta'}{\sin\theta} = \frac{1}{n_{ab}} \qquad (3)$$

আপতিত রশ্মি যখন শূন্যে থাকে তখন যে প্রতিসরাঙ্ক পাওয়া যায় তাকে মাধ্যমের চরম প্রতিসরাঙ্ক (absolute refractive index) বলে। a মাধ্যমের চরম প্রতিসরাঙ্ক n_a দিয়ে সূচিত করা হয়। বায়ুর পরম প্রতিসরাঙ্ক $n_{air} = 1{\cdot}00028$।

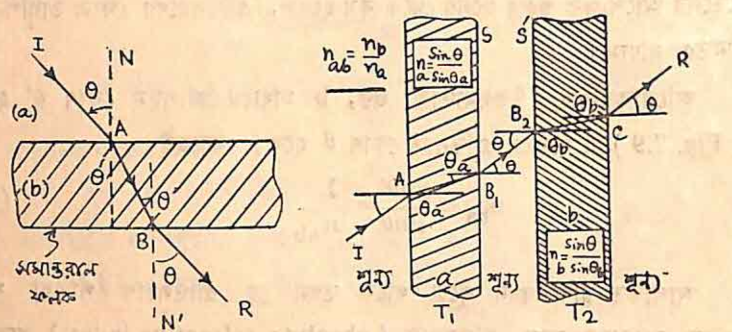
n_{ab}কে a মাধ্যমের সাপেক্ষে b মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক (relative refractive index)ও বলা হয়। স্বভাবতই তুমি জানতে চাইবে এই আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক n_{ab}-এর সঙ্গে মাধ্যম দুটির পরম প্রতিসরাঙ্ক n_a ও n_b-এর সম্পর্ক কি ?

a ও b মাধ্যমের দুটি সমান্তরাল ফলক সমান্তরালভাবে শূন্যে রয়েছে (Fig. 4.10b)। চূড়ান্ত নির্গত রশ্মি CR, আপতিত রশ্মি IA-এর সমান্তরাল হবে। এবার T_1 ও T_2কে ক্রমশ কাছে এনে S ও S′ তল দুটিকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলেও নির্গত রশ্মি আপতিত রশ্মির সমান্তরাল থাকবে। সেক্ষেত্রে a ও b মাধ্যমের বিভেদতলে a মাধ্যমে আপাতন কোণ θ_a এবং b মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ θ_b হবে। সুতরাং,

$$n_a = \frac{\sin\theta}{\sin\theta_a} \text{ এবং } n_b = \frac{\sin\theta}{\sin\theta_b}$$

$$\text{কাজেই, } n_{ab} = \frac{\sin\theta_a}{\sin\theta_b} = \frac{\sin\theta}{n_a} \Big/ \frac{\sin\theta}{n_b} = \frac{n_b}{n_a} \qquad (4)$$

যখন b মাধ্যম a মাধ্যম অপেক্ষা ঘনতর তখন $n_{ab} > 1$ অর্থাৎ $n_a > n_b$। কাজেই যে মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক যত বেশী সেই মাধ্যম তত বেশী ঘন (optically dense)।



(a) সমান্তরাল ফলকের মধ্য দিয়ে নির্গত রশ্মি BR, আপতিত রশ্মি IA এর সমান্তরাল।

(b) একাধিক সমান্তরাল ফলক পরপর সমান্তরাল ভাবে রাখলেও চূড়ান্ত নির্গত রশ্মি CR, আপতিত রশ্মি IA র সমান্তরাল।

Fig. 4.10

একটি মাত্র রশ্মির বেলায় সমতলে প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কথাই এতক্ষণ বলা হয়েছে। এবার রশ্মিগুচ্ছের কথা ধরা যাক। সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছের অন্তর্গত একটি রশ্মির বেলায় যা ঘটবে অন্য সবগুলি রশ্মির বেলায়ও তাই ঘটবে। অভিসারী কিম্বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছ মাধ্যমের বিভেদতলে গিয়ে পড়লে বিভেদতলে প্রতিটি রশ্মিই কিছুটা প্রতিফলিত ও বাকীটা প্রতিসৃত হবে। প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত রশ্মিগুলি **কোনদিকে যাবে** তা প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলির সাহায্যেই ঠিক করা সম্ভব, বিভেদতলের আকৃতি যাই হোক না কেন।

প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলি থেকে কিন্তু কতটা আলো প্রতিফলিত হবে বা কতটা প্রতিসৃত হবে তা বলা সম্ভব নয়। প্রতিফলন ক্ষমতা নির্ভর করে :—

(i) **মাধ্যমের উপর** :—প্রতিফলকের উপর লম্বভাবে আলো পড়লে,

হলুদ বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে প্রতিফলনের পরিমাণ

কাঁচে—শতকরা 4 ভাগ,

রূপার মসৃণ প্রলেপ থেকে—শতকরা 99 ভাগ,
ও প্রদীপের কালি (lamp black) থেকে—খুবই অল্প।

(ii) **আলোর বর্ণের উপর**ঃ—প্রতিফলকের উপর আলো লম্বভাবে পড়লে রূপার মসৃণ প্রলেপ থেকে প্রতিফলনের পরিমাণ অতিবেগ্নী (ultraviolet) আলোর বেলায় শতকরা 4 ভাগ মাত্র যেখানে হলদে আলোতে শতকরা 99 ভাগ।

(iii) **আপতন কোণের উপর**ঃ—হলদে আলোয় কাঁচে প্রতিফলনের পরিমাণ আপতন কোণ 80^{o}তে শতকরা প্রায় 40 ভাগ, 90^{o}র কাছে প্রায় পুরোপুরি, আর আপতন কোণ 30^{o} পর্যন্ত হলে শতকরা মাত্র 4 ভাগের মত।

দর্পণ (Mirror) :—খুব বেশী প্রতিফলন ক্ষমতার মসৃণ তলকে **দর্পণ** বা **আয়না** (mirror) বলে। শুধু কাঁচে যে ভালো দর্পণ হবে না সেটা পরিষ্কার। কাঁচের মসৃণ ফলক নিয়ে **তার সামনের তলে** (front surface) ধাতব প্রলেপ লাগিয়ে প্রতিফলন ক্ষমতা বাড়ানো হয়। ভালো দর্পণে ক্রোমলুমিয়াম বা ক্রোমিয়াম এ্যালুমিনিয়ামের (শতকরা 85 ভাগ প্রতিফলন) প্রলেপ লাগানো হয়। রূপার প্রতিফলন ক্ষমতা বেশী হলেও সেটা বেশী দিন টেঁকে না। রূপার প্রলেপ বাতাসের সংস্পর্শে আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায়। আমরা যে-সব দর্পণ ব্যবহার করি তাতে কাঁচের সমান্তরাল ফলকের পিছনের তলে রূপা বা পারদের প্রলেপ লাগানো থাকে।

আয়নার ব্যবহার যেমন প্রাচীন, তেমন ব্যাপক। এর কারণ হল দর্পণে **প্রতিবিম্ব** দেখা যায়। প্রতিবিম্ব কথাটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কোন বস্তু থেকে আলো সরাসরি চোখে এসে পড়লে আমরা বস্তুটিকে স্বস্থানে দেখি (Fig.4.11a)। আলো সোজাসুজি না এসে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে পড়লে সাধারণত বস্তুটিকে স্বস্থানে দেখি না, অন্যস্থানে দেখি (Fig. 4.11b)। চোখে এসে অন্যস্থানে বস্তুটির যা দেখা যায়, সেটাই বস্তুর **প্রতিবিম্ব** (image)। যে বস্তুটি আমাদের লক্ষ্যস্থল তাকে আমরা **অভিবিম্ব** (object) বলব। **কোন বিন্দু অভিবিম্ব** (point object) **থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে যখন একটি বিন্দুতে মিলিত**

হয় বা একটি বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় তখন ঐ বিন্দুকে **বিন্দু অভিবিম্বের প্রতিবিম্ব বলে।** রশ্মিগুচ্ছ একটি বিন্দুতে মিলিত হলে

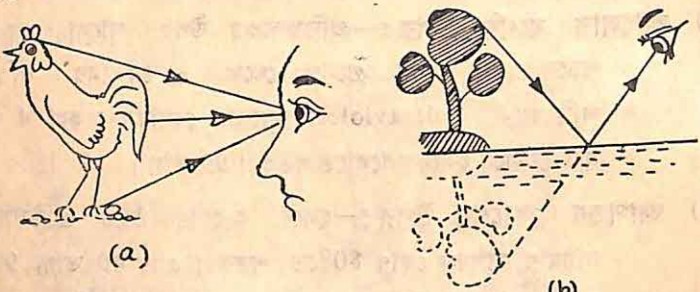


Fig. 4. 11

প্রতিবিম্বকে **সদ্‌বিম্ব** (real image) এবং একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে প্রতিবিম্বকে **অসদ্‌বিম্ব** (virtual image) বলা হয়।

সমতল দর্পণে প্রতিফলনের জন্য প্রতিবিম্ব গঠন :—

সমতল দর্পণে যে প্রতিবিম্ব দেখ, তা সদ্ না অসদ্? Fig. 4.12 (a)তে বিন্দু অভিবিম্ব P থেকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছের MM′ দর্পণে প্রতিফলন

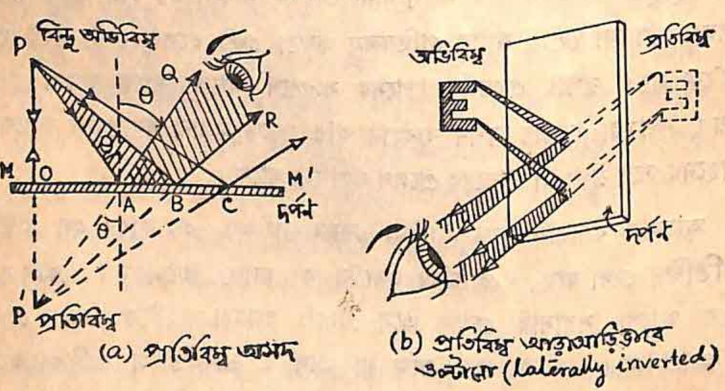


Fig. 4.12

দেখানো হয়েছে। এই রশ্মিগুচ্ছের মধ্যে দুটি রশ্মি PO ও PA; PO লম্বভাবে এবং PA, θ কোণে দর্পণে আপতিত হয়ে যথাক্রমে OP ও AQ বরাবর প্রতিফলিত হয়েছে। OP ও AQ, P′ বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে। PAO ও P′AO ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে AO সাধারণ বাহু,

$\angle POA = 90° = \angle P'OA$ এবং $\angle PAO = 90° - \theta = \angle P'AO$। কাজেই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম। অর্থাৎ $OP = OP'$। দেখা যাচ্ছে যে, OP' আপতন কোণ θ-র উপর নির্ভর করে না। সুতরাং P বিন্দু থেকে অপসারী সব রশ্মিই দর্পণে প্রতিফলনের পর P′ বিন্দু থেকে আসছে মনে হবে। P′, P বিন্দুর প্রতিবিম্ব। **প্রতিবিম্ব অসদ্**। এবং দর্পণ থেকে **অভিবিম্ব দূরত্ব=প্রতিবিম্ব দূরত্ব**। বিস্তৃত অভিবিম্বের (extended object) ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব **অভিবিম্বের অনুরূপ** (similar), **আকারে সমান** এবং **আড়াআড়িভাবে ওল্টানো** হবে (Fig. 4.12b)।

সমতলে প্রতিসরণের জন্য প্রতিবিম্ব গঠন :—

এবার সমতলে প্রতিসরণের কথা ধরা যাক। বিন্দু অভিবিম্ব P থেকে (Fig. 4.13a) অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বিভেদতল MM′-এর উপর পড়েছে। তার মধ্যে দুটি রশ্মি PO ও PA নেওয়া হল। PO লম্বভাবে এবং PA θ কোণে আপতিত হয়ে যথাক্রমে OB ও AC বরাবর প্রতিসৃত হয়েছে। স্নেলের সূত্রানুসারে,

$$n' \sin\theta = n \sin\theta$$

Fig. 4.13 (a) অনুযায়ী,

$$OA = OP' \tan\theta' = OP \tan\theta$$

$$\text{অর্থাৎ } \frac{OP' \tan\theta}{n' \sin\theta'} = \frac{OP \tan\theta}{n \sin\theta}$$

$$\text{কাজেই, } OP' = \frac{n'}{n} \cdot \frac{\cos\theta}{\cos\theta'} OP \qquad (5)$$

অতএব আপতন কোণ θ-র উপর OP' নির্ভর করবে। কাজেই প্রতিসৃত সমস্ত রশ্মিই একটিমাত্র বিন্দু হতে আসছে বলে মনে হবে না। যদি θ খুব ছোট হয় তবে θ'ও ছোট এবং $\cos\theta \simeq 1 \simeq \cos\theta'$ বা $\cos\theta/\cos\theta' = 1$

$$\text{সুতরাং } OP' = \frac{n'}{n} OP \qquad (6)$$

এক্ষেত্রে P′-এর অবস্থান আপতন কোণের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর, তুমি প্রতিসারক তলের লম্বভাবে P বিন্দুকে দেখবার চেষ্টা করছ। চোখের মণি খুব ছোট বলে (3mm থেকে 8mm ব্যাস) যে-সব রশ্মি P থেকে

চোখে প্রবেশ করবে তাদের ক্ষেত্রে θ খুব কম হবে। কাজেই এক্ষেত্রে চোখ P বিন্দুর প্রতিবিম্ব P′ বিন্দুতে দেখতে পাবে। **প্রতিবিম্বটি অসদ্‌**। যদি $n<n'$ হয় তবে $OP'>OP$, প্রতিবিম্ব অভিবিম্ব থেকে দূরে হবে (Fig. 4.13a)।

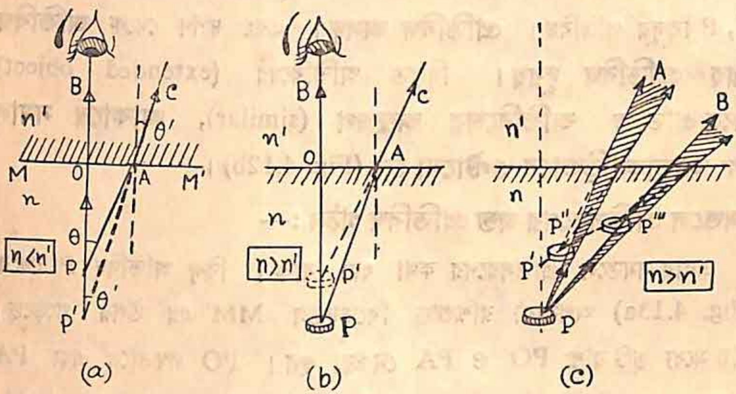


Fig. 4.13

যদি $n>n'$ হয় তবে $OP'<OP$ প্রতিবিম্ব অভিবিম্ব থেকে কাছে হবে (Fig. 4.13b)। লম্বভাবে না দেখে যদি তির্যকভাবে (obliquely) দেখ তা হলেও প্রতিবিম্বটি মোটামুটি স্পষ্টই হবে (যেহেতু চোখের মণি খুব ছোট)। বিভিন্ন কোণে দেখলে প্রতিবিম্বকে বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাবে (Fig. 4.13c)।

4. আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন (total internal reflection)

আলোকরশ্মি যদি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় তবে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড়। আপতন কোণ বাড়াতে থাকলে, বিশেষ একটি কোণ θ_c তে প্রতিসরণ কোণ 90° হবে অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি বিভেদতল ঘেঁষে যাবে। এই আপতন কোণকে **সংকট কোণ** (critical angle) বলা হয়। আপতন কোণ সংকট কোণের থেকে বড় হলে আর প্রতিসৃত রশ্মি পাওয়া যায় না। আপতিত রশ্মি পুরোটাই প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনাকে **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে**। সংকট কোণ সহজেই

নির্ণয় করা যায়। আপতন কোণ যখন θ_c' তখন প্রতিসরণ কোণ 90°। সুতরাং স্নেলের সূত্র থেকে,

$$\frac{\sin\theta_c}{\sin 90^\circ} = n_{ba} = \frac{1}{n_{ab}} \text{ কিন্তু } \sin 90^\circ = 1$$

$$\text{অর্থাৎ } \sin\theta_c = \frac{1}{n_{ab}} \quad (7)$$

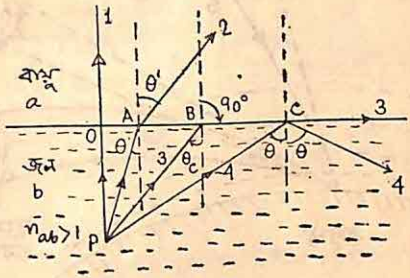


Fig. 4.14

বায়ুতে জলের প্রতিসরাঙ্ক 1·33, সুতরাং জলের সংকট কোণ = 48·5° এবং বায়ুতে ক্রাউন কাঁচের প্রতিসারঙ্ক 1·5, অতএব কাঁচের সংকট কোণ = 42°।

5. প্রতিসরণ ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সাহায্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা (Explanation of some natural phenomena on the basis of refraction and internal reflection)

প্রতিসরণের জন্য

(a) জলের ভিতরের কোন জিনিস বাইরে থেকে দেখলে একটু কাছে চলে এসেছে বলে মনে হবে (Fig.4.13b)।

(b) জলের ভিতর থেকে বাইরের কোন জিনিস দেখলে আপাত দূরত্ব একটু বেশী হয় (Fig.4.13a)।

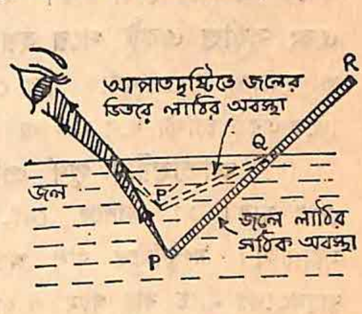


Fig. 4.15

(c) জলের মধ্যে কোন লাঠিকে কাৎ করে আংশিকভাবে ডোবালে সেটা আপাতদৃষ্টিতে জলের তলে বেঁকে গেছে বলে মনে হয়। জলের নীচে ডোবানো লাঠির QP অংশটিকে Q বিন্দুতে বেঁকে, QP' অবস্থায় উঠে গেছে বলে মনে হয় (Fig.4.15)।

(d) **বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণ (atmospheric refraction)**

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ততই কমতে থাকে। কাজেই কোন নক্ষত্র থেকে আলো বায়ুমণ্ডলের

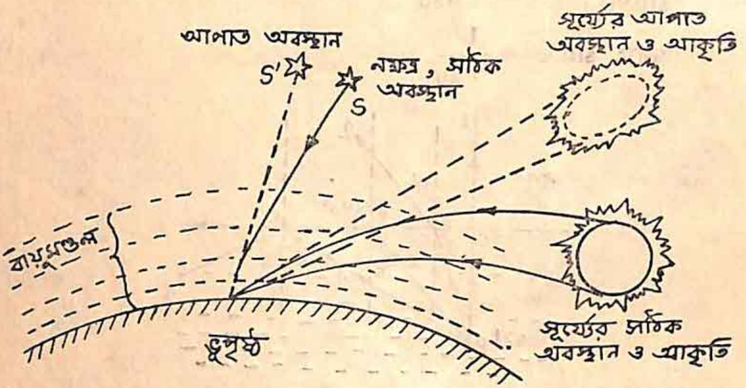
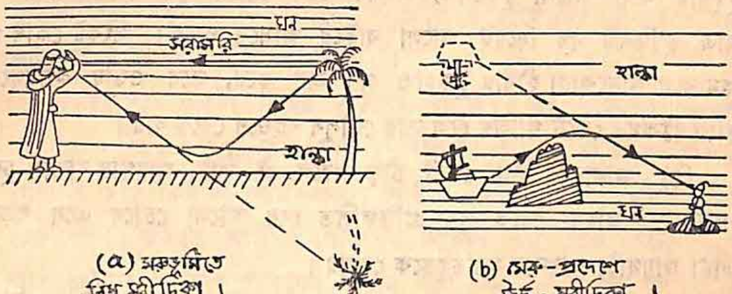


Fig. 4.16

লঘুস্তর থেকে ক্রমশ ঘনতর স্তরে ঢুকবার সময় প্রতিসৃত হয়। **ফলে নক্ষত্রের অবস্থানে আপাত উন্নতি ঘটে** (Fig. 4.16)। এজন্য পূর্বদিকে সূর্য দিগন্তের (horizon) নীচে থাকা সত্ত্বেও একটু আগেই সূর্য আকাশে উঠেছে বলে মনে হয় এবং পশ্চিমদিকে সূর্য দিগন্তের নীচে নেমে যাবার পরও সূর্যকে আকাশে দেখা যায়। **কাজেই কার্যত সূর্যোদয় একটু আগে এবং সূর্যাস্ত একটু পরে হয়।** বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণের জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে ঠিক গোল বলে মনে হয় না, উপর এবং নীচের দিকে একটু চ্যাপ্টা বলে মনে হয় (Fig.4.16)।

(e) **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য মরীচিকা** (Mirage) দেখা যায়। যা আসলে নেই, অলীক, অথচ মনে হয় আছে, তাই মরীচিকা। মরুভূমিতে বালু অত্যন্ত গরম। গরম বালুর সংস্পর্শে এসে বায়ুমণ্ডলের নীচে বায়ু গরম ও হাল্কা হয়। উপরের বায়ু অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ঘন থাকে। দূরে গাছের মাথার দিক থেকে যে আলো তির্যকভাবে নীচের দিকে আসছে, ঘন থেকে হাল্কা মাধ্যমে ঢুকবার সময় প্রতিসরণের ফলে তা ক্রমশ অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে হতে হতে যখন আপতন কোণ সংকট কোণ থেকে বড় হয়ে পড়ে তখন পূর্ণ প্রতিফলন হয়।

পূর্ণ প্রতিফলনের পর আলোকরশ্মি আবার নীচের হাল্কা মাধ্যম থেকে উপরের ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে। দর্শকের চোখে এই আলো পৌঁছালে,



(a) মরুভূমিতে নিম্ন মরীচিকা ।

(b) মেরু-প্রদেশে ঊর্দ্ধ-মরীচিকা ।

Fig. 4.17

তার মনে হয় আলো নীচের দিক থেকে আসছে। সে গাছের একটা অবশীর্ষ (inverted) প্রতিবিম্ব দেখতে পায় (Fig. 4.17a)। ঠিক যেমন জলে গাছের প্রতিবিম্বকে দেখা যায়। হাল্কা বায়ু উপরের দিকে ওঠে আর ভারী বায়ু নীচের দিকে নামে বলে বায়ুমণ্ডলে বায়ু একেবারে স্থির থাকে না। ফলে প্রতিবিম্ব অল্প কাঁপতে দেখা যায়, জলের উপর বাতাস বয়ে গেলে যেমন জলে গাছপালার প্রতিবিম্ব কাঁপে। এভাবেই তৃষ্ণার্ত পথিকের ভ্রম হয় গাছের নীচে বুঝি বা জলাশয় আছে, কিন্তু কাছে গিয়ে কোন জলাশয় দেখতে পায় না। এই বিভ্রান্তির নাম **নিম্ন মরীচিকা** (inferior mirage)।

মেরু অঞ্চলে যখন চারদিক বরফে ঢাকা তখন বায়ুমণ্ডলের নীচের দিকে বায়ু ঘন ও উপরের দিকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা থাকে। কাজেই ভূপৃষ্ঠের কোন জিনিস থেকে আলো উপরের দিকে ঘন থেকে লঘুতর মাধ্যমে যেতে যেতে কোন একটা তল থেকে পূর্ণ প্রতিফলনের পর আবার ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করবে এবং নীচের দিকে আসবে। দর্শকের ভ্রম হবে যে আলো উপর দিক থেকে আসছে। সে আকাশে বস্তুটির উল্টানো প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এই ধরনের মরীচিকাকে **ঊর্ধ্ব মরীচিকা** (superior mirage বলে।

(f) **হীরার** (diamond) টুক্‌রা জ্বল্ জ্বল্ করে। বায়ুতে হীরার সংকট কোণ খুব কম, মাত্র 24·5°। হীরার টুক্‌রার বিভিন্ন মুখগুলি এমন-ভাবে কেটে পালিশ করা হয়, যাতে দু'তিনটি মুখ ছাড়া আর সব তলেই

হীরার ভিতরে আলোর আপতন কোণ 24·5°-এর বেশী হয়। অর্থাৎ এই সব তলে আলোর পূর্ণ প্রতিফলন হয়। কাজেই সবকয়টি তল দিয়ে হীরার টুক্‌রার মধ্যে আলো ঢুকলেও, এইসব তলে বহুবার পূর্ণ প্রতিফলনের পর মাত্র দু'তিনটি মুখ দিয়েই আলো বাইরে আসতে পারে। সংকট কোণ খুব কম বলে আন্‌কোরা হীরার টুকরাও জ্বল্ জ্বল্ করে, তবে ওস্তাদ কারিগরের হাতে ঠিকমত কেটে পালিশ হলে তার জৌলুস বহুগুণে বেড়ে যায়।

(g) জানালার কাঁচ ফেটে চীড় ধরলে ঐ ফাটা জায়গায় বাতাস ঢুকে পড়ে। ঐ জায়গা থেকে পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আলো চোখে এসে পড়লে ফাটা জায়গাটা আয়নার মত চক্‌চকে দেখায়।

(h) জলের মধ্য দিয়ে বুদ্‌বুদ্ উঠতে দেখেছো? আলো যদি মোটামুটি জোরালো হয় তবে বুদ্‌বুদের তল (surface) থেকে আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য বুদ্‌বুদটি দেখবে চক্‌চক্ করছে।

কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হল। তোমার চারপাশের অসংখ্য ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলেই প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা পূর্ণ প্রতিফলনের সাহায্য নিতে হবে।

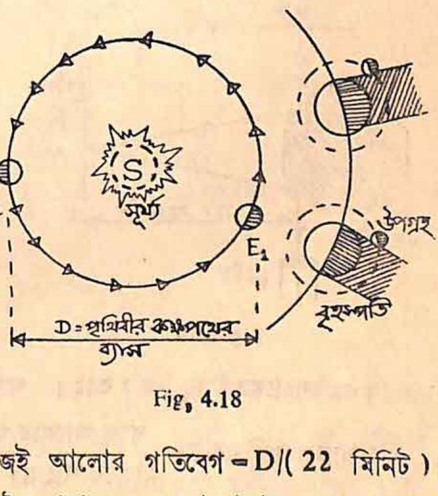
6. আলোর প্রসারণ ও গতিবেগ (propagation and velocity of light)

পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল ফেল। যেখানে ঢিলটা পড়ল সেখানে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে। এই আলোড়ন ঐ জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ঢেউ বা তরঙ্গের আকারে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এই তরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে। শব্দও তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গের বিশেষ ধর্মগুলি শব্দেও বর্তমান। শব্দ প্রসার লাভ করে বায়ু বা অন্য কোন পদার্থের মাধ্যমে। আলোও এক ধরনের তরঙ্গ। তবে জল-তরঙ্গ বা শব্দ তরঙ্গ প্রসারণের জন্য যেমন পদার্থ মাধ্যমের প্রয়োজন হয় আলোর ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোন পদার্থ মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। কেননা বহুদূরবর্তী নক্ষত্র থেকে মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ শূন্যের মধ্য দিয়েই আলো এসে আমাদের কাছে পৌছায়। উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা বলতেন যে, যাকে আমরা শূন্য (vacuum) বলছি আসলে সেটা শূন্য নয়। এইশূন্য

জুড়ে এমন একটা পদার্থ আছে যা আলোর তরঙ্গকে বহন ও সঞ্চালন করতে পারে। এই আকাশ পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছিল ইথার (ether)। ইথার একটি অনুমান মাত্র। কোন পরীক্ষাতেই অবশ্য এপর্যন্ত ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে, আলোর যে তরঙ্গোচিত ধর্ম রয়েছে অসংখ্য পরীক্ষাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

শব্দতরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে। এই গতিবেগ যে অসীম নয় তা সহজেই ধারণা করা যায়। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে যে শব্দ হয় সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাই। অর্থাৎ আলো আগে এসেছে, পরে শব্দ। সুতরাং আলোর গতিবেগ নিশ্চয়ই শব্দ থেকে অনেক বেশী। আপাতদৃষ্টিতে আলোর গতিবেগ অসীম বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। বিভিন্ন পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে আলোর গতিবেগ **সসীম** (finite), তবে অত্যন্ত বেশী। শূন্যে আলো প্রতি সেকেণ্ডে যায় প্রায় 1,86,000 মাইল বা 3×10^{10} সেন্টিমিটারের মত। প্রকৃতিতে এটাই সর্বোচ্চ গতিবেগ।

আলোর গতিবেগ যে সসীম এটা প্রথম বুঝতে পারেন রোমার (Roemer) নামে এক ড্যানিশ বৈজ্ঞানিক, 1675 খৃস্টাব্দে। রোমার বৃহস্পতি গ্রহের (Planet Jupiter) একটি উপগ্রহ আইও (Io)-এর গ্রহণ লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখলেন যে, পর পর দুটি গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন। বৃহস্পতি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যত বাড়তে থাকে এই সময়ের ব্যবধানও তত বাড়তে থাকে। 22 মিনিটের মত বেশী সময় যখন লাগে তখন আলোকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসের সমান বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। কাজেই আলোর গতিবেগ = D/(22 মিনিট)। পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাস কত সেটা রোমারের সময় ভালোভাবে জানা না থাকায়



Fig, 4.18

আলোর গতিবেগ ভালোভাবে পাওয়া যায়নি। তবে আলোর গতিবেগ যে সসীম এটা স্পষ্ট হয়েছিল।

রোমারের পর আরও অনেকে, বহুভাবে, আলোর গতিবেগ মেপেছেন। তার মধ্যে কেবল আলবার্ট মাইকেল্‌সনের (A. Michelson) পরীক্ষার কথাই এখানে একটু বলব। এই পরীক্ষায় আলোর উৎস S থেকে আলো অষ্টভুজ দর্পণ M-এর 1 নং তলে পড়েছে (Fig. 4.19)। সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে স্থির দর্পণ M′-এ গিয়েছে। M′-এ প্রতিফলিত হয়ে আলো এসেছে M দর্পণের 3 নং তলে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে অবশেষে দূরবীনে গিয়েছে। M ও M′-এর মধ্যে দূরত্ব ছিল 22 মাইল। M দর্পণটিকে ঘোরানো হয়। যদি দর্পণ এত জোরে ঘোরে যে 1 নং তল থেকে M′ হয়ে 3 নং তল পর্যন্ত যেতে আলোর যতটুকু সময় লাগে তারই মধ্যে 2 নং তলটি ঘুরে ঠিক 3 নং তলের আগের জায়গায় এসে যায় তবে দূরবীনে আলো আগে যেখানে দেখা যাচ্ছিল ঠিক সেখানেই দেখা যাবে। M দর্পণটি সেকেণ্ডে কয়বার করে ঘুরছে জানা থাকলে, 2 নং তল 3 নং-এর জায়গায় যেতে কতটুকু সময় লাগে তা জানা যাবে। এই সময়টি t হলে আলোর গতিবেগ $= 2D/t$। মাইকেল্‌সন আলোর গতিবেগ পেয়েছিলেন সেকেণ্ডে প্রায় 299,796 কিলোমিটার।

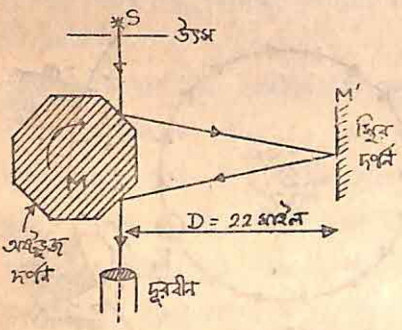


Fig. 4.19

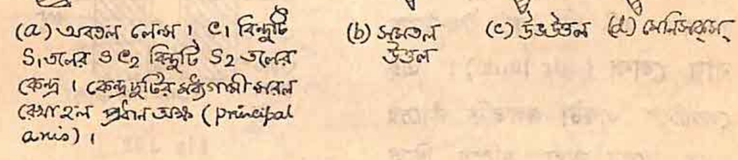
ঘন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ মেপে **ফুকো** (Foucoult) দেখিয়েছেন যে **আলো শূন্যে যত জোরে চলে, ঘন মাধ্যমে তার চেয়ে আস্তে যায়।** কোন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ ঐ মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে। আলোর তরঙ্গতত্ত্ব অনুযায়ী,

$$\text{মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক} = \frac{\text{শূন্যে আলোর গতিবেগ}}{\text{মাধ্যমে আলোর গতিবেগ}}\text{।}$$

7. উত্তল লেন্স এবং তার ফোকাস্ ক্রিয়া (Convex lens and its focussing action)

তোমার আশেপাশের লোকজনদের মধ্যে অনেকের চোখেই নিশ্চয় চশমা (Spectacles) দেখেছ। যাদের চোখে কিছু দোষ আছে, হয় দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না, নয়ত কাছের জিনিস দেখতে পায় না, বা উভয়তই, তারাই চশমা পরে; ঠিকমত দেখতে গেলে তাদেরই চশমা পরতে হয়। এই চশমায় যে দুটি কাঁচ লাগানো থাকে তারা হল **লেন্স** (lens)। **এই লেন্স হল দুটি তলের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমের কিছু অংশ।** তলদুটি অবশ্য যেমন-তেমন হলে হবে না, সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতির হতে হবে, যেমন সমতল, গোলীয় (spherical) বা বেলনাকৃতি (cylindrical) তল। বেশীর ভাগ লেন্সই গোলীয়। গোলীয় লেন্সের দুটি তলই গোলীয়, অথবা একটি তল গোলীয় এবং অপর তলটি সমতল হতে পারে।

যিনি দূরের জিনিস মোটেই দেখতে পান না অথচ নাকের ডগায় বই রেখে পড়তে পারেন, তাঁর চশমার লেন্সের মাঝখানটা প্রান্তভাগ (edge) থেকে সরু। এদের **অবতল** (concave) লেন্স বলে (Fig. 4.20a)।



(a) অবতল লেন্স। C_1 বিন্দুটি S_1 তলের ও C_2 বিন্দুটি S_2 তলের কেন্দ্র। কেন্দ্রদুটির মধ্যগামী সরল রেখা হল প্রধান অক্ষ (principal axis)।
(b) সমতল উত্তল
(c) উভউত্তল
(d) মেনিস্কাস্

Fig. 4.20

যাঁরা কাছের জিনিস দেখতে না পেলেও দূরের জিনিস ভালোই দেখেন তাঁদের লেন্সের মাঝখানটা প্রান্তভাগ থেকে মোটা। এদের **উত্তল** (convex) লেন্স বলে (Fig. 4.20 b, c, d)। চশমার উত্তল লেন্স উত্তল-অবতল (convexo-concave) যার এক পিঠ উত্তল আর অন্য পিঠ

অবতল। আতসী কাঁচও উত্তল লেন্স। আতসী কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত করে আগুন জ্বালানো যায় (Fig. 4.21)। যে লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো যাবার পর আগের চেয়ে বেশী অভিসারী হয় তাকে **অভিসারী** লেন্স (convergent lens) বলে। আতসী কাঁচ অভিসারী লেন্স। সাধারণত আতসী কাঁচ **উভ-উত্তল** (bi-convex) অর্থাৎ ছু পিঠই উত্তল (Fig 4.20 c)। একটা কাঁচের ওয়াচ গ্লাসে (watch glass) কিছুটা জল নিয়ে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলে জল জমে বরফ হয়ে যাবে। এটি হবে একটি সমতল উত্তল (plano-convex) (Fig. 4.20b) **বরফের লেন্স** (ice lens)।

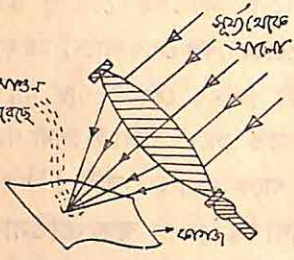


Fig. 4.21

যে লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো যাবার পর আগের থেকে বেশী অপসারী হয়ে পড়ে তাকে **অপসারী** (divergent) লেন্স বলে। চশমার অবতল লেন্স অপসারী লেন্স। কোন উত্তল লেন্স অভিসারী হবে কি অপসারী হবে তা নির্ভর করে লেন্স মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক, লেন্সটি যে মাধ্যমে রয়েছে তার প্রতিসরাঙ্ক থেকে কম না বেশী তার উপর। ছুটি ওয়াচ্ গ্লাস মুখোমুখি নিয়ে তাদের ধারগুলি মোম দিয়ে ভালোভাবে জুড়ে দেওয়া হল, যাতে জল ভিতরে ঢুকতে না পারে। এটি হল একটি উভ-উত্তল **বায়ু লেন্স** (air lens)। এই লেন্সটিকে একটা জলভর্তি কাঁচের পাত্রে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে লেন্সটি জলের মধ্যে অপসারী লেন্স হিসাবে কাজ করবে (Fig. 4.22)।

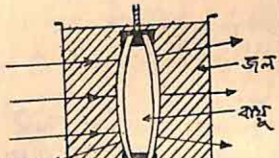


Fig. 4.22

উত্তল লেন্স ব্যবহৃত হয় অজস্র কাজে—চোখে দেখতে, ক্যামেরায় ছবি তুলতে, প্রোজেক্টর দিয়ে ফিল্মের ছবি পর্দায় ফেলতে, অণুবীক্ষণ দিয়ে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি দেখতে, আর দূরবীক্ষণে দূরে বহুদূরে দৃষ্টির সীমা বিস্তৃত করতে (Fig. 4.23)।

এবার দেখা যাক, উত্তল লেন্স কিভাবে কাজ করে। উত্তল লেন্সকে অনেকগুলি প্রিজমের টুকরো পর পর জোড়া লাগিয়ে তৈরী বলে ধরা যেতে পারে। এখানে প্রিজম (prism) সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। কোন মাধ্যমের একটি ফলকের তলগুলি (surfaces) সমতল এবং প্রান্তরেখা-

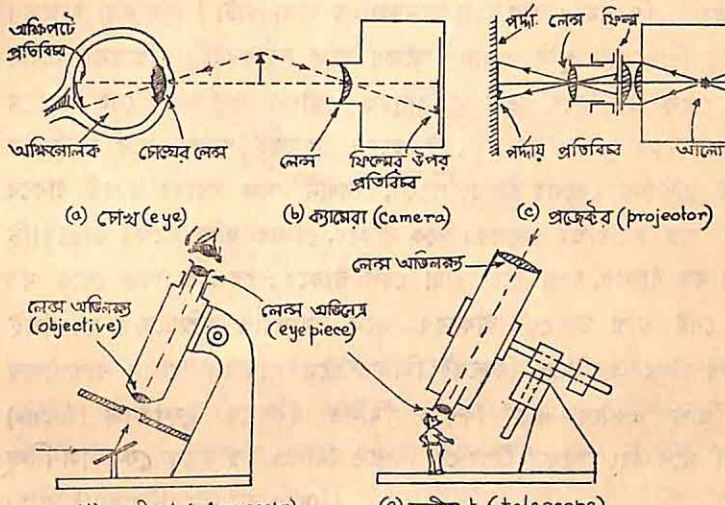


Fig. 4 23

গুলি (edges) সমান্তরাল হলে তাকে প্রিজম বলে (Fig. 4.24a)। ত্রিভুজাকৃতি প্রিজমের প্রধান **ছেদ** (section) একটি ত্রিভুজ। প্রিজমের

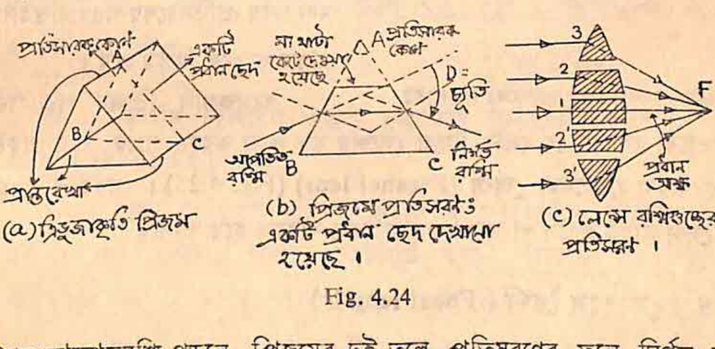


Fig. 4.24

উপর আলোকরশ্মি পড়লে, প্রিজমের দুই তলে প্রতিসরণের ফলে নির্গত রশ্মি ভূমির দিকে সরে যাবে (Fig. 4.24b)। এই সরে যাওয়া বা **চ্যুতি**

(deviation)-র পরিমাণ প্রিজমের প্রতিসারক কোণের উপর নির্ভর করে, কোণ বেশী হলে চ্যুতি বেশী হয়। ভূমির সমান্তরাল করে প্রিজমের মাথাটা কিছু কেটে দিলেও বাকী অংশটা আগের মতই কাজ করবে।

এবার Fig. 4.24c-এর দিকে ভালো করে তাকাও। লেন্সটিকে অনেকগুলি প্রিজমে (তার মধ্যে অনেকগুলির মাথা কাটা) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রিজমেরই ভূমি প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল। প্রিজমটি প্রধান অক্ষ থেকে যত দূরে, তার প্রতিসারক কোণও তত বড়; সেই প্রিজমে আলোকরশ্মির চ্যুতিও তত বেশী হবে। কাজেই অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল একটি রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপর পড়লে, প্রধান অক্ষ বরাবর রশ্মিটি বাঁকবে না। অন্য সব রশ্মিই অক্ষের দিকে বাঁকবে, যে-সব রশ্মি অক্ষের কাছাকাছি তারা কম বাঁকবে, যারা দূরে তারা বেশী বাঁকবে; যে রশ্মি অক্ষ থেকে যত দূরে সেই রশ্মি তত বেশী বাঁকবে। ফলে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছের সব রশ্মিই অক্ষের উপর একটিমাত্র বিন্দুতেই মিলিত হতে পারবে। কোন রশ্মিগুচ্ছের সব রশ্মি এভাবে এক বিন্দুতে মিলিত হওয়াকে **ফোকাস** (focus) হওয়া বলে এবং অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে **ফোকাস-বিন্দু** (focus বা focal point) বলে। এই ফোকাস-বিন্দুতে যদি আলোর উৎস রাখা যায় তবে লেন্সের উপরে আপতিত অপসারী রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ হয়ে নির্গত হবে।

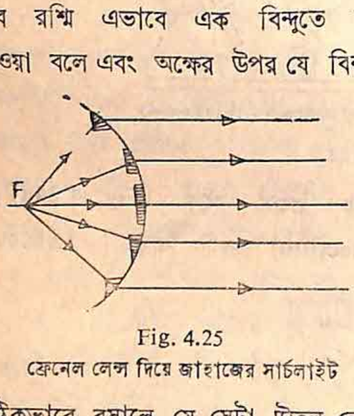


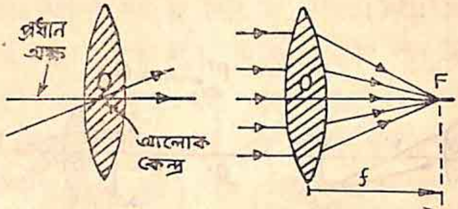
Fig. 4.25
ফ্রেনেল লেন্স দিয়ে জাহাজের সার্চলাইট

অনেকগুলি প্রিজম পর পর ঠিকভাবে বসালে যে সেটা উত্তল লেন্সের মত কাজ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল **ফ্রেনেল লেন্স** (Fresnel lens) (Fig. 4.25)। বহুকাল ধরেই এই লেন্স লাইট হাউস বা জাহাজের বাতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৪. **ফোকাস দৈর্ঘ্য** (Focal length)

লেন্সের দুই পাশে প্রধান অক্ষের উপর দুটি ফোকাস-বিন্দু থাকবে। লেন্স থেকে অক্ষ-বরাবর ফোকাস-বিন্দুর দূরত্ব নির্দিষ্ট। এই দূরত্ব লেন্সের যে-দিকে

ফোকাস-বিন্দুটি সে দিকের মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে। এই দূরত্ব মাপা হয় **আলোক কেন্দ্র** (optical centre) থেকে। সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র অক্ষের উপর এমন একটি বিন্দু যার মধ্য দিয়ে যে রশ্মি যায় তার কোন চ্যুতি হয় না (Fig. 4.26a)। আলোক-



(a) আলোক কেন্দ্র দিয়ে যে রশ্মি যায় তার কোন দিক পরিবর্তন হয় না। (b) f = ফোকাস দৈর্ঘ্য

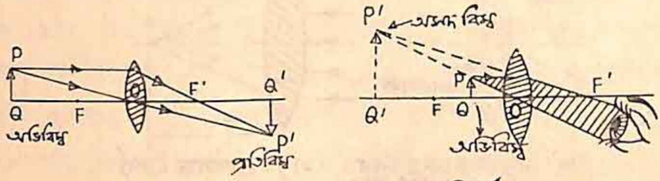
Fig 4.26

কেন্দ্র থেকে ফোকাস-বিন্দুর দূরত্বকে **ফোকাস দৈর্ঘ্য** (focal length) বলে। লেন্সের দুপাশে যদি একই মাধ্যম থাকে, তবে দুদিকের ফোকাস দৈর্ঘ্যই সমান। ফোকাস দৈর্ঘ্যকে f দিয়ে সূচিত করা হয়। 1/fকে বলা হয় লেন্সের **ক্ষমতা** (power)। f যদি মিটারে নেওয়া হয় তবে ক্ষমতার একক **ডায়োপ্টার** (dioptre)। অভিসারী লেন্সের ক্ষমতা **ধনাত্মক** (positive) এবং অপসারী লেন্সের ক্ষমতা ঋণাত্মক (negative) হয়। কোন চশমার লেন্সের ক্ষমতা +5 ডায়োপ্টার বললে একসঙ্গে অনেক কথা বলা হয়। লেন্সটি অভিসারী, উত্তল এবং তার ফোকাস দৈর্ঘ্য $\frac{1}{5}$ মিটার বা 20 সেন্টিমিটার।

9. বিবর্ধক হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার (Convex lens as a magnifying glass)

উত্তল লেন্স যে কেবলমাত্র সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকেই ফোকাস করে তা নয়, পাতলা লেন্সে অক্ষের মোটামুটি কাছে অবস্থিত যে-কোন বিন্দু উৎসেরই বিন্দু প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এই প্রতিবিম্ব কোথায় তা সহজেই বার করা যায়। Fig. 4 27aতে PQ অভিবিম্বের উপর P যে-কোন বিন্দু। P থেকে অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল রশ্মিটি লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে অপরদিকে

ফোকাস বিন্দু F দিয়ে যাবে এবং P থেকে আলোক কেন্দ্র O-র মধ্য দিয়ে রশ্মিটি সরাসরি চলে যাবে, বাঁকবে না। এ দুটি রশ্মি P′ বিন্দুতে ছেদ করেছে। P′ থেকে অক্ষের উপর লম্ব টানলে Q′ লম্বের পাদবিন্দু। Q′, Q বিন্দুর প্রতিবিম্ব (কেন ?) ; P′, P বিন্দুর প্রতিবিম্ব এবং P′Q রেখা PQ রেখার প্রতিবিম্ব।



(a) (b) বিবর্ধক।

Fig. 4.27

যতক্ষণ লেন্স থেকে অভিবিম্বটির দূরত্ব ফোকাস দৈর্ঘ্য থেকে বেশী ততক্ষণ প্রতিবিম্বটি সদ্ (real) এবং বিপরীত (inverted)। অভিবিম্বটিকে যদি লেন্সের খুব কাছে আনা হয়, যাতে লেন্স থেকে তার দূরত্ব ফোকাস দৈর্ঘ্য থেকে কম হয়, তবে মজার ব্যাপার ঘটে। তখন আর ঐ দুটি রশ্মি সত্যি সত্যি মিলিত হয়ে সদ্‌বিম্ব তৈরি করতে পারে না। তবে, লেন্সের অপরপিঠে চোখ রাখলে মনে হবে যে অপসারী রশ্মিগুচ্ছটি অভিবিম্ব যে-দিকে রয়েছে সে-দিকেই একটা অসদ্ বিম্ব থেকে আসছে। চোখ তখন বস্তুটির একটি সোজা (erect) অসদ্ এবং বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখতে পায় (Fig. 4.27b)। সাধারণ ম্যাগনিফায়িং গ্লাস এভাবে কাজ করে। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ব্যবহার করবার সময় লেন্সটিকে চোখের খুব কাছে রাখা হয়। যে জিনিসটিকে দেখতে হবে তাকে আগে-পিছে করে যে জায়গায় স্বচ্ছন্দে স্পষ্ট দেখা যায় সেখানে রাখা হয়। যারা ঘড়ি মেরামত করে তারা চোখে ঠুলির মত যেটা লাগায় সেটি একটি ম্যাগনিফায়িং লেন্স মাত্র।

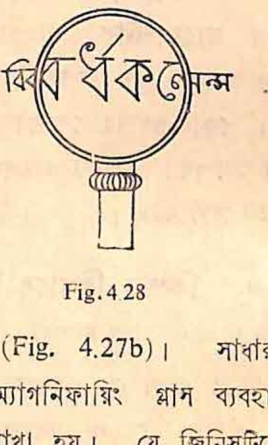


Fig. 4.28

10. আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)

সূর্যের আলো খালি চোখে সাদা দেখি। চোখে চশমা পরলে অর্থাৎ চোখের সামনে আর একটা লেন্স ধরলেও সূর্যের আলো সাদাই থেকে যায়। কিন্তু সূর্যের আলোর একটি সরু গুচ্ছ যদি প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় তবে একটু বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। প্রিজমের ভিতর দিয়ে যে আলো বাইরে আসে তা আর সাদা থাকে না। নির্গত আলোর পথে প্রিজম থেকে বেশ কিছুটা দূরে যদি একটা সাদা পর্দা রাখা যায়, তবে আলো একটা রঙিন পটীর আকারে পর্দার উপরে পড়ে। এই রঙিন পটীতে অসংখ্য বর্ণ থাকে। সব বর্ণের নাম অভিধানেও নেই। যে কয়টি মূল বর্ণ খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তারা হল, পটীর এক প্রান্ত হতে পর পর বেগুনী (violet), নীল (indigo), আকাশী (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow),

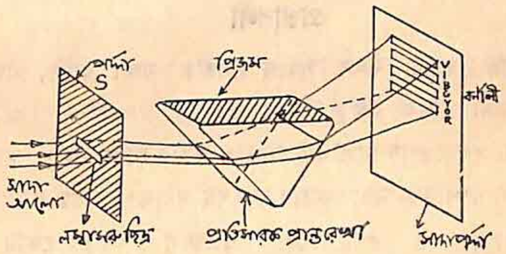


Fig. 4.29

কমলা (orange) ও লাল (red)। এই কয়টি রঙকে একসঙ্গে ইংরাজীতে **VIBGYOR** (ভিব্‌জিওর) ও বাংলায় **বেনীআসহকলা** বলা হয়। এই ঘটনাটি থেকে এটাই বোঝা যায় যে সাদা আলো যৌগিক, বহু মূলবর্ণের বা একবর্ণের (monochromatic light) সমষ্টি। যৌগিক আলোর মূল বর্ণগুলিতে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে **বিচ্ছুরণ** (dispersion) বলে। বিশ্লিষ্ট বহু বর্ণের আলোক পটীটিকে **বর্ণালী** (spectrum) বলে। রামধনু হল বিচ্ছুরণের একটি প্রকৃষ্ট প্রাকৃতিক উদাহরণ। 1666 খৃস্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন একটি সহজ পরীক্ষায় সাদা আলোকে প্রিজমে বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছিলেন। অন্ধকার বদ্ধ ঘরের জানালার কোন ছিদ্র দিয়ে সূর্যের আলো ঘরের ভিতর পাঠানো হল।

এই আলো S পর্দার (Fig. 4.29) একটি সরু লম্বা ছিদ্রের (slit) ভিতর দিয়ে প্রিজমের উপর ফেলা হল। প্রিজমটি এমনভাবে রাখা যাতে প্রিজমের প্রতিসারক প্রান্তরেখাটি স্লিটের দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল থাকে। প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত আলো সাদা দেওয়ালে ফেললে বর্ণালী দেখতে পাওয়া যাবে। পরীক্ষাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বর্ণের আলোর প্রিজমে চ্যুতি বিভিন্ন। সেজন্যই বিচ্ছুরণ হচ্ছে। প্রিজমে আলোক-রশ্মির চ্যুতি ঘটে প্রতিসরণের জন্য। কাজেই সিদ্ধান্ত হল যে কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আলোর বর্ণের উপর নির্ভরশীল (সাধারণত নীলবর্ণের জন্য প্রতিসরাঙ্ক যত, লাল বর্ণের জন্য তার চেয়ে কম)। কাজেই কোন মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলোর গতিবেগ বিভিন্ন।

প্রশ্নাবলী

1. আলোর বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে লেখ। সাদা বাতি, নিয়ন বাতি ও কার্বন আর্কের মধ্যে পার্থক্য কি?

2. 'আলো সরলরেখায় চলে' এই সিদ্ধান্ত করার কারণ কি? আলোকরশ্মির উভগম্যতার ও পারস্পরিক নিরপেক্ষতার তাৎপর্য দৃষ্টান্তসহকারে ব্যাখ্যা কর।

3. প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলি বল। কোন মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক বলতে কি বোঝায়?

4. লেন্স কাকে বলে? উত্তল লেন্সের ফোকাস ক্রিয়া বুঝিয়ে বল।

5. বিবর্ধকের সাহায্যে কিভাবে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়? একটি উত্তল লেন্স থেকে নিম্নলিখিত দূরত্বে অভিবিম্বকে রাখলে প্রতিবিম্ব কোথায় হবে এবং কি ধরনের হবে তা অঙ্কনের সাহায্যে নির্ণয় কর। লেন্স থেকে অভিবিম্বের দূরত্ব :—

(i) 2f থেকে বেশী, (ii) 2f, (iii) 2f ও f-এর মধ্যে, (iv) f, (v) f থেকে কম।

6. শুদ্ধ কর :—

(i) সোডিয়াম ডিস্‌চার্জ বাতি মূলত নীল আলো দেয়।

(ii) আকাশে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয় মেঘের সঞ্চিত তাপ থেকে।

(iii) অপসারী রশ্মিগুচ্ছে রশ্মিগুলি সমান্তরাল।

(iv) মাধ্যমের লঘুত্ব ও ঘনত্ব (আলোক সম্বন্ধীয়) মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

(v) যে মসৃণ তল থেকে একেবারেই প্রতিফলন হয় না তাকে দর্পণ বলে।

(vi) দর্পণে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তা সদ্ ও বিবর্ধিত।

(vii) বায়ুমণ্ডলে আলোর প্রতিফলনের জন্যই নক্ষত্রের আপাত-উন্নতি ঘটে।

(viii) আলোর গতিবেগ অসীম।

(ix) লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমে যাবার সময় আলোর গতিবেগ বৃদ্ধি পায়।

(x) যে লেন্সের প্রান্তভাগ থেকে মাঝখানটা মোটা তাকে অবতল লেন্স বলে।

(xi) অণুবীক্ষণের সাহায্যে আমরা গ্রহনক্ষত্র দেখে থাকি।

(xii) সাদা আলোতে একটিমাত্রই মূলবর্ণ রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পদার্থের স্বরূপ ও তার রূপান্তর

1. পদার্থ কি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা জল, বায়ু, কাঠ, কয়লা, লোহা, মাটি, পাথর প্রভৃতি নানা রকম জিনিসের সংস্পর্শে আসি ; এই সবই পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রত্যেকটিই কিছু না কিছু স্থান অধিকার করে থাকে এবং এদের ভর আছে। বস্তুত যার ভর আছে এবং যা স্থান অধিকার করে থাকে তাকে **পদার্থ** (matter) বলে।

সাধারণত, আমাদের কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করে থাকি। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই এক ফোঁটা জল গায়ে পড়লে বুঝতে অসুবিধা না হলেও তার সহস্র ভাগের এক ভাগ গায়ে পড়লে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম অংশও যে পদার্থ তা বহু পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায়।

যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবই পদার্থ নয়। যেমন তাপ, আলো ও শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও এরা শক্তিমাত্র, পদার্থ নয়। আবার চিনি যে মিষ্টি তা জিহ্বার সাহায্যে সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু মিষ্টত্ব একটি গুণ মাত্র, পদার্থ নয়।

2. পদার্থের অবস্থা (States of matter)

আমরা পদার্থসমূহকে সাধারণত তিন অবস্থায় দেখতে পাই—(1) কঠিন (Solid), (2) তরল (Liquid) ও (3) বায়বীয় বা গ্যাসীয় (Gaseous)।

কঠিন পদার্থ—যেমন কাঠ, কয়লা, পাথর, চক্, লবণ, সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাদি। কঠিন পদার্থের একটি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।

সাধারণ চাপ প্রয়োগে এই দুইয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ কঠিন পদার্থ যথেষ্ট দৃঢ় ও অনমনীয়। মার্বেলের গুলি থালা বা বাটি যাতেই রাখা যাক, তার আকৃতি ও আয়তন একই থাকে। সাধারণ চাপে এই আকৃতি ও আয়তন অপরিবর্তিত থাকে।

তরল পদার্থ—যেমন জল, দুধ, তেল, গ্লিসারিন, পারদ ইত্যাদি। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই, কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে। যে পাত্রে রাখা যায় তরল পদার্থ তার তলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তলাকার আকৃতি ধারণ করে। তা ছাড়া উপরের পিঠ প্রায় সমতল থাকে। জল বা দুধ গ্লাসে রাখলে গ্লাসের আকার ধারণ করে, বাটিতে রাখলে বাটির।

সাধারণ চাপে তরল পদার্থ অপরিবর্তিত থাকে। অধিক চাপ প্রয়োগে সাধারণত খুব সামান্যই আয়তন হ্রাস পায়। তা ছাড়া তরল পদার্থের গতি সর্বদা নিম্নাভিমুখী।

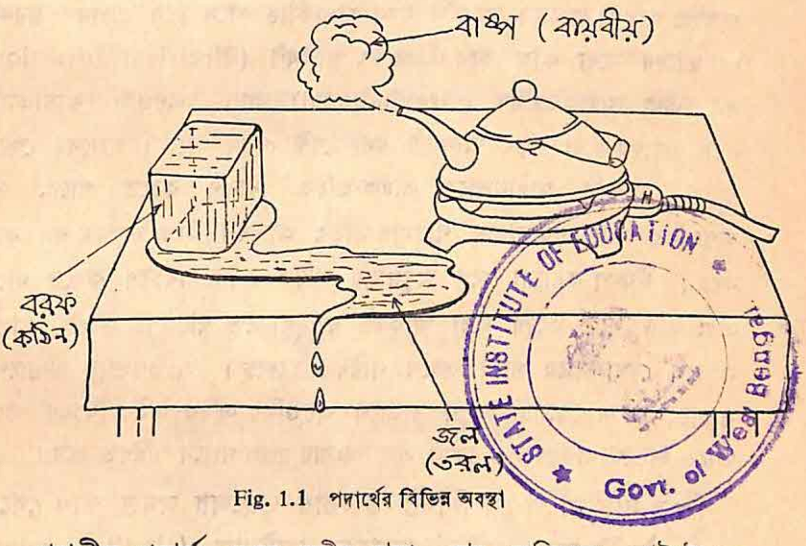


Fig. 1.1 পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

গ্যাসীয় পদার্থ—যেমন জলীয় বাষ্প, বায়ু, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি ও আয়তন থাকে না; যে পাত্রে রাখা যায় তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং পাত্রের আকার ধারণ করে।

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রেখে চাপ বাড়িয়ে গেলে গ্যাসের আয়তন কমতে থাকে

এবং চাপ কমিয়ে দিলে আয়তন বেড়ে যায়। এই সংকোচন ও প্রসারণশীলতা গ্যাসীয় পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম।

3. **অবস্থাত্রয়ের কারণ (Reason for the existence of the three states)**

কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সব পদার্থই অণুর সমষ্টি এবং এই অণুগুলি এক বা একাধিক পরমাণুবিশিষ্ট।

পদার্থের তিনটি অবস্থা **আণবিক গতিতত্ত্বের** (Kinetic molecular theory) সাহায্যে মোটামুটি বোঝানো যায়। আণবিক গতিতত্ত্ব অনুসারে একটি গ্যাসের অণুগুলি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট, এদিক-ওদিক স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। গ্যাসের অণুগুলি নিজেদের মধ্যে এবং যে পাত্রে থাকে তার দেওয়ালের সঙ্গেও সংঘর্ষ করে। পরমাণুগুলিতে পরা ও অপরা বিদ্যুৎধর্মী সূক্ষ্মতর কণিকা আছে। অণুগুলি যখন কাছাকাছি আসে তখন প্রধানত দুরকম বল তাদের মধ্যে কাজ করে। তড়িৎ আকর্ষণী (Electrical attraction) বল এবং মহাকর্ষজনিত (Gravitational) বল। অণুগুলি কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে তড়িৎ আকর্ষণী বলই বেশী প্রবল থাকে। গ্যাসের ক্ষেত্রে যদিও অণুগুলি স্বাধীনভাবে এদিক-ওদিক বিচরণ করতে পারে, তবু অণুগুলির মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ তড়িৎ আকর্ষণী কিংবা মহাকর্ষ বল কাজ করে। উষ্ণতা কমানো হলে অণুগুলির এদিক-ওদিক বিচরণ কমতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের মধ্যে আকর্ষণী বল বাড়তে থাকে। উষ্ণতা আরও কমালে দেখা যাবে গ্যাস তরলে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে উত্তাপের সাহায্যে কোন তরলের উষ্ণতা বাড়ালে অণুগুলির এদিক-ওদিক বিচরণ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং কোন এক উষ্ণতায় তরল গ্যাসে পরিণত হবে।

এক বায়ু চাপে যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সমস্ত স্থান থেকে বাষ্প তৈরী হয়, সেই উষ্ণতাকে স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) বলে।

সাধারণ উষ্ণতা ও বায়ুচাপেও তরল উন্মুক্ত তল থেকে তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তখন তাকে **বাষ্পীভবন** (Evaporation) বলে। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের জন্য জলাশয়ের জল কমে যায়।

আণবিক গতিতত্ত্ব অনুসারে কোন তরল পদার্থের সব অণুগুলির গতিশক্তি এক নয়। ফলে তরলের সমস্ত অণু একই গতিতে সঞ্চরণ করে না। তরলের উন্মুক্ত তলের অণুগুলি তরলের ভিতরকার অণুগুলির সঙ্গে প্রধানত দৃঢ় আকর্ষণী বল দ্বারা বাঁধা থাকে, সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। কোন কোন অণুর গতিশক্তি খুব বেশী হলে তারা আকর্ষণী বলের এই বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ফলে বাষ্পীভবন হতে থাকে। উষ্ণতা বাড়লে অণুগুলির গতিশক্তি আরও বেড়ে যাওয়ায় বাষ্পীভবন আরও সহজে হতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণী বল একরকমের না থাকায় কোনটির স্বাভাবিক আবার কোনটির কম বাষ্পীভবন হয়। যেমন, অ্যালকোহল সহজে বাষ্পে পরিণত হয়, কিন্তু জল অত সহজে হয় না।

কিন্তু যদি উষ্ণতা আরও বাড়ানো যায় তবে তরল ফুটতে থাকে। তখন তরলের উপর-নীচ সব জায়গা থেকে বুদ্‌বুদ্ আকারে অসংখ্য অণু বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। আণবিক গতিতত্ত্ব অনুযায়ী উষ্ণতা খুব বেশী হওয়ায় তরলের অণুগুলির গতিশক্তি তাদের আকর্ষণী বল থেকে অনেক বেশী হয় এবং সহজেই আকর্ষণী বল অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। স্ফুটনের ক্ষেত্রে তরলের অণুগুলির এ ধরনের আচরণ কল্পনা করা যেতে পারে।

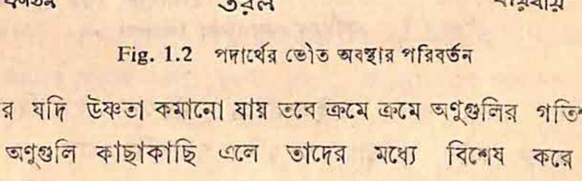
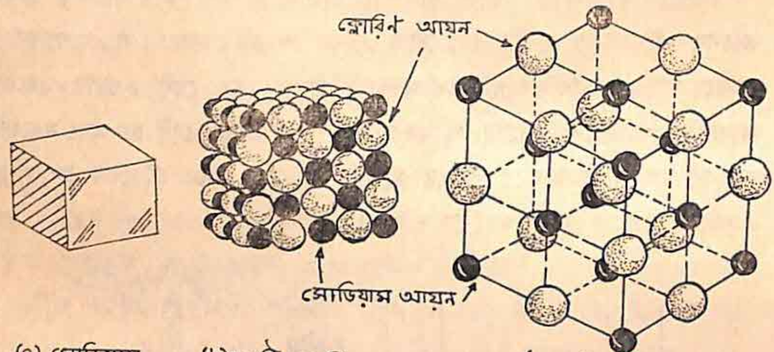


Fig. 1.2 পদার্থের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন

আবার যদি উষ্ণতা কমানো যায় তবে ক্রমে ক্রমে অণুগুলির গতিশক্তি হ্রাস পাবে। অণুগুলি কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে বিশেষ করে আকর্ষণী বল ও সামান্য মহাকর্ষ বল থাকার দরুণ অণুগুলির সঞ্চরণ অনেক কমে যাবে। ফলে বাষ্প তরলে পরিণত হবে। বাষ্প জমে তরল হওয়ার পদ্ধতিকে বলে **ঘনীভবন** (Condensation)। বরফগোলা জল গ্লাসে নিলে গ্লাসের বাইরে জলীয় বাষ্প জমে জল হওয়া ঘনীভবনের উদাহরণ।

তরলের উষ্ণতা আরও হ্রাস করলে তরল জমে কঠিনে পরিণত হয়। যে উষ্ণতায় তরল কঠিন হয় তাকে **হিমাঙ্ক** (Freezing point) বলে। ঐ একই উষ্ণতায় তাপ প্রয়োগে কঠিনকে আবার তরলে পরিণত করা যায়, তখন তাকে **গলনাঙ্ক** (Melting point) বলে।

অধিকাংশ কঠিন পদার্থই বহুসংখ্যক স্ফটিক দিয়ে তৈরী। স্ফটিকের জ্যামিতিক আকৃতিগুলি আবার নির্ভর করে কি কি উপাদান (অণু, পরমাণু অথবা আয়ন) দিয়ে তা তৈরী—সেগুলির ওপর। বহু কঠিন পদার্থের স্ফটিকগুলি বহুসংখ্যক অণু দিয়ে তৈরী। কঠিনে অণুগুলি গ্যাস কিংবা তরলের অণুগুলির মত সঞ্চরণ করে না, স্ফটিক ল্যাটিস (crystal lattice)-এর নির্দিষ্ট স্থানে তারা থাকে (Fig. 1.3)। যেমন



(a) সোডিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিক

(b) স্ফটিকের ভিতরে আয়নগুলি ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে।

(c) স্ফটিক ল্যাটিসে (crystal lattice) আয়নগুলি কি ভাবে সজ্জিত তা দূরে দূরে সরিয়ে দেখানো হল। ল্যাটিসে বিভিন্ন আয়নের স্থান মোটামুটি ভাবে সুনির্দিষ্ট।

Fig 1.3 কঠিনে ল্যাটিস বিন্যাস।

অ্যামোনিয়া গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন ইত্যাদিকে কঠিনে পরিণত করলে কঠিন অবস্থায় অণুগুলির গতিশক্তি এমন হয় যে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তেমন চলাফেরা না করলেও নিজ নিজ স্থানের এদিক-ওদিক ঈষৎ আন্দোলিত হতে পারে। ধাতুর স্ফটিকগুলি পরমাণু দিয়ে তৈরী, আবার বিভিন্ন লবণের অণুগুলি পরা ও অপরা বিদ্যুৎধর্মী আয়ন দিয়ে তৈরী। আণবিক গতিতত্ত্ব অনুযায়ী কঠিন অবস্থায় স্ফটিকের আয়ন কিংবা

পরমাণুগুলিও নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে ঈষৎ এদিক-ওদিক আন্দোলিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণত স্থানচ্যুত হয় না। সব উষ্ণতাতেই অবশ্য কিছু-সংখ্যক অণু, পরমাণু বা আয়ন স্ফটিক ল্যাটিস-এর শূন্য স্থানগুলির মধ্য দিয়ে ইতস্তত বিচরণ করে। উষ্ণতা বাড়লে এই সংখ্যাও বাড়ে। কোন এক উষ্ণতায় এই আন্দোলন এত বেড়ে যায় যে স্ফটিকের অন্তর্ভুক্ত বস্তুকণার নিয়মিত জ্যামিতিক ছক ভেঙ্গে বস্তুকণাগুলি স্থানচ্যুত হয়ে স্বাধীনভাবে সঞ্চরণ করতে পারে, যদিও বস্তুকণাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ঐ ইতস্তত সঞ্চরণের সময় প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কঠিন তখন তরলে পরিণত হয়।

গ্যাসের সঙ্গে এখানে তরলের পার্থক্য হল গ্যাসীয় অবস্থায় বস্তুকণাগুলির মধ্যে দূরত্ব মোটেই নির্দিষ্ট থাকে না। তরলের আয়তনও সেজন্য সাধারণ চোখে প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

4. পদার্থ সনাক্তকরণ (Identification of Matter)

যে অসংখ্য রকম পদার্থ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, তার প্রত্যেকটিরই কতকগুলি গুণ বা ধর্ম আছে যা তার নিজস্ব, এবং যার সাহায্যে তাকে চেনা যায়। যেমন সাধারণ অবস্থায় জল একটি তরল পদার্থ, কিন্তু জল কঠিন ও গ্যাসীয় অবস্থাতেও থাকতে পারে। এক বায়ুচাপে জলের হিমাঙ্ক 0°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 100°C। এ ছাড়া বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন এবং 4°C উষ্ণতায় 1 ml জলের ভর 1 gm। এটা C.G.S. পদ্ধতিতে ঘনত্ব মাপার একক ধরা হয়। 0°C-এ জল যখন বরফে পরিণত হয় তখন সেটা 4°C জলের চেয়ে হাল্কা বলে উপরে ভাসতে থাকে এবং নীচের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলে মাছ, তিমি, ইত্যাদি বেঁচে থাকতে পারে।

জলে বালি ছেড়ে দিলে সেটা দ্রবীভূত হয় না বললেই চলে, কিন্তু চিনি বা লবণ অনেক সহজে এবং বেশী মাত্রায় দ্রবীভূত হয়, অর্থাৎ চিনি বা লবণকে দ্রবীভূত করার ক্ষমতা জলের বেশী, কিন্তু বালিকে নয়। জলের এই গুণ বা আচরণ অবলম্বনে বালি থেকে চিনি বা লবণকে সহজেই পৃথক করা যায়। আবার বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে জলকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত করা যায়। তবে বিশুদ্ধ জল সুপরিবাহী নয়; তাতে সামান্য অ্যাসিড মিশিয়ে দিলে জলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো সহজ হয়

এবং সহজে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়। জলকে সুপরিবাহী করার জন্য যতটুকু অ্যাসিড মেশানো হয় তার পরিমাণ পরীক্ষার পর অবিকৃত থাকে। বলা বাহুল্য, জলের মত অন্যান্য প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব অনেক গুণ আছে যা দিয়ে তাকে চেনা যায়।

যে-সব গুণ, ধর্ম ও আচরণের সাহায্যে পদার্থকে সনাক্ত করা যায় তাদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(1) **ভৌত ধর্ম বা গুণ** (Physical properties)—যে সমস্ত ধর্মের সাহায্যে পদার্থের বাহ্যিক অবস্থা ও আচরণ বোঝা যায় তাদের ভৌত গুণ বা ধর্ম বলে। যেমন, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি।

(2) **রাসায়নিক ধর্ম বা গুণ** (Chemical properties)—যে সমস্ত গুণ বা ধর্মের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন এবং সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ তৈরী হয় সেই গুণ বা ধর্মগুলিকে রাসায়নিক ধর্ম বলে। জলে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে দু'টো নূতন গ্যাস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরী হয়। এটা জলের রাসায়নিক ধর্মের উদাহরণ।

1.4a ভৌত গুণাবলীর সাহায্যে পদার্থ সনাক্তকরণ (Identification of matter by physical methods)

প্রথমেই দেখতে হবে পদার্থটি কঠিন, তরল, না গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। তারপর তার ভৌত গুণগুলির সাহায্যে তাকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করতে হবে।

(i) **বর্ণ** (Colour)—কয়েকটি পদার্থের রং তোমাদের পরিচিত। যেমন—তুঁতের রং নীল, কঠিন অবস্থায় আয়োডিনের রং ধূসর, আর গ্যাসে পরিণত হলে তার রং বেগুনি ; লবণের রং সাদা, সোনা উজ্জল হলদে, কিন্তু জল বর্ণহীন। অনেক পদার্থ আবার বর্ণ দিয়ে চেনা যায় না। যেমন, লবণ আর চিনি দেখতে দুটোই সাদা। অনেক গ্যাসকে তার বর্ণ দেখে চেনা যায়। যেমন, বাদামী রং-এর গ্যাস ব্রোমিন বা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড হতে পারে।

(ii) **স্বাদ** (Taste)—সাধারণত খাওয়ার লবণ, চিনি, সাইট্রিক অ্যাসিড দেখতে সবগুলিই সাদা, কিন্তু স্বাদের সাহায্যে এদের পার্থক্য

হল—লবণ নোনতা, চিনি মিষ্টি, আর সাইট্রিক অ্যাসিড টক। সুতরাং খুব সাধারণভাবে এদের তফাৎ খানিকটা ধরা যায়।

(iii) **স্পর্শ** (Touch)—অনেক পদার্থ স্পর্শ করে বেশ বোঝা যায়। দৃষ্টিহীন লোকেরা সাধারণত স্পর্শ করেই অধিকাংশ পদার্থ বুঝে থাকেন। পাতলা, ঘন, চটচটে তরলের মধ্যে তফাৎ আঙুল দিয়ে বেশ বোঝা যায়। মসৃণ আর খরখরে পদার্থের তফাৎটাও স্পর্শ করে বোঝা যায়। যেমন, মোম ও সাবান মসৃণ, কিন্তু বালি খরখরে।

(iv) **গন্ধ** (Smell)—অনেক সময় গন্ধ থেকে পদার্থকে চেনা যায়। কর্পূর, কেরোসিন তেল, ন্যাপথ্যালিন, অ্যামোনিয়া (ঝাঁঝালো গন্ধ), ফিনল বা কার্বলিক অ্যাসিড (লাইফবয় সাবানে যে গন্ধটি পাওয়া যায়) ইত্যাদির বিশিষ্ট গন্ধ আছে। চিনি, লবণ ইত্যাদির গন্ধ নাই, তাই এদের মধ্যে তফাৎ গন্ধ শুঁকে বোঝা যায় না। তোমরা যখন রসায়নাগারে কাজ করবে তখন হাইড্রোজেন সালফাইড (পচা ডিমের মতো গন্ধ) ক্লোরিন এবং অ্যামোনিয়া (ঝাঁঝালো গন্ধ) গ্যাসের গন্ধের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত হবে।

(v) **আকৃতি** (Shape)—তরল বা গ্যাস যে পাত্রে রাখা হয় তার আকৃতি ধারণ করে, কিন্তু কঠিনের নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। মাইক্রোস্কোপের নীচে বিভিন্ন কঠিন পদার্থের স্ফটিকগুলির আকৃতি বিভিন্ন দেখায়। কয়েকটি স্ফটিকের চেহারা দেখানো গেল (Fig. 1.4)।

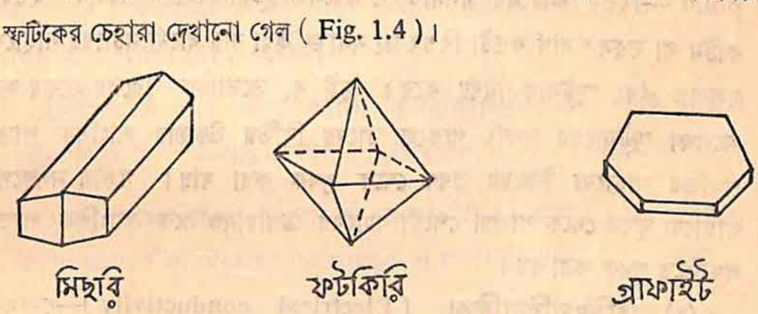


Fig. 1.4 কয়েকটি পরিচিত স্ফটিক

(vi) **ঘনত্ব** (Density)—বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব বিভিন্ন। অধিকাংশ কঠিনের ঘনত্ব জল থেকে বেশী। অবশ্য শোলা, বরফ এবং মোমের ঘনত্ব জল থেকে কম। ঘনত্ব মেপে পদার্থকে যেমন চেনা যায়, তেমনি পদার্থের

বিশুদ্ধতাও জানা যায়। গোয়ালার দুধে কতটুকু জল আছে তা ঘনত্ব মেপে অনেকটা আন্দাজ করা যায়।

(vii) **দ্রাব্যতা** (Solubility)—চিনি, লবণ, তুঁতে জলে দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়লে জলের মধ্যে হারিয়ে যায়। আবার তেল জলে দিলে জলের উপর ভাসতে থাকে। লবণ (Salt) অ্যালকোহলে দিলে অদ্রাব্য অবস্থায় পড়ে থাকে, কিন্তু জলে দিলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। সাধারণত খাদ্যলবণ জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু জলে হয়। সুতরাং লবণের দ্রাব্যতা থেকে দ্রাবকটি জৈব না অজৈব তা কিছুটা সনাক্ত করা যায়।

দ্রাব্যতা সম্পর্কে পরে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে।

(viii) **চৌম্বক ধর্ম** (Magnetic property)—তোমরা হয়তো দেখেছ যে চুম্বক দ্বারা লোহা আকৃষ্ট হয়; কিন্তু গন্ধক, তুঁতে, লবণ, তামা, দস্তা প্রভৃতি আকৃষ্ট হয় না। চুম্বকের সাহায্যে অনেক সময় মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণ যত ভালভাবেই তৈরি করা যাক না কেন একটি চুম্বক দণ্ড কাছে আনা মাত্র লোহার কণাগুলি মিশ্রণ থেকে আলাদা হয়ে চুম্বকে লেগে যায়। ধাতু নিষ্কাশনে তাই অনেক সময় আকরিকের বিশুদ্ধতা বাড়ানো হয় চুম্বকের সাহায্যে।

(ix) **গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক** (Melting point and Boiling point)—বিশুদ্ধ কঠিনের গলনাঙ্ক ও তরলের স্ফুটনাঙ্ক নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং কঠিন বা তরল পদার্থ কতটা বিশুদ্ধ তা সনাক্ত করা যায় থার্মোমিটারের সাহায্যে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করে। দুই বা ততোধিক তরলের একের অন্য অপেক্ষা স্ফুটনাঙ্কের তফাৎ থাকলে তাদের বিভিন্ন উষ্ণতায় আংশিক পাতন পদ্ধতির সাহায্যে উভয়ের দ্রবণ থেকে পৃথক করা যায়। গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে পাওয়া পেট্রোলিয়ামের উপাদানগুলিকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়।

(x) **তড়িৎপরিবাহিতা** (Electrical conductivity)—তোমরা হয়তো জানো যে ইলেকট্রিসিয়ানরা হাতে রবারের দস্তানা (গ্লাভস) পরে তড়িৎ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি মেরামত করে থাকেন। বাড়ীতেও অনেক সময় শুকনো কাঠের তক্তার উপর দাঁড়িয়ে তড়িৎ সম্পর্কিত কাজকর্ম করতে হয়। এ ধরনের সাবধানতা অবলম্বনের কারণ হল শুকনো কাঠ কিম্বা রবারের গ্লাভস তড়িৎ

কু-পরিবাহী, তাই তড়িৎস্পৃষ্টতা (Electric shock) থেকে রক্ষা করে। তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি তড়িৎ সু-পরিবাহী, তাই বৈদ্যুতিক তার হিসেবে ব্যবহার হয়। তরলের ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ জল, অ্যালকোহল ইত্যাদি তড়িৎ কু-পরিবাহী, সুতরাং তড়িৎবাহিতার সাহায্যে তড়িৎ কু-বাহী এবং সু-বাহীদের চেনা যায়।

(xi) **তাপপরিবাহিতা** (Heat conductivity)—তড়িৎবাহিতার মতো কোন কোন পদার্থ তাপের কু-পরিবাহী। যেমন কাঠ, জল ইত্যাদি। আবার কতকগুলি তাপ সু-পরিবাহী। যেমন লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, পারদ ইত্যাদি। সুতরাং তাপপরিবাহিতা মেপে পদার্থটি কি তা অনেকটা আন্দাজ করা যায়।

(xii) **আলোক সম্পর্কিত ধর্ম** (Optical properties)—আলোক প্রিজম দিয়ে বিশ্লিষ্ট করলে আমরা যে বর্ণালী পাই তা আলোক-উৎসের উপাদানগুলির বিশেষ পরিচয় বহন করে। অতএব কোন বর্ণালীর বিশেষত্বটুকু দেখেই উৎসে কি কি উপাদান আছে তা সনাক্ত করা যায়। আলোক বিশ্লিষ্ট না করে শুধু উৎসের রং দেখেই অনেক সময় পদার্থ সনাক্ত করা যায়। কতকগুলি ধাতব লবণ অপ্রভ বুনসেন শিখায় উত্তপ্ত করলে বিভিন্ন বর্ণের আলো দেয়। যেমন,

বেরিয়ামঘটিত লবণ—সবুজ আলো	ক্যালসিয়ামঘটিত লবণ—অস্থায়ী লাল
স্ট্রনসিয়াম " "—গাঢ় লাল	সোডিয়াম " "—সোনালী হলুদ

1.4b রাসায়নিক গুণাবলীর সাহায্যে পদার্থ সনাক্তকরণ (Identification of matter by chemical methods)

ভৌত গুণগুলি দেখার পর পদার্থের রাসায়নিক গুণগুলি পরীক্ষা করে দেখলে তাকে সনাক্ত করা সহজ হয়। তাপ ও অ্যাসিডের সাহায্যে কাজটি কিভাবে সম্পন্ন করা যায় নীচের উদাহরণগুলি থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে।

(a) কঠিন পদার্থ সনাক্তকরণ

তাপের প্রভাব—একটি শুষ্ক পরীক্ষানলে খানিকটা পদার্থ এমনভাবে নেওয়া হল যাতে পরীক্ষানলের গায়ে না লাগে। এবার পরীক্ষানলটিকে

আস্তে আস্তে গরম করা হল। এবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তাপের প্রভাব দেখানো গেল। যদি,

(i) ঊর্ধ্বক্ষেপটি সাদা হয়, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ঝাঁঝালো গন্ধবিশিষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হয়, যা লাল লিটমাসকে নীল করে, তবে পদার্থটি **অ্যামোনিয়ামঘটিত** যৌগ।

(ii) ঊর্ধ্বক্ষেপটি ধূসর বর্ণের এবং বেগুনি রং-এর গ্যাস জমা হয়, তবে পদার্থটি **আয়োডিন,** বা **আয়োডাইড ও কোন জারকের মিশ্রণ**।

(iii) ঊর্ধ্বক্ষেপটি ধূসর এবং কাঁচদণ্ড দিয়ে ঘষলে ছোট ছোট পারদ-বিন্দু তৈরী হয়, তবে পদার্থটি **পারদঘটিত যৌগ**।

অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া—একটি পরীক্ষানলে কিছুটা পদার্থ নিয়ে তার মধ্যে খানিকটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে সামান্য গরম করা হল। এক্ষেত্রে দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি

(i) বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বর্ণহীন গ্যাস বের হয় এবং চুনের জল ঘোলা হয়, তবে সাধারণত **কার্বনেটঘটিত** পদার্থ।

(ii) বর্ণহীন, কিন্তু পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত গ্যাস, লেড অ্যাসিটেট সিক্ত কাগজের রং **কালো** করে দেয়, তবে **সালফাইডঘটিত** পদার্থ।

(b) তরল পদার্থ সনাক্তকরণ

জল, অ্যালকোহল, কার্বন ডাইসালফাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড তরল পদার্থ। আবার বিভিন্ন লবণের দ্রবণও তরল (যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ)। সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি,

(i) নীল লিটমাসকে লাল করে তবে তা **অ্যাসিড,** কিংবা **আর্দ্র-বিশ্লেষ্য অম্ল** লবণ হতে পারে।

(ii) লাল লিটমাসকে নীল করে তবে **ক্ষারক** কিংবা **আর্দ্রবিশ্লেষ্য ক্ষারক** লবণ হতে পারে।

খানিকটা তরল বস্তু একটি শুকনো পরিষ্কার পরীক্ষানলে নিয়ে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করা হল। যদি,

(i) পরীক্ষানলে কিছু কঠিন পদার্থ পড়ে থাকে তবে মূল তরল বস্তুটি একটি **কঠিনের দ্রবণ।**

(ii) কোন কঠিন অবশিষ্ট না থাকে তবে তরল বস্তুটি **উদ্বায়ী** পদার্থ। যেমন জল, অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি।

(c) **গ্যাসীয় পদার্থ সনাক্তকরণ**

সাধারণত গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থ সনাক্ত করা শক্ত। খুব কম পরিমাণে থাকলে তা আরও শক্ত। কতকগুলি রাসায়নিক গুণাবলীর সাহায্যে অবশ্য খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—ক্লোরিন, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সিক্ত অবস্থায় বিরঞ্জকের কাজ করে। কোন কোন গ্যাস দাহ্য। যেমন, হাইড্রোজেন অথবা কার্বন মনোঅক্সাইড নীল শিখায় জ্বলে। কোন কোন গ্যাস নিজে জ্বলে না কিন্তু জ্বলতে সাহায্য করে। যেমন, অক্সিজেন অথবা নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস জারে দীপ্তিহীন জ্বলন্ত পাঠকাঠি প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলে ওঠে। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কোন রং নেই কিন্তু তা চুনের জলকে ঘোলা করে।

5. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন (Physical and Chemical change)

পদার্থ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে। (i) **ভৌত পরিবর্তন** (physical change) ও (ii) **রাসায়নিক পরিবর্তন** (chemical change)।

আমরা জানি বরফকে তাপ দিলে তা গলে জলে পরিণত হয় এবং আরও গরম করলে জল গ্যাসীয় বাষ্পে পরিণত হয়। আবার ঠাণ্ডা করলে 0°C উষ্ণতায় জল জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়।

এক্ষেত্রে জলের অবস্থার পরিবর্তনে তার গুণগুলির **সাময়িক পরিবর্তন** ঘটে বটে, কিন্তু জলের **মূল উপাদানগুলির কোন পরিবর্তন হয় না।** জলের তিন অবস্থাতেই তার অণুগুলি একই থাকে এবং তাদের পারমাণবিক উপাদান ও অনুপাত বদলায় না।

আবার, প্ল্যাটিনাম তার সাধারণ অবস্থায় ঝক্‌ঝকে সাদা, কিন্তু খুব উত্তপ্ত করলে লাল হয়ে যায়; আবার ঠাণ্ডা করলে লাল রং ত্যাগ করে আগের মতো ঝক্‌ঝকে সাদা হয়। এক্ষেত্রেও প্ল্যাটিনাম তারটির গুণ সাময়িকভাবে কিছু পরিবর্তিত হয় এবং সহজেই সেটা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এখানেও প্ল্যাটিনামের মূল উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় না।

উপরের দুটো দৃষ্টান্তই ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ।

অন্য দিকে, দুধকে জ্বাল না দিয়ে সাধারণ উষ্ণতায় রেখে দিলে কয়েকঘণ্টায় তা টকে যায়। এই টক দুধকে কোন সহজ প্রক্রিয়ায় দুধে ফিরিয়ে আনা যায় না। তেমনি কয়লা পুড়ে ছাই হয়, তাকে কখনই কয়লায় পরিণত করা যাবে না। এক্ষেত্রে **পরিবর্তনটি স্থায়ী**। তামার তার বাতাসে ফেলে রাখলে তার রং দ্রুত বদলে যায় এবং গাঢ় বাদামী রং-এর একটি পাতলা স্তর তারের উপর পড়ে। তারের ওজন না কমিয়ে কোন ভৌত উপায়েই তারটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ **পরিবর্তনটি স্থায়ী** এবং তামার ও তার বাদামী স্তরের **রাসায়নিক উপাদান ও পরিমাণ** এক নয়। বাদামী স্তরটি তামার একটি অক্সাইড তামা ও অক্সিজেনের যৌগ)। এই শেষোক্ত দৃষ্টান্তগুলি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়—

(1) **ভৌত পরিবর্তন**—যে পরিবর্তনে পদার্থের কতকগুলি **গুণ সাময়িকভাবে** পরিবর্তিত হয় ও পদার্থটিকে সহজেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, এবং যে সকল অণুদ্বারা পদার্থটি গঠিত তাদের কোন পরিবর্তন হয় না, সেই পরিবর্তনটিকে **ভৌত পরিবর্তন** (Physical change) বলে।

(2) **রাসায়নিক পরিবর্তন**—যে পরিবর্তনে পদার্থের ধর্ম সম্পূর্ণ বদলে যায় ও নতুন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং খুব সহজে নবোৎপন্ন পদার্থটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না, অর্থাৎ যেখানে পরিবর্তনটি মোটামুটি স্থায়ী, বিশেষ করে যে পরিবর্তনে পদার্থের রাসায়নিক পার্থক্য

ঘটে অর্থাৎ অণুগুলি বদলে যায়, তাকে **রাসায়নিক পরিবর্তন** (Chemical change) বলে।

নীচে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা গেল।

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
1. কোন নতুন পদার্থ তৈরী হয় না। যেমন, লোহাকে চুম্বকে পরিণত করলে লোহার ঘনত্ব, রং ইত্যাদি ভৌত ধর্ম এবং অন্যান্য রাসায়নিক ধর্ম বদলায় না।	1. নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ তৈরী হয়। যেমন, পরিষ্কার লোহার গুঁড়ো (5 ভাগ) এবং গন্ধকের (3 ভাগ) মিশ্রণকে একটি পরীক্ষানলে নিয়ে উত্তপ্ত করে গলিয়ে ফেলে এবং তার পর ঠাণ্ডা করলে একটি কালো পদার্থ (আয়রন সালফাইড) পাওয়া যাবে। কালো পদার্থ গুঁড়ো করলে তা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে লোহার ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে এবং লোহা সালফারের সঙ্গে একটি নতুন পদার্থ তৈরি করেছে।
2. **ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী হয়। যে যে কারণে ভৌত পরিবর্তন হয় সেই কারণ-গুলি সরিয়ে ফেললে পদার্থটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে।** যেমন, জলকে বাষ্প কিংবা বরফে পরিণত করলে জলের উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় না।	2. **রাসায়নিক পরিবর্তন সাধারণত স্থায়ী হয় এবং যে যে কারণে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে থাকে সেই কারণগুলি সরিয়ে ফেললে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না।** যেমন, 1নং পরীক্ষায় লৌহচূর্ণ এবং গন্ধক

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
জল 2 পরমাণু হাইড্রোজেন (H) এবং 1 পরমাণু অক্সিজেন (O) দিয়ে তৈরী। জলকে কঠিন, তরল কিংবা বাষ্পাবস্থায় বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেকটি জল অণুতে সব সময়ে 2টি H এবং 1টি O পরমাণু থাকবে।	উত্তপ্ত করার আগে যে গুণগুলি ছিল তা উত্তপ্ত করার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। আয়রন সালফাইডে লোহা এবং সালফারের নিজস্ব ধর্মগুলি লোপ পেয়েছে। কোন সহজ উপায়ে আয়রন সালফাইড থেকে লোহা এবং সালফার পাওয়া সম্ভব নয়।
3. পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের (কঠিন, তরল এবং গ্যাস) সময় যদিও 'লীন তাপ' শোষিত কিংবা নির্গত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাপ নির্গমন কিংবা শোষণ খুব বেশী একটা হয় না।	3. রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপ উদ্ভব (তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া) অথবা তাপ শোষণ (তাপগ্রাহী বিক্রিয়া) হয়ে থাকে। যেমন, বিশুদ্ধ চুন জলে দিলে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। এখানে চুন কলিচুনে পরিণত হয়।
4. পদার্থের ভরের কোন পরিবর্তন হয় না।	4. যে পদার্থটি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নতুন পদার্থে পরিণত হয় তার ভরের পরিবর্তন হয়। যেমন, লোহায় মরচে ধরলে লোহার ওজন বেড়ে যায়।

6. যে-সব কারণগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে (Factors which induce and regulate chemical change)

রাসায়নিক বিক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ তোমাদের জানা আছে। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে যে-সব কারণগুলি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তা আলোচনা করা গেল।

(i) **সংযোগ** (Contact) – গন্ধক ও লোহার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেখা গেছে, যতক্ষণ না তাপ প্রয়োগে গন্ধক ও লোহাকে গলানো হয়

ততক্ষণ বিক্রিয়া শুরু হয় না। এর কারণ হল, কঠিন অবস্থায় লোহা ও গন্ধকের কণাগুলি যে অসংখ্য অণু দিয়ে তৈরী তার খুব কমসংখ্যকই কাছাকাছি আসতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ খুব সামান্যই হয়। অপরপক্ষে, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় কোন একটি পদার্থের অণুগুলি সহজেই অন্য পদার্থের (কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয়) অণুগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। মূল কথা হল, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুগুলির মধ্যে সংযোগ হওয়া আবশ্যক। এই সংযোগ হতে গেলে অণুগুলিকে অবশ্যই খুব কাছাকাছি আসতে হবে যা তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় সম্ভব কিন্তু কঠিন অবস্থায় সাধারণত সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফস্‌ফরাস এবং আয়োডিন পাশাপাশি রেখে দিলে কোন বিক্রিয়া হয় না; কিন্তু যে মুহূর্তে ওদের মধ্যে সংযোগ ঘটে, প্রবল বেগে বিক্রিয়া হয় এবং ফস্‌ফরাস আয়োডাইড যৌগ তৈরী হয়।

(ii) **চাপের প্রভাব**—গ্যাসের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। পাত্রের আয়তনই গ্যাসের আয়তন। একইসংখ্যক গ্যাসীয় অণুগুলির মধ্যে দূরত্ব ছোট আধারে কম, কিন্তু বড় আধারে বেশী। আবার চাপ প্রয়োগ করে গ্যাসের আয়তন কমালে গ্যাসীয় অণুগুলির মধ্যে দূরত্ব কমে যায়, ফলে অণুগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে যায়। গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে দূরত্ব হ্রাস হলে বিক্রিয়া সহজে হয়। যেমন, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (**HCl**) এবং ফসফিউ-রেটেড হাইড্রোজেন দু'টি গ্যাস চাপের প্রভাবে বিক্রিয়া করে এবং কঠিন ফস্‌ফোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরী হয়।

(iii) **উষ্ণতার প্রভাব**—অনেক সময় দেখা যায় উষ্ণতা না বাড়ালে বিক্রিয়া হয় না। তাপশক্তির প্রভাবে অণুগুলি উত্তেজিত হলে, ঐ অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং ফলে বিক্রিয়া হয়। উত্তাপের প্রভাবে যেমন সংযোগ ঘটিয়ে নতুন পদার্থ তৈরি করা যায় আবার উত্তাপের সাহায্যে পদার্থের উপাদানগুলিকে বিয়োজিত করেও নতুন পদার্থ তৈরি করা যায়। যেমন, মারকিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে তা থেকে মারকারি এবং অক্সিজেন তৈরী হয়।

(iv) **আলোর প্রভাব**—অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া আলোর উপস্থিতি ছাড়া হয় না। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস তৈরি করে। কিন্তু অন্ধকারে কোন বিক্রিয়া হয় না। সবুজ গাছের পাতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল থেকে যে শর্করাজাতীয় পদার্থ তৈরী হয় তা আলোর উপস্থিতি ছাড়া হয় না।

(v) **তড়িৎ-এর প্রভাব**—একটি পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া হল। এবার তড়িৎপ্রবাহ জলের মধ্যে পাঠালে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটি গ্যাস তৈরী হয়। তেমনি, গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভেতর তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে সোডিয়াম ধাতু এবং ক্লোরিন গ্যাস তৈরী হয়। কেবল বিয়োজন বিক্রিয়া নয়, বহু সংযোগ বিক্রিয়াতেও তড়িৎ-এর প্রভাবের কথা জানা আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিশিয়ে রেখে দিলে কোন বিক্রিয়াই হয় না, অথচ যদি ঐ মিশ্রণে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ পাঠানো যায় তবে তৎক্ষণাৎ বিক্রিয়া হয়ে জল তৈরী হয়।

(vi) **অনুঘটকের প্রভাব**—এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ অন্য কোন পদার্থের উপস্থিতিতে হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পায়, অথচ ঐ সব পদার্থগুলির নিজেদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। যেমন, অক্সিজেন প্রস্তুতিতে পটাসিয়াম ক্লোরেটকে খুব বেশী উত্তপ্ত না করলে অক্সিজেন পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয় তবে মাত্র 240°C উষ্ণতায় অক্সিজেন তৈরী হয়। এখানে বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম একই থাকে। এক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড একটি **অনুঘটক** (catalyst)। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সংযোগ প্ল্যাটিনাম অনুঘটকের উপস্থিতিতে ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয়। বিক্রিয়ায় অনুঘটকের প্রভাব তোমরা আরও অনেক পড়বে।

7. তাপ-উদগারী (Exothermic) এবং তাপগ্রাহী (Endothermic) বিক্রিয়া—

রাসায়নিক বিক্রিয়া কি তা তোমরা জেনেছ। আমাদের দেহের বাইরে কত রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া অনবরত হয়ে চলেছে তার সামান্যই আমরা জানি। সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যে-সব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ নির্গত হয়, তাদের **তাপ-উদ্গারী** (exothermic) বিক্রিয়া বলে। যেমন, কয়লা যখন জ্বলতে থাকে তখন প্রচুর পরিমাণ তাপ নির্গত হয়। এখানে কয়লার অঙ্গার বা কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরী হয়।

C	+	O_2	=	CO_2	তাপ উদ্গীরণ
কার্বন		অক্সিজেন		কার্বন ডাইঅক্সাইড	(94,300 cals.)

তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়ায় অনেক সময় এত তাপ নির্গত হয় যে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে চালু রাখতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তা বিক্রিয়া থেকেই পাওয়া যায়।

অপরপক্ষে, যে-সব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ শোষণ হয়, তাদের **তাপগ্রাহী** (endothermic) বিক্রিয়া বলে। কার্বন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ পাঠালে অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরী হয়। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ তাপ শোষিত হয়, ফলে অনবরত অ্যাসিটিলিন তৈরি করতে হলে ক্রমাগত তাপ দিতে হবে।

$2C$	+	H_2	=	C_2H_2	তাপ শোষণ
কার্বন		হাইড্রোজেন		অ্যাসিটিলিন	(53,140 cals.)

৪. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ (Elements and Compounds)

বিশুদ্ধ পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, **মৌলিক** ও **যৌগিক**। উদাহরণস্বরূপ আয়রন, কপার, লেড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। আর জল, সোডিয়াম ক্লোরাইড, আয়রন সালফাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ। এখন যদি এক টুকরো লোহাকে ক্রমাগত ভাঙ্গা যায় তবে কোন এক সময় এমন সূক্ষ্মতম লোহাকণা পাওয়া যাবে যার মধ্যে লোহার সমস্ত ধর্ম থাকে অথচ তাকে সাধারণ ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আর ভাঙ্গা যায় না। লোহার এই সূক্ষ্মতম অবস্থাকে লোহার **পরমাণু** বলে। একইভাবে গন্ধক, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদিকে ক্রমাগত ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তাদের সূক্ষ্মতম কণা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির পরমাণু পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, লোহা, গন্ধক ইত্যাদি প্রত্যেকটি একই প্রকার বিশেষ বিশেষ

পরমাণু দিয়ে তৈরী। একই প্রকার পরমাণু দিয়ে তৈরী পদার্থকে **মৌলিক** পদার্থ (element) বলে। এ পর্যন্ত 105টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এই 105টি মৌলিক পদার্থ আবার 105 রকম পরমাণু দিয়ে তৈরী।

এত অসংখ্য মৌলিক পদার্থের মধ্যে সংযোগ সাধনের ফলে যে কত নতুন পদার্থ তৈরী হতে পারে তা ভাবতে পার কি? যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা আছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **যৌগিক** পদার্থ (compound) তৈরী হয়। জল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটি যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম হল—

(1) যৌগিক পদার্থের নিজস্ব ধর্ম আছে। যৌগিক পদার্থের উপাদান-গুলির ধর্ম যৌগিক পদার্থের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) গ্যাস জল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(2) সাধারণ ভৌত প্রণালীর সাহায্যে যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করা যায় না। যেমন, জলের H এবং O সাধারণভাবে পৃথক করা যায় না।

(3) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলির অনুপাত সব সময় এক থাকে।

(4) যৌগ তৈরী হওয়া কিংবা যৌগ ভেঙ্গে অন্য পদার্থ তৈরী হওয়ার সময় তাপ উদ্গীরণ কিংবা তাপ শোষণ হয়ে থাকে।

(5) যৌগের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক থাকে।

মৌলিক পদার্থগুলি যে-কোন নিয়মে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ তৈরি করে না, বিশেষ নিয়ম মেনে চলে।

যৌগিক পদার্থ যেভাবেই তৈরী হোক না কেন কোনটি তড়িৎ সু-পরিবাহী আবার কোনটি তড়িৎ কু-পরিবাহী। অধিকাংশ ধাতুর লবণগুলির দ্রবণ, কিংবা গলিত অবস্থায় ধাতব লবণগুলি সহজেই তড়িৎ বহন করতে পারে। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি। অধিকাংশ জৈব পদার্থ তড়িৎ কু-পরিবাহী, যেমন ইথাইল অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, ইথার ইত্যাদি।

9. মৌলিক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ—ধাতু ও অধাতু (Metals and Non-metals)

সমস্ত মৌলিক পদার্থকে সাধারণভাবে ধাতু এবং অধাতু এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। মৌলিক পদার্থগুলির ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করেই এই শ্রেণীবিভাগ। অনেক যৌগিক পদার্থের দ্রবণে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে যৌগিক পদার্থটি **পরা** (electropositive) এবং **অপরা** (electronegative) বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়নে ভেঙ্গে যায়। দেখা গেছে অধিকাংশ ধাতব আয়নগুলি পরা-বিদ্যুৎবাহী আর অধাতব আয়নগুলি অপরা-বিদ্যুৎবাহী। হাইড্রোজেন ধাতব মৌল না হয়েও পরা-বিদ্যুৎবাহী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বোরন, সিলিকন, আরসেনিক প্রভৃতি মৌলগুলি প্রকৃত ধাতু কিংবা অধাতুর পর্যায়ে পড়ে না। এদের ধাতু এবং অধাতুর উভয় ধর্মই আছে। এদের **ধাতুকল্প** (metalloid) বলা হয়। ধাতু ও অধাতুর তথ্যগুলি নীচে আলোচনা করা গেল।

ধাতু	অধাতু
1. সাধারণত তাপ ও বিদ্যুৎ সু-পরিবাহী। 2. দ্যুতিসম্পন্ন (bright)। 3. পারদ ব্যতীত অন্য সব ধাতুই সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় থাকে। 4. ঘাতসহতা অধিক (malleability)।	1-4. সাধারণত বিপরীতধর্মী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়—যেমন, গ্রাফাইট অধাতু, কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবাহী; হীরক অধাতু কিন্তু আলোক-প্রতিফলনক্ষম; আয়োডিন অধাতু কিন্তু দ্যুতিসম্পন্ন। অনেক অধাতুও (যেমন কার্বন, সালফার ইত্যাদি) সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় থাকে।
5. ধাতব আয়নগুলি পরা-বিদ্যুৎযুক্ত হয়।	5. অধাতব পরমাণু আয়নিত অবস্থায় অপরা-বিদ্যুৎযুক্ত হয়।
6. ধাতব অক্সাইড (যেমন, সোডিয়াম অক্সাইড, Na_2O ; ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO) ক্ষারজাতীয়।	6. অধাতব অক্সাইডগুলি সাধারণত অম্লজাতীয়। যেমন—সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3), ফস্‌ফরাস পেন্টোক্সাইড (P_2O_5)।

ধাতু	অধাতু
7. অধিকাংশ ধাতুই খনিজ অ্যাসিড (mineral acid যেমন, HCl, H_2SO_4) দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী হয়। ধাতু+অ্যাসিড=ধাতব লবণ +হাইড্রোজেন গ্যাস	7. অধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের ক্রিয়া অনেক কম।
8. ধাতুগুলি খুব কমই হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর যদিও বা যুক্ত হয় ধাতব হাইড্রাইডগুলি অস্থায়ী হয়ে থাকে।	8. অধাতব হাইড্রাইডগুলি (যেমন, HCl, NH_3 ইত্যাদি) বেশ স্থায়ী।

10. **প্রকৃতিতে ধাতুর স্থান**—কোন কোন ধাতু প্রকৃতিতে মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন সোনা, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাতুগুলি বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হিসেবে থাকে। যেমন—

(i) অক্সাইড—বক্সাইট, $Al_2O_3, 2H_2O$; হিমাটাইট, Fe_2O_3

(ii) কার্বনেট—চুনাপাথর, $CaCO_3$; ডলোমাইট, $CaCO_3 . MgCO_3$

(iii) সালফাইড—গ্যালেনা, PbS ; জিঙ্ক ব্লেণ্ড, ZnS

(iv) সালফেট—জিপসাম, $CaSO_4, 2H_2O$

(v) নাইট্রেট—চিলি সোরা, $NaNO_3$; সোরা KNO_3

(vi) হ্যালাইড—লবণ, NaCl ইত্যাদি।

যে-সব খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা হয় তাদের ধাতুর **আকরিক** (ore) বলে।

প্রশ্নাবলী

1. পদার্থ কি ? পদার্থের তিনটি অবস্থার ভৌত গুণগুলি আলোচনা কর। পদার্থ তিন অবস্থায় কেন থাকে ?

2. তাপ ও অ্যাসিডের প্রভাবে পদার্থের কি কি পরিবর্তন হয় ? সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, নাইট্রেট ও সালফাইডঘটিত লবণ কিভাবে সনাক্ত করবে ?

3. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝ ? এই দুই পরিবর্তনের তফাৎগুলি উদাহরণের সাহায্যে বোঝাও।

4. বিভিন্ন কারণগুলি কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

5. যৌগিক পদার্থের সাধারণ ধর্মগুলি কি ?

6. মৌলিক পদার্থ ক'রকম? ধাতু ও অধাতুর তফাৎগুলি আলোচনা কর। প্রকৃতিতে ধাতু কিভাবে থাকে ?

7. ঠিক না হলে শুদ্ধ কর :—

(i) তাপ, আলো ও শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই এরা পদার্থ।

(ii) উষ্ণতা বাড়লে কঠিনের আয়তন কমতে থাকে।

(iii) যে-কোন উষ্ণতা ও চাপে তরলের উপর তল থেকে তরলের বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়াকে স্ফুটন বলে।

(iv) তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে জল ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হওয়া একটি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ।

(v) গ্যাসের নির্দিষ্ট আকার আছে কিন্তু কঠিনের নেই।

(vi) রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থকে সহজেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

8. সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ :—

(i) গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, (ii) বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন, (iii) স্ফটিক ল্যাটিস, (iv) তাপ-উদ্গারী ও তাপগ্রাহী বিক্রিয়া, (v) অনুঘটক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্রাব ও দ্রাবক নিয়ে দ্রবণ

1. দ্রবণ, দ্রাব ও দ্রাবক (Solution, Solute and Solvent)

খানিকটা লবণ জলে দিয়ে নেড়ে দিলে তাকে খালি চোখে আর দেখতে পাওয়া যায় না, যদিও লবণ যে জলে আছে তা স্বাদ থেকে বেশ বোঝা যায়। তেমনি আরও অনেক কঠিন পদার্থ জলে কিংবা অন্য কোন তরলে দিলে একইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যদি তুঁতের গুঁড়ো মেশানো হয় তবে তাও জলের সর্বত্র এভাবে ছড়িয়ে একটি নীল রং-এর তরল পদার্থ তৈরি করে যা থেকে তরলে তুঁতের অস্তিত্ব বোঝা যায়। ঐ তরলের যে-কোন অংশে জল এবং তুঁতের অনুপাত একই থাকে। এ ধরনের মিশ্রণগুলি **সমসত্ত্ব** (homogeneous)। তরলে কঠিন পদার্থ মিশিয়ে এভাবে যে সমসত্ত্ব মিশ্রণ পাওয়া যায় তা সহজেই ফিলটার কাগজের সূক্ষ্ম ছিদ্র ভেদ করে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ, তরল ও কঠিনের সমসত্ত্ব মিশ্রণে কঠিন পদার্থ এত সূক্ষ্ম কণায় বিভাজিত হয় যা চোখে কিংবা শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেও দেখা যায় না। এখন দেখা যাক, পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিনটি অবস্থার মধ্যে কত রকম সমসত্ত্ব মিশ্রণ সম্ভব।

কঠিন + কঠিন—যেমন, তামা আর দস্তা গালিয়ে পিতল হয়। তেমনি বিশুদ্ধ লোহার সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণ কয়লা গালিয়ে হয় স্টীল।

তরল + তরল—জলে অ্যালকোহল দিলে একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ পাওয়া যায়। এছাড়া গোয়ালার দুধ যতই জল দিয়ে পাতলা করা হোক তা তরলই থেকে যায়।

গ্যাস + গ্যাস—বায়ুর কথা তোমরা সবাই জানো। বায়ু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সমসত্ত্ব মিশ্রণ।

তরল+গ্যাস—এর খুব সাধারণ একটি উদাহরণ হল সোডাওয়াটার। সোডাওয়াটারে কার্বন ডাইঅক্সাইড অতিরিক্ত চাপে মিশে থাকে।

কঠিন+গ্যাস—প্যালেডিয়াম একটি কঠিন ধাতু এবং তার আয়তনের অনেক গুণ হাইড্রোজেন গ্যাস তাতে মিশে থাকতে পারে।

তরল+কঠিন—যেমন লবণ, চিনি, কিংবা তুঁতে জলে দিলে।

কেবল দুটো পদার্থ কেন, দুটোর বেশী পদার্থ মিশেও সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী হতে পারে। যেমন সীসা, অ্যান্টিমনি ও টিন থেকে তৈরী হয় টাইপ মেট্যাল (type metal) যা ছাপার হরফ তৈরীতে লাগে। রক্ত তরল পদার্থ (যেমন, জল), কঠিন (যেমন, গ্লুকোজ) এবং গ্যাসীয়ের (যেমন, অক্সিজেন) একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ ; অবশ্য রক্তে অন্যান্য পদার্থ যেমন, শ্বেত ও লোহিত কণিকা ভেসে থাকে।

দুই বা ততোধিক পদার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে যে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী হয় তাকে **দ্রবণ** (solution) বলে। লবণ জলে দ্রবীভূত হয়। যে দ্রবীভূত হয় তাকে **দ্রাব** (solute) বলে। আর যার মধ্যে দ্রাব দ্রবীভূত হয়ে থাকে তাকে **দ্রাবক** (solvent) বলে। দ্রাবক কঠিন, তরল, কিংবা গ্যাস যাই হোক না কেন দ্রবণে ঐ ভৌত অবস্থাগুলি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, লবণের জলীয় দ্রবণে জল যে তরল পদার্থ তা তরলই থেকে যায়। দ্রাব, দ্রাবক এবং দ্রবণের সম্পর্কটিকে নীচে দেখানো গেল :

দ্রাব + দ্রাবক = দ্রবণ

কঠিন এবং তরলের দ্রবণ থেকে উপাদানগুলিকে সাধারণ ভৌত প্রণালীর সাহায্যে পৃথক করা যায়। যেমন, লবণের জলীয় দ্রবণ থেকে বাষ্পীভবনের সাহায্যে লবণ এবং জলকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায়। অপরপক্ষে, জিঙ্ক ধাতু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে দিলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু উৎপন্ন পদার্থটিকে জিঙ্ক-এর দ্রবণ বলা চলে না ; কারণ জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস ও জিঙ্ক সালফেট নামে জিঙ্কের একটি যৌগ উৎপন্ন হয়।

বালি, গন্ধক ইত্যাদির চূর্ণ জলে দিয়ে নেড়ে দিলে কিছুক্ষণ পর পাত্রের নীচে জমা হয়। কারণ, এগুলি জলে **অদ্রবণীয়** (insoluble) এবং জলের চেয়ে এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, তাই এরা জলের নীচে অদ্রবণীয় অবস্থায় জমা হয়। কিন্তু এমন অনেক পদার্থ আছে, যেমন মোম, পেট্রল, ইথার ইত্যাদি যা জলে অদ্রবণীয় এবং জলের চেয়ে হালকা বলে উপরে ভাসতে থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় দ্রাবকের যে উষ্ণতা প্রথমে থাকে তা দ্রাব দ্রবীভূত হওয়ার সঙ্গে কমে যায়। যেমন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড জলে গুলে নিলে জলের উষ্ণতা কমে যায়। এসব ক্ষেত্রে দ্রাব দ্রাবক থেকে তাপ শোষণ করে দ্রবীভূত হয়, ফলে দ্রবণের উষ্ণতা দ্রাবক থেকে কম হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দ্রবণের উষ্ণতা বাড়তেও দেখা যায়। যেমন, একটি পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে খুব সাবধানে পাত্রের গা বেয়ে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে মেশালে (কখনও সালফিউরিক অ্যাসিডে জল দেওয়া উচিত নয়) দ্রবণটির উষ্ণতা অনেক বেড়ে যায়।

2. দ্রাবক কি করে ?

দ্রবণে দ্রাবক যে একটা আছে তা আমরা প্রায় ভুলেই যাই, যেহেতু দ্রবণ নিয়েই আমাদের কারবার বেশী। কেবল তাই নয়, প্রায় সময়ই দ্রাবকটিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলে ধরা হয়। কিন্তু দ্রবণ তৈরীতে দ্রাব এবং দ্রাবকের অণু, পরমাণু কিংবা আয়নগুলির মধ্যে আকর্ষণ অপরিহার্য। যদি দ্রাবটি স্ফটিক হয় তবে স্ফটিকের অণু, পরমাণু কিংবা আয়নগুলি যে দৃঢ় আকর্ষণ-বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাকে ভেঙে দেবার মতো আরো জোরালো আকর্ষণ-বল দ্রাবক ও দ্রাবের অণু, পরমাণু কিংবা আয়নগুলির মধ্যে থাকা চাই ; তবেই দ্রাব দ্রাবকে দ্রবীভূত হতে পারে। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু টলুয়িন নামক দ্রাবকে নয়। আবার, সালফার জলে দ্রবীভূত হয় না, অথচ কার্বন ডাই-সালফাইড দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই যে অমুক দ্রাব অমুক দ্রাবক ছাড়া আর কোনটিতে দ্রবীভূত হবে না। গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলির মধ্যে দূরত্ব এত বেশী যে এক গ্যাসের অণুগুলি সহজেই অন্য গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে

প্রবেশ করে একটি সমসত্ত্ব দ্রবণ তৈরি করতে পারে। দ্রাবকের উপর নির্ভর করে দ্রাবটি দ্রবণে কি অবস্থায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস জলে অধিকাংশই হাইড্রোজেন এবং ক্লোরাইড আয়ন হিসাবে থাকে, টলুয়িনে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু হিসাবে থাকে। তাই দ্রাব এবং দ্রাবক উভয়ের উপর দ্রবণটির প্রকৃতি নির্ভর করছে।

3. দ্রাবকের উপর দ্রাবের প্রভাব

দ্রবণে দ্রাবকের অনেক ধর্মই বদলে যায়। অনেক সময় দ্রাবকে কিছুটা দ্রাব দিয়ে দ্রবণ তৈরি করলে দ্রাবকের আয়তন সঙ্কুচিত হয়। যেমন, 58·5 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের আয়তন 27·5 ml। ঐ আয়তনের সোডিয়াম ক্লোরাইড 10,000 ml জলে দিলে আয়তন আপাতদৃষ্টিতে 10,027·5 ml হওয়া উচিত, কিন্তু দ্রবণের আয়তন কমে 10,016·5 ml হতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় দ্রবণের আয়তন বাড়তেও দেখা যায়। যেমন, 214 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের আয়তন 142·5 ml। 843·5 ml জলে গুললে আপাতদৃষ্টিতে আয়তন হওয়া উচিত 986 ml, কিন্তু দ্রবণের আয়তন বেড়ে হয় 1000 ml। অবশ্য অনেক সময় দ্রাবক এবং দ্রবণের আয়তন একই থাকে। অনেক সময় বিশুদ্ধ দ্রাবকের তড়িৎপরিবাহিতাও দ্রাবের উপস্থিতিতে অনেক বদলে যায়। যেমন, বিশুদ্ধ জল তড়িৎ কু-পরিবাহী। কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত হলে তড়িৎ সু-পরিবাহী, অথচ চিনি দ্রবীভূত হলে দ্রবণটি তড়িৎ কু-পরিবাহী।

অনেক সময় দ্রবণের হিমাঙ্ক (freezing point) দ্রাবক থেকে অনেক কম হয়। তাই শীতের দেশে বরফ জমলে অনেক সময় লবণ ছিটিয়ে তাকে গলানো হয়। লবণের জলীয় দ্রবণের হিমাঙ্ক জলের হিমাঙ্ক থেকে কম হওয়ায় তা ঐ উষ্ণতায় জমে বরফ হতে পারে না।

দ্রাব দ্রাবকে দ্রবীভূত হলে দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক অনেক সময় বেড়ে যায়। যেমন, 34·2 গ্রাম চিনি অথবা 9·2 গ্রাম গ্লিসারিন 100 ml জলে দ্রবীভূত থাকলে, দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক 100°C থেকে বেড়ে 100·52°C হয়।

4. অসম্পৃক্ত (Unsaturated), সম্পৃক্ত (Saturated) এবং অতিপৃক্ত (Supersaturated) দ্রবণ

একটি পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে, উষ্ণতা এক রেখে, যদি লবণ দিতে থাকা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি কাঁচদণ্ড দিয়ে ভালভাবে নাড়া যায় তবে

দেখা যাবে প্রথমদিকে লবণ খুব সহজে জলে গুলে গেলেও এমন এক সময় আসবে যখন আর অতিরিক্ত লবণ জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু দ্রবণের নীচে অদ্রাব্য অবস্থায় পড়ে থাকে। দেখা গেছে 15°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 35·5 গ্রাম-এর বেশী লবণ দ্রবীভূত হয় না। এ রকম দ্রবণকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** (saturated solution) বলে। সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হয়ে যে দ্রবণ তৈরী হয় তাতে ঐ উষ্ণতায় আরো দ্রাব যোগ করলে যদি তা অদ্রাব্য অবস্থায় পড়ে থাকে, তবে দ্রবণটিকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** (saturated solution) বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সম্পৃক্ত দ্রবণে অতিরিক্ত দ্রাব দিলে তার পরিমাণ বাড়েও না কমেও না। অর্থাৎ, সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের দ্রবীভূত হওয়ার প্রবণতা এবং দ্রবণ থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতার মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে।

অপরপক্ষে, কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, যদি নির্দিষ্ট ওজনের দ্রাবকে যে পরিমাণ দ্রাব থাকলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয় তার চেয়ে কম পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকে, তবে দ্রবণটিকে **অসম্পৃক্ত** (unsaturated) দ্রবণ বলে। অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাব কম থাকায়, দ্রাব দ্রবণ থেকে বেরিয়ে তো আসেই না, বরং যতক্ষণ না দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয়, ততক্ষণ আরো দ্রাব গ্রহণ করতে পারে। অসম্পৃক্ত দ্রবণ দু'রকম হতে পারে : **লঘু** (dilute) অথবা **গাঢ়** (concentrated)। লঘু দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু গাঢ় দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ বেশী থাকে।

একই উষ্ণতায় ও একই পরিমাণ দ্রাবকে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গ্রাম হিসেবে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব 100 গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত থাকতে পারে সেই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় দ্রাবের ঐ পরিমাণকে ঐ দ্রাবের **দ্রাব্যতা** (solubility) বলা হয়। উষ্ণতা বাড়ালে অবশ্য দ্রাব্যতা বেড়ে যায়। তখন ঐ উষ্ণতায় দ্রবণটিকে আর সম্পৃক্ত বলা যাবে না। উষ্ণতা কমালে কিন্তু দ্রাব্যতা কমে যায়, ফলে সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে স্ফটিক সহজে কেলাস রূপে বেরিয়ে আসে। যেমন, 15°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 35·5 গ্রাম-এর বেশী সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা 0·00015 গ্রাম-এর বেশী সিলভার ক্লোরাইড দ্রবীভূত থাকতে পারে না।

কোন কোন সময়, বেশী উষ্ণতায় সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে, তা নিম্ন উষ্ণতায় নামিয়ে আনলেও দ্রাব বেরিয়ে আসে না, অর্থাৎ নিম্ন উষ্ণতায়

যতটা পরিমাণ দ্রাব সম্পৃক্ত দ্রবণে থাকার কথা তার চেয়ে বেশী থাকে, তবে দ্রবণটিকে **অতিপৃক্ত** (supersaturated) দ্রবণ বলে। অতিপৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ বেশী থাকায় দ্রবণ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। যদি অতিপৃক্ত দ্রবণে, সামান্য পরিমাণ দ্রাবও দেওয়া যায়, তবে ঐ দ্রাবকে অবলম্বন করে দ্রবণে অতিরিক্ত যা দ্রাব থাকে, তা স্ফটিকাকারে বেরিয়ে আসে। সোডিয়াম থায়োসালফেট ("হাইপো") দিয়ে সহজেই অতিপৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে তার ধর্মগুলি দেখানো যায়।

5. **দ্রাব্যতার সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক** (Solubility and its relation with temperture)

কোন দ্রাবকে কোন দ্রাবের দ্রাব্যতা উষ্ণতার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত কম উষ্ণতায় কোন দ্রাবক যতটা পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত করতে পারে বেশী উষ্ণতায় আরও বেশী দ্রবীভূত করতে পারে। যেমন পটাসিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি। এগুলির দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে বেশ বাড়লেও, সোডিয়াম ক্লোরাইডের বেলা তার দ্রাব্যতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না (Fig. 2.1)। কয়েকটি ক্ষেত্রে তরলে কঠিনের দ্রাব্যতা কমতে দেখা যায়। যেমন, কলিচুন এবং সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রথমে বেড়ে পরে কমতে থাকে।

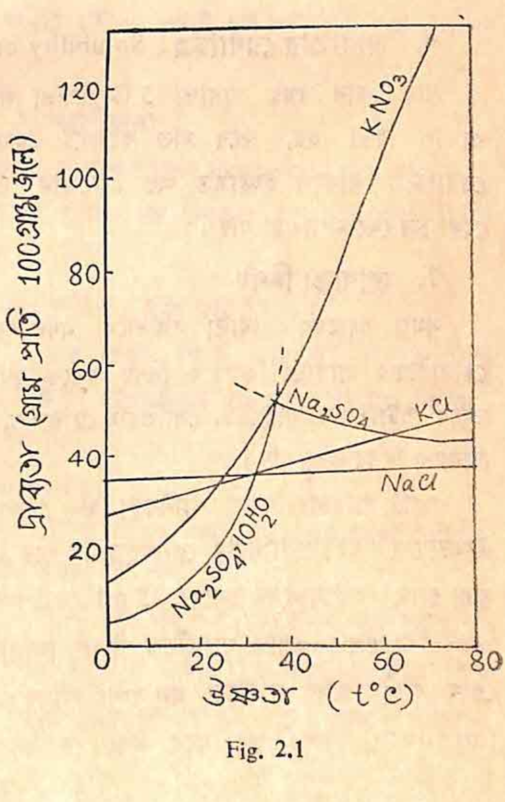


Fig. 2.1

দ্রাব	দ্রাব্যতা	
কলিচুন	0·175 গ্রাম (20°C-এ)	0·079 গ্রাম (100°C-এ)
সোডিয়াম সালফেট	55·000 গ্রাম (32·5°C-এ)	42·000 গ্রাম (100°C-এ)

তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে কমতে দেখা যায়। যেমন, সাধারণ বায়ুচাপে এবং 5°C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 0·2774 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত থাকতে পারে। কিন্তু ঐ চাপে 25°C উষ্ণতায় ও একই পরিমাণ জলে অর্ধেকেরও কম কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত থাকে। তরল পদার্থে গ্যাসের দ্রাব্যতা চাপের উপরেও নির্ভরশীল। চাপ বাড়ালে গ্যাস বেশী দ্রবীভূত হতে পারে। যেমন, সোডাওয়াটারে অধিক চাপে যথেষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে, কিন্তু চাপ কমালে তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা কমে যায়, ফলে ছিপি খুলে দিলে গ্যাস ক্রমেই বেরিয়ে আসে।

6. দ্রাব্যতার রেখাচিত্র (Solubility curve)

যদি কোন বস্তুর দ্রাব্যতা 5°C উষ্ণতা অন্তর অন্তর রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তবে মাত্র কয়েকটি উষ্ণতায় পদার্থটির দ্রাব্যতা মেপে রেখাচিত্রে আঁকলে ইচ্ছামত অন্য যে-কোন উষ্ণতায় ঐ পদার্থের দ্রাব্যতা রেখাচিত্র থেকে পাওয়া যায়।

7. দ্রাব্যতা নির্ণয়

সমস্ত পদার্থের দ্রাব্যতা একভাবে নির্ণয় করা যায় না। জলে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা দেওয়া গেল। একই-ভাবে পটাসিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদির দ্রাব্যতা নির্ণয় করা যায়।

একটি পরিষ্কার পাত্রে খানিকটা জল নেওয়া হল। এবার একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (t°C) পটাসিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে একটি **সম্পৃক্ত দ্রবণ** তৈরি করা হল। এই সম্পৃক্ত দ্রবণের 25 ml একটি খর্পরে নিয়ে দ্রবণসহ খর্পরটিকে ওজন করা হল। এবার খর্পরটিকে উত্তপ্ত জলগাহের (water bath) উপর রেখে বাষ্পীভবনের সাহায্যে জল সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা হল। পরে, বায়ুচুল্লীতে (air oven) সম্পূর্ণ শুষ্ক করে এবং শোষকাধারে (desiccator) বেশ

কিছুক্ষণ রাখার পর আবার খর্পরের ওজন নেওয়া হল। পরিষ্কার খর্পরের ওজন পরীক্ষা শুরু করার আগেই নিয়ে নেওয়া হয়।

ধরা যাক,

ঢাকনিসহ খর্পরের ওজন $= w$ g

ঢাকনিসহ খর্পর ও 25 ml দ্রবণের ওজন $= w_1$ g

ঢাকনিসহ খর্পর ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডের ওজন $= w_2$ g

25 ml দ্রবণে জলের ওজন $= (w_1 - w_2)$g

25 ml দ্রবণে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের ওজন $= (w_2 - w)$g

$\therefore$ $(w_1 - w_2)$g জলে $(w_2 - w)$g পটাসিয়াম ক্লোরাইড t°C-এ দ্রবীভূত হতে পারে।

$\therefore$ 100 g জলে $\dfrac{(w_2 - w)}{(w_1 - w_2)} \times 100$ g পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হতে পারে, অর্থাৎ t°C-এ এটাই হল পটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা।

অনুশীলনী

১। পদার্থের তিনটি অবস্থার মধ্যে কত রকম সমসত্ত্ব মিশ্রণ হতে পারে?

২। দ্রাবক, দ্রাব ও দ্রবণ বলতে কি বোঝ? দ্রাবকের উপর দ্রাবের প্রভাব কি?

৩। অসম্পৃক্ত, সম্পৃক্ত এবং অতিপৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে?

৪। দ্রাব্যতার সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক কি? দ্রাব্যতা কিভাবে নির্ণয় করবে? দ্রাব্যতার রেখাচিত্র কি? রেখাচিত্রের সাহায্যে দ্রাব্যতা কিভাবে নির্ণয় করবে?

৫। যদি ঠিক না হয় ঠিক কর :—

(ক) জিঙ্ক ধাতু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে দিলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। এটাকে জিঙ্কের দ্রবণ বলা হয়।

(খ) কোন উষ্ণতায় সম্পৃক্ত দ্রবণ লঘু এবং গাঢ় দুই-ই হতে পারে।

(গ) নিম্ন উষ্ণতায় যতটা পরিমাণ দ্রাব সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে বেরিয়ে আসার কথা তার চেয়ে কম বেরিয়ে এলে দ্রবণটিকে অতিপৃক্ত দ্রবণ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়

রসায়নের সংক্ষিপ্ত ভাষা

1. চিহ্ন (Symbol)

অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিক কোন এক জনবহুল সমাবেশে বক্তা যা যা বললেন তা হুবহু একটি ছোট্ট কাগজে লিখে ফেলেছেন। পত্রিকা অফিসে গিয়ে সমস্ত বক্তৃতাটা আবার লিখে ফেললেন পাতার পর পাতায়। এখানে সাংবাদিক বিশেষ সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে গোটা বক্তৃতা একটা ছোট্ট কাগজে লিখতে পারেন।

রাসায়নিক বিক্রিয়াও তেমনি বিশেষ সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লিখে রাখা যায় কম জায়গায়। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপাদান-গুলির এমন কতকগুলি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে যার সাহায্যে একটি পদার্থকে অন্য একটি থেকে আলাদা করা যায়, এমন কি বিক্রিয়ায় কি কি পদার্থ অংশগ্রহণ করে এবং কি কি পদার্থ তৈরী হয় তাও বলে দেওয়া যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত যে 105টি মৌলিক পদার্থ জানা আছে তাদের বিশেষ সাংকেতিক চিহ্নের (symbol) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

আজকাল রসায়ন বিদ্যায় মৌলিক পদার্থ প্রকাশের যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তার গোড়াপত্তন করেন সুইডিশ রসায়নবিদ্ বার্জেলিয়াস 1819 সনে। **মৌলিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নামই হল তার চিহ্ন (symbol)। চিহ্নের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে প্রকাশ করা হয়।** যেমন হাইড্রোজেন, H ; অক্সিজেন, O ; কার্বন, C ; নাইট্রোজেন, N ; ইত্যাদি। **একই আদ্যক্ষরবিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বোঝাবার জন্য আদ্যক্ষরের সঙ্গে সম্পূর্ণ নামের আরও একটি অক্ষর যোগ করা হয়।** যেমন কার্বন, C ; ক্লোরিন, Cl ; কোবাল্ট,

Co ; ইত্যাদি। অনেক সময় ল্যাটিন নাম থেকে মৌলিক পদার্থের চিহ্ন নেওয়া হয়। যেমন,

ইংরাজী নাম	ল্যাটিন নাম	চিহ্ন
Copper	Cuprum	Cu
Sodium	Natrium	Na
Gold	Aurum	Au
Silver	Argentum	Ag
Mercury	Hydrargyrum	Hg

2. সংকেত (Formula)

চিহ্নের সাহায্যে কোন মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হল সংকেত।

সংকেত থেকে জানা যায় একটি মৌলিক পদার্থের এক একটি অণু কয়টি পরমাণু দিয়ে তৈরী, অথবা কোন যৌগিক পদার্থের একটি অণুর বিভিন্ন পরমাণু কি কি সংখ্যায় আছে। যেমন, একটি অক্সিজেন অণুর সংকেত হল O_2, এবং দুটি O পরমাণু দিয়ে তৈরী। আবার জল একটি যৌগিক পদার্থ। এর এক অণুতে দুটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন (O) পরমাণু থাকে। তাই এক অণু জলের সংকেত হল H_2O।

কোন অণুর শুরুতে যদি 1, 2, 3 ইত্যাদি কোন সংখ্যা থাকে তবে তা থেকে অণুর সংখ্যা বোঝা যায়। যেমন, $3CO_2$ মানে হল তিনটি পৃথক কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু। প্রতি অণুতে আছে একটি কার্বন (C) এবং দুটি অক্সিজেন (O) পরমাণু। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল প্রভৃতির অণুগুলির সংকেত দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে তাদের পরমাণুগুলি স্বাধীনভাবে নেই, পরন্তু দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।

কোন পদার্থের এক অণুতে বিভিন্ন পরমাণু ওজনের কি কি অণুপাতে আছে তা তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব জানা থাকলে নির্ণয় করা যায়। কেবল তাই নয়, কোন পদার্থের এক অণুর সংকেত থেকে আণবিক গুরুত্বও (molecular weight) নির্ণয় করা যায়। যেমন, এক অণু জলে (H_2O) ওজনের 16 অংশ অক্সিজেন (O) এবং 2·016 অংশ

$(=2\times1{\cdot}008=H_2)$ হাইড্রোজেন আছে, ফলে জলের আণবিক গুরুত্ব হল 18·016।

3. রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equation)

কোন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি কি পদার্থ অংশগ্রহণ করে নূতন কি কি পদার্থ তৈরী হয় তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথা লিখতে হয়। কিন্তু এ ধরনের বিক্রিয়াকে দু-এক লাইনের মধ্যে কয়েকটি চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে এমনভাবে লেখা যায় যা থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি কি পদার্থ অংশ গ্রহণ করে এবং কি কি নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয় তা নিমেষের মধ্যে জানা সম্ভব হয়।

চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশের পদ্ধতিকে বলা হয় সমীকরণ (equation)।

বলা বাহুল্য, **যে-কোন সমীকরণে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির সংখ্যা বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে একই থাকে**। অর্থাৎ, **রাসায়নিক সমীকরণ "বস্তুর অবিনাশিতা" তত্ত্বকে মেনে চলে**। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নিউক্লিয়ন-বিক্রিয়ায় (nuclear reaction) পদার্থের ভর শক্তিরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, ফলে বিক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষে পদার্থগুলির পরিমাণ এক থাকে না। আবার অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে নিউক্লিয়ন-বিক্রিয়া ঘটিয়ে নূতন মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করা হয়। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ ধরনের কিছু ঘটা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে বিক্রিয়াটিকে প্রকাশ করা যায় না। নিউক্লিয়ন-বিক্রিয়া সম্পর্কে তোমরা পরে জানবে।

এখন সমীকরণ গঠনের নিয়মগুলি আলোচনা করা যাক।

(a) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সমস্ত পদার্থ অংশগ্রহণ করে এবং যে সমস্ত পদার্থ তৈরী হয় তাদের চিহ্ন ও সংকেত জানা প্রয়োজন। যেমন, জিঙ্ক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন এবং জিঙ্ক ক্লোরাইড তৈরী হওয়ার ঘটনায় ওদের চিহ্ন ও সংকেত, জিঙ্ক (Zn), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), হাইড্রোজেন (H_2) এবং জিঙ্ক সালফেট ($ZnSO_4$) জানা প্রয়োজন। সমীকরণে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলিকে বাঁ দিকে, এবং বিক্রিয়া থেকে

উৎপন্ন পদার্থগুলিকে ডান দিকে লিখতে হয়। বিক্রিয়াটিকে প্রথমে লেখা যায় : $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

(b) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বস্তুগুলিকে তাদের পারমাণবিক চিহ্ন এবং অণুর সংকেতের সাহায্যে লিখে সমীকরণটি প্রকাশ করা হয়। যেমন, উপরের উদাহরণে জিঙ্ক, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেনকে সমীকরণে যথাক্রমে Zn, HCl, $ZnCl_2$ এবং H_2 রূপে লিখতে হয়। একটি হাইড্রোজেন অণু দুটি H পরমাণু দিয়ে তৈরী, তাই একটি হাইড্রোজেন অণুকে H_2 এই সংকেত দিয়ে লেখা হয়।

(c) সমীকরণ চিহ্নের (=) উভয় দিকে যে-কোন পরমাণুর সংখ্যা বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে একই হওয়া প্রয়োজন। এর ব্যতিক্রম হলে প্রয়োজনমত গুণ বা ভাগ করে উভয় দিকে পরমাণু সংখ্যা সমান করতে হবে।

উপরোক্ত বিক্রিয়ার বাঁ দিকে 1টি করে H ও Cl পরমাণু, কিন্তু ডান দিকে দুটি। সুতরাং, উভয়দিকে H ও Cl পরমাণুর সংখ্যা সমান রাখতে হলে সমীকরণটিকে লেখা যেতে পারে : $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$

সমীকরণে, '+' চিহ্নের অর্থ **'এবং'** আর '=' চিহ্নের অর্থ **'রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা'**। অনেক সময় সমীকরণে তীর চিহ্নের (→) দ্বারা বিক্রিয়া কোন্ দিকে অগ্রসর হয় সেটা বোঝানো হয়।

(d) কোন দ্রবণে রাসায়নিক বিক্রিয়া হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমীকরণে দ্রাবকের উল্লেখ থাকে না। যে-সব দ্রবণে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রাবক অংশ-গ্রহণ করে একমাত্র সে-সব ক্ষেত্রে সমীকরণে দ্রাবকের উল্লেখ থাকে।

(e) রাসায়নিক বিক্রিয়া অনেক সময় অনুঘটক ছাড়া হয় না, কিন্তু সমীকরণে অনুঘটকের উল্লেখ থাকে না।

এবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে সমীকরণ গঠনের প্রণালী দেখানো যাক।

উদাহরণ 1 : ম্যাগনেসিয়াম (Mg) বায়ুতে দহনের ফলে ম্যাগনে-সিয়াম অক্সাইড (MgO) তৈরী হয়। সুতরাং বিক্রিয়াটিকে সাধারণভাবে দেখানো যায় : $Mg + O_2 \rightarrow MgO$

সমীকরণের বাঁ দিকে অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা দুই এবং ডান দিকে এক।

সুতরাং, উভয়দিকে 'O' পরমাণুর সংখ্যা সমান রাখতে হলে MgOকে 2 দিয়ে গুণ করা দরকার। অর্থাৎ, $Mg+O_2 \rightarrow 2MgO$

কিন্তু এবার ডান দিকের Mg পরমাণুর সংখ্যা বাঁ দিকের Mg পরমাণু সংখ্যার দ্বিগুণ হল। তাই বাঁ দিকের Mg-এর সংখ্যা দ্বিগুণ করা দরকার। এবার সমীকরণটি দাঁড়ায়: $2\,Mg+O_2=2\,MgO$

উদাহরণ 2: সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং অক্সিজেনের (O) বিক্রিয়া থেকে সালফার ট্রাই-অক্সাইড (SO_3) পাওয়া যায় তপ্ত প্ল্যাটিনাম অনুঘটকের উপস্থিতিতে। বিক্রিয়াটিকে লেখা যায়: $SO_2+O_2 \rightarrow SO_3$

উভয় দিকে পরমাণুগুলির সংখ্যা সমান করলে, সমীকরণটি দাঁড়ায়—

$$2\,SO_2+O_2=2SO_3$$

সমীকরণে প্ল্যাটিনামের (Pt) উল্লেখ নেই, কারণ অনুঘটকের রাসায়নিক কোন পরিবর্তন হয় না, বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে একই থাকে।

4. সমীকরণ থেকে যা জানা যায়

সমীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য যা আলোচনা করা হয়েছে তা হল, সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলি এবং তা থেকে যে-সব পদার্থ তৈরী হয় সেগুলি জানা যায়। এমনকি, কি কি অনুপাতে বিক্রিয়কগুলি বিক্রিয়া করে, অন্য পদার্থ তৈরি করে, তাও জানা যায়। যেমন, সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) এবং পটাসিয়াম ব্রোমাইডের (KBr) বিক্রিয়ায় উপাদানগুলি ওজনের কি কি অনুপাতে বিক্রিয়া করে সিলভার ব্রোমাইড (AgBr) এবং পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) তৈরি করে তা তাদের আণবিক গুরুত্ব থেকে জানা যায়।

সিলভার নাইট্রেট + পটাসিয়াম ব্রোমাইড → পটাসিয়াম নাইট্রেট + সিলভার ব্রোমাইড

$$AgNO_3 + KBr = KNO_3 + AgBr$$

আণবিক গুরুত্ব

Ag 108	K 39	K 39	Ag 108
N 14	Br 80	N 14	Br 80
3×O 48		3×O 48	
170	119	101	188

5. সমীকরণ থেকে যা জানা যায় না

(a) কতকগুলি বিক্রিয়া কম উষ্ণতায় আর অন্য কতকগুলি বেশী উষ্ণতায় হয়। অনেক ক্ষেত্রে কম উষ্ণতায় যে-সব বিক্রিয়াগুলি হয় সে-সব ক্ষেত্রে তাপ উদ্গীরণ হয়। অপরপক্ষে, বিক্রিয়া বেশী উষ্ণতায় হলে তাপ শোষণ হয়। যদিও এসব বিক্রিয়ার উপর তাপের প্রভাব যথেষ্ট, কিন্তু রাসায়নিক সমীকরণ হতে কত উষ্ণতায় বিক্রিয়াটি হয়ে থাকে তা জানা যায় না।

(b) সমীকরণে পদার্থের ভৌত অবস্থা, যেমন কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, রং—এগুলির উল্লেখ থাকে না।

(c) যে-সব দ্রবণে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলাকালীন দ্রাবক অংশগ্রহণ করে না সে-সব ক্ষেত্রে সমীকরণে দ্রাবকের উল্লেখ থাকে না।

(d) কোন বিক্রিয়া পুরোপুরি হতে কত সময় লাগে, অর্থাৎ বিক্রিয়াটি ধীরে ধীরে না দ্রুত নিষ্পন্ন হয়, সমীকরণে তার কোন উল্লেখ থাকে না। সমীকরণে অনুঘটকেরও উল্লেখ থাকে না।

6. বিপরীতমুখী বিক্রিয়া (Reversible reaction)

ধরা যাক, একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার দুটি পদার্থ A এবং B বিক্রিয়া করে যে গতিতে অন্য দুটি পদার্থ C এবং D তৈরি করে ঠিক সেই গতিতে C এবং D বিক্রিয়া করে আবার A এবং B তৈরি করে; এক্ষেত্রে, বিক্রিয়াটিকে **বিপরীতমুখী** বলা যাবে, এবং রাসায়নিক সমীকরণ লিখবার সময় সমীকরণ চিহ্নটি দুটি বিপরীতমুখী তীরচিহ্ন ($\rightleftharpoons$) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ,

$$A + B \rightleftharpoons CD$$

অতিরিক্ত তাপ ও চাপে নাইট্রোজেন (N) এবং হাইড্রোজেন (H) থেকে অ্যামোনিয়া (NH_3) তৈরী হওয়া একটি বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার উদাহরণ:

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

প্রশ্নাবলী

১। চিহ্ন, সঙ্কেত এবং সমীকরণ বলতে কি বোঝ?

২। রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য কি?

৩। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থা সম্পর্কে কতটুকু জানা যায়?

৪। বিপরীতমুখী বিক্রিয়া উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দাও।

৫। নিম্নলিখিত যৌগগুলির আণবিক সঙ্কেত লেখ :—

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কিউপ্রিক অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কপার সালফেট, ফেরাস সালফেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, জল।

৬। নিয়ম প্রয়োগ করে বিক্রিয়াগুলিকে যথাযথ সমীকরণের আকারে প্রকাশ কর :—

ম্যাগনেসিয়াম + অক্সিজেন → ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

হাইড্রোজেন সালফাইড + অক্সিজেন → জল + সালফার ডাইঅক্সাইড

কিউপ্রিক অক্সাইড + অ্যামোনিয়া → কপার + জল + নাইট্রোজেন

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট → নাইট্রাস অক্সাইড + জল

আয়রন + কপার সালফেট → কপার + ফেরাস সালফেট

অ্যামোনিয়া + হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড → অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

হাইড্রোজেন + অক্সিজেন → জল

৭। উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিক্রিয়া কিভাবে সংগঠিত হয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

তড়িৎ-বিশ্লেষণ

1. তড়িৎ-বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ এবং তড়িৎ-বিশ্লেষণ

তড়িৎ-পরিবাহিতার উপর নির্ভর করে সমস্ত পদার্থকে **দু'ভাগে** ভাগ করা যায়। দেখা যাবে, **ধাতু**, যেমন সিলভার, কপার, অ্যালুমিনিয়াম, মার্কারি ইত্যাদি; **ক্ষার**, যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি; **অ্যাসিড**, যেমন লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড, লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি এবং বিভিন্ন **লবণ**, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদির জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে সহজেই তড়িৎ-পরিবহন হতে পারে, তাই এদের **তড়িৎ-পরিবাহী** (electrical conductor) বলা হয়।

আবার দেখা যাবে, অনার্দ্র বায়ু, কাচ, কাগজ, মোম, মাইকা (অভ্র), কাঠ, এবোনাইট্ (ebonite), রাবার, বেকেলাইট্ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তড়িৎ-পরিবহন এত সামান্যই হয় যে সাধারণ তড়িৎ-পরিবহন মাপক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায় না। এসব পদার্থকে তাই **তড়িৎ-অপরিবাহী** (electrical non-conductor) বলা হয়।

তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থগুলি আবার **দু'রকমের** হয়।

(a) আয়রন, কপার, প্ল্যাটিনাম, সিলভার, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির ভেতর দিয়ে তড়িৎ-পরিবহন হলে ঐগুলির ভৌত পরিবর্তন (যেমন, উত্তপ্ত হওয়া এবং তার ফলে আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি) হয়, কিন্তু রাসায়নিক কোন পরিবর্তন হয় না, কারণ তড়িৎ পাঠানো বন্ধ করে দিলে পদার্থগুলি আবার আগের অবস্থায় সহজেই ফিরে আসে। ধাতুগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

(b) অপরপক্ষে, কতকগুলি তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ

চলনা করলে পদার্থগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। যেমন, লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড, গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ ইত্যাদি। এগুলিকে **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য** (electrolyte) পদার্থ বলে। বিভিন্ন অ্যাসিড, ক্ষার এবং লবণের জলীয় দ্রবণগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

বৈজ্ঞানিক আরহেনিয়াসের (Arrhenius) তড়িৎ-বিয়োজনবাদ অনুযায়ী, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থগুলি জলে কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত দ্রাবকে দিলে **হাঁ-ধর্মী, ধনাত্মক** বা **পরা** (positive, +) তড়িৎযুক্ত কণা এবং **না-ধর্মী, ঋণাত্মক** বা **অপরা** (negative, −) তড়িৎযুক্ত কণায় স্বতঃবিশ্লিষ্ট হয়। এই হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণাগুলিকে **আয়ন** বলে। আয়ন তড়িৎযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টি (মূলক) হতে পারে। হাঁ-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণার নাম **ক্যাটায়ন** (cation), এবং না-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণার নাম **অ্যানায়ন** (anion)। এভাবে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের জলে বা অন্য কোন উপযুক্ত দ্রাবকে হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণায় **বিয়োজিত** (dissociate) হওয়াকে **আয়নিত** হওয়া বা **আয়নীভবন** (ionisation) বলা হয়।

2. **বিয়োজন** (Dissociation)—বিয়োজনে পদার্থের অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যেমন আয়ন তৈরী হয় আবার উৎপন্ন আয়নগুলি পুনর্মিলিত হয়ে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিয়োজন বিক্রিয়াটি বিপরীতমুখী। যেমন,

$$KCl \rightleftharpoons K^+ + Cl^-$$

পটাসিয়াম ক্লোরাইড — পটাসিয়াম আয়ন — ক্লোরাইড আয়ন

তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থগুলি দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী আয়নে পরিণত হলেও দ্রবণটি **তড়িৎ-নিরপেক্ষ** (electrically neutral) হয়, কারণ বিয়োজনের ফলে বিপরীতধর্মী তড়িৎযুক্ত কণার পরিমাণ সমান থাকে। সোডিয়াম নাইট্রেট এবং পটাসিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণে এদের বিয়োজন দেখানো গেল :

$$NaNO_3 \rightleftharpoons Na^+ + NO_3^-$$

সোডিয়াম নাইট্রেট — সোডিয়াম আয়ন — নাইট্রেট আয়ন

$$K_2SO_4 \rightleftharpoons 2K^+ + SO_4^{-}$$

পটাসিয়াম সালফেট — পটাসিয়াম আয়ন — সালফেট আয়ন

দেখা যাচ্ছে, উভয়ক্ষেত্রেই হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী তড়িৎ-এর পরিমাণ সমান থাকায় দ্রবণটি **তড়িৎ-নিরপেক্ষ**। এখানে বলা প্রয়োজন যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুগুলির ধর্ম তাদের আয়নগুলি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন, সোডিয়াম এবং ক্লোরিন উভয়েই খুব সক্রিয় মৌলিক পদার্থ। জলের সঙ্গে সোডিয়াম তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। আবার ক্লোরিন গ্যাসের প্রচণ্ড বিরঞ্জন ক্ষমতা থাকায় বহু রঙীন পদার্থকে সাদা করে দেয়। অপরপক্ষে, সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ-নিরপেক্ষ এবং জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন করলেও উপরোক্ত বিক্রিয়াগুলি দ্রবণে কখনই ঘটে না।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), পটাসিয়াম সালফেট (K_2SO_4), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$) ইত্যাদি পদার্থ জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে হাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণা উৎপন্ন করে। এ ধরনের পদার্থকে **তীব্র বা তেজী তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ** (strong electrolytes) বলে। যেমন,

$$HNO_3 \rightleftharpoons H^+ + NO_3^-$$

নাইট্রিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন আয়ন — নাইট্রেট আয়ন

$$NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$$

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড — সোডিয়াম আয়ন — হাইড্রক্সিল আয়ন

আবার, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (HCN), অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH), মারকিউরিক ক্লোরাইড ($HgCl_2$) প্রভৃতি জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে স্বল্পসংখ্যক আয়ন উৎপন্ন করে। এ ধরনের পদার্থকে **মৃদু তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ** (weak electrolytes) বলে। যেমন,

$$HCN \rightleftharpoons H^+ + CN^-$$

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন আয়ন — সায়ানাইড আয়ন

$$NH_4OH \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড — অ্যামোনিয়াম আয়ন — হাইড্রক্সিল আয়ন

বিশুদ্ধ জল তড়িৎ কু-পরিবাহী, কিন্তু জলে তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ যদি সামান্য পরিমাণেও থাকে, তবে জলের তড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতা অনেক

বেড়ে যায়। কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের ভেতর দিয়ে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ চালনা করলে যদি তার অণুগুলি বিশ্লিষ্ট বা বিয়োজিত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে পদ্ধতিটিকে বলা হয় **তড়িৎ-বিশ্লেষণ** (electrolysis)।

3. **বিযোজন** (Decomposition)—বিযোজনে পদার্থের অণুগুলি ভেঙে নূতন পদার্থ তৈরী হয় এবং উৎপন্ন পদার্থগুলি সহজে পুনর্মিলিত হয়ে আদি পদার্থে পরিণত হতে পারে না। সাধারণত, পদার্থের একমুখী বিক্রিয়াকে বিযোজন বলা হয়। যেমন,

$2KClO_3$ (পটাসিয়াম ক্লোরেট) $= 2KCl$ (পটাসিয়াম ক্লোরাইড)
$+ 3O_2$ (অক্সিজেন)

তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থটিকে গলিত অবস্থায় অথবা জলীয় দ্রবণরূপে একটি তড়িৎ-অপরিবাহী পাত্রে নেওয়া হয়। ঐ পাত্রে উপযুক্ত দুটি ধাতব পাত (অথবা কার্বন দণ্ড) খানিকটা ডোবানো থাকে। ঐ পাত দুটিকে বলা হয় **তড়িৎদ্বার** (electrode)। যে তড়িৎদ্বারটি ব্যাটারির পজিটিভ বা ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে **অ্যানোড** বা **পরা প্রান্ত** (anode), এবং ব্যাটারির নেগেটিভ বা ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যে তড়িৎদ্বারটি যুক্ত থাকে তাকে **ক্যাথোড** বা **অপরা প্রান্ত** (cathode) বলা হয়। তড়িৎদ্বার দুটিকে দ্রবণে খানিকটা ডুবিয়ে তারের সাহায্যে অ্যানোডটিকে ব্যাটারির পজিটিভ মেরুর সঙ্গে এবং ক্যাথোডটিকে নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত করলে দ্রবণের ভিতর তড়িৎ-পরিবহন চলতে থাকে (চিত্র 4.1)। ফলে দ্রবণে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের অণুগুলি বিযোজিত বা বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই বিযোজন সম্পূর্ণ দ্রবণ জুড়ে হয় না, কেবলমাত্র তড়িৎদ্বারে হয়ে থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় হাঁ-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণা বা ক্যাটায়নগুলি বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী দ্বার অর্থাৎ ক্যাথোডের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং ঐ দ্বারের দিকে চালিত হয়। আর না-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণা বা অ্যানায়ন অ্যানোডের দিকে চালিত হয়। [এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের চারদিকে **ইলেকট্রন** বা **না-ধর্মী** তড়িৎকণা সর্বদা ঘুরছে। পরমাণু তড়িৎ-নিরপেক্ষ, তাই পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে

ইলেকট্রনের সমসংখ্যক হাঁ-ধর্মী কণা আছে; এদের **প্রোটন** বলা হয়। প্রোটনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান এবং হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ-মাত্রা এক। ইলেকট্রনের **ঘাটতি হলে** পরমাণু ক্যাটায়ন বা হাঁ-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণায়, আর ইলেকট্রনের **বাড়তি হলে** পরমাণু অ্যানায়ন বা না-ধর্মী তড়িৎযুক্ত কণায় পরিণত হয়। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটন ছাড়া তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রনও আছে। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।]

এখন ক্যাটায়নগুলিতে ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকায় ঐগুলি ক্যাথোড দ্বার থেকে ইলেকট্রন নিয়ে তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, অ্যানায়নগুলিতে ইলেকট্রন বাড়তি থাকায় ঐগুলি অ্যানোডের দিকে চালিত হয়, এবং সেখানে পৌছলে বাড়তি ইলেকট্রন অ্যানোড দ্বার দিয়ে তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হয়। এইভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ বিযোজিত হয়ে দুই তড়িৎদ্বারে নূতন রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপাদন করে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে বোঝাবার জন্য উদাহরণ হিসেবে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিযোজন দেখানো গেল। গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ-পরিবাহী এবং ওতে হাঁ-ধর্মী সোডিয়াম আয়ন (Na^+) এবং না-ধর্মী ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) থাকে। তড়িৎ চালনা করলে, সোডিয়াম আয়নগুলি (Na^+) নেগেটিভ তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোডের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে পৌছে এবং ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন নিয়ে তড়িৎ-নিরপেক্ষ সোডিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, না-ধর্মী ক্লোরাইড আয়ন পজিটিভ তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং সেখানে পৌছলে অ্যানোড ইলেকট্রন দিয়ে তড়িৎ নিরপেক্ষ ক্লোরিন পরমাণুতে পরিণত হয়। দুটি ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি ক্লোরিন অণু তৈরী হয় এবং গ্যাসরূপে নির্গত হয়।

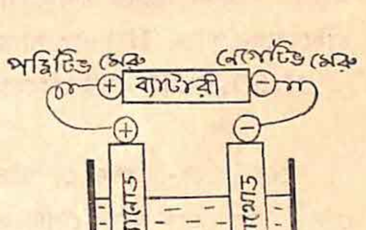


Fig 4·1

$$NaCl \rightleftharpoons Na^+ + Cl^-$$

ক্যাথোডে : $Na^+ + e = Na$ অ্যানোডে : $Cl^- - e = Cl$

$$Cl + Cl = Cl_2$$

সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণে তড়িৎ চালনা করলে দ্রবণটি বিযোজিত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$), হাইড্রোজেন (H_2), অক্সিজেন (O_2) এবং ক্লোরিন (Cl_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। তোমরা চেষ্টা করে সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি লেখ।

4. জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ

বিশুদ্ধ জল ভাল তড়িৎবাহী নয়। এর কারণ হল বিশুদ্ধ জল খুব সামান্যই বিয়োজিত হয়ে হাঁ-ধর্মী হাইড্রোজেন (H^+) এবং না-ধর্মী হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) তৈরী হয়।

H_2O (জল) $\rightleftharpoons H^+$ (হাইড্রোজেন আয়ন) + OH^- (হাইড্রক্সিল আয়ন)

স্বল্পপরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) বিশুদ্ধ জলে মেশালে জলের বিয়োজন অনেক বেড়ে যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড নিজেও জলে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং সালফেট আয়নে ($SO_4^=$) বিয়োজিত হয়।

$H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+$ (দুটি হাইড্রোজেন আয়ন) $+ SO_4^=$

(একটি সালফেট আয়ন)

জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ যে যন্ত্রে করা হয় তা চিত্রে (Fig. 4.2) দেখানো গেল। বিশুদ্ধ জলে কয়েক ফোঁটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড গুলে A নলে ঢালা হল। A নলটি B এবং C নলের সঙ্গে যুক্ত আছে। B এবং C নলের স্টপকক্ খুলে রাখা হল, যেন B এবং C নল সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়। এখন B এবং C নল বন্ধ করে প্ল্যাটিনাম পাতের তড়িৎদ্বার দুটি ব্যাটারির + ve এবং − ve তড়িৎ মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হল। দেখা যাবে বুদ্বুদ্সহকারে গ্যাস নির্গত হচ্ছে এবং জল সরিয়ে B এবং C নলে জমা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলে দেখা যাবে, B নলে গ্যাসের আয়তন C নলে গ্যাসের আয়তনের ঠিক দ্বিগুণ। কেবল তাই নয়, B নলে স্টপককটি একটু খুলে একটি জলন্ত শলাকা মুখে ধরলে নলের মুখে গ্যাসটি নিষ্প্রভ নীল শিখাসহ জলতে থাকবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শলাকাটি নিভে যাবে। এটি

হাইড্রোজেন গ্যাসের ধর্ম। এবার C নলের মুখটি অল্প খুলে মৃদুভাবে জ্বলছে এমন একটি শলাকা নলের মুখে ধরলে তা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে শুরু করবে। **এটি অক্সিজেনের ধর্ম।** এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হল, **জল তড়িৎ-বিশ্লেষিত হলে দুই আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস এবং এক আয়তন অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।**

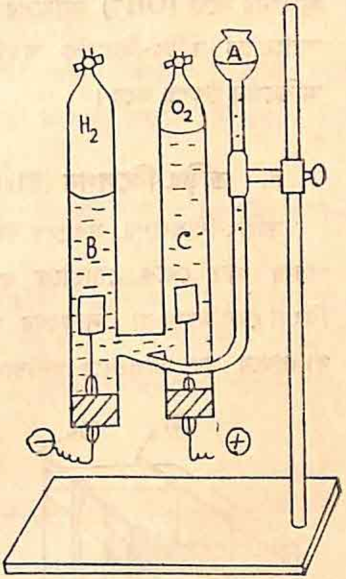


Fig 42 জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ

তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া ঃ

ক্যাথোডে, হাঁ-ধর্মী হাইড্রোজেন আয়ন (H+) চালিত হয় এবং সেখানে ইলেকট্রন (e) নিয়ে তড়িৎ-নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুতে (H) পরিণত হয়। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন অণু গ্যাসরূপে নির্গত হয়।

$$H^+ + e = H \,;\; H + H = H_2$$

অ্যানোডে, না-ধর্মী হাইড্রক্সিল (OH^-) এবং সালফেট ($SO_4^=$) আয়নগুনি চালিত হয় এবং সেখানে ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে তড়িৎ-নিরপেক্ষ হাইড্রক্সিল (OH) এবং সালফেট (SO_4) মূলকে পরিণত হয়। OH মূলকগুলি যুক্ত হয়ে জল এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে, আর সালফেট মূলক জলের:সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

$$OH^- - e = OH \,;\; 4OH = 2H_2O + O_2$$

$$SO_4^= - 2e = SO_4 \,;\; 2\,SO_4 + 2\,H_2O = 2\,H_2SO_4 + O_2$$

জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হলেও পরীক্ষা করে দেখা

গেছে সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ জলই তড়িৎ-বিশ্লেষিত হয়। এক মতে, (OH^-) এবং ($SO_4^{=}$) আয়নের মধ্যে (OH^-) আয়নের তড়িৎ ত্যাগের ক্ষমতা বেশী থাকায় সেটাই অ্যানোডে তড়িৎ-নিরপেক্ষ অস্থায়ী (OH) মূলকে পরিণত হয়, এবং জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

5. তড়িৎ-বিলেপন (Electroplating)

তড়িৎ-বিশ্লেষণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হল ধাতু প্রলেপন। মরিচা পড়ার হাত থেকে লোহাকে রক্ষা করার জন্য প্রায় সময়ই লোহার গায়ে জিঙ্ক কিংবা ক্রোমিয়াম বা নিকেলের আস্তরণ দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে লোহার গা প্রথমে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়। এর পর লোহার গায়ে যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় তার উপযুক্ত একটি যৌগের দ্রবণে লোহাকে ক্যাথোড হিসেবে রাখা হয়। যেমন, জিঙ্ক সালফেটের জলীয় দ্রবণে লোহা ক্যাথোড এবং জিঙ্কের পাত অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করলে লোহার গায়ে জিঙ্কের প্রলেপ পড়ে। তেমনি ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেবার জন্য ক্রোমিয়াম অ্যানোড ও ক্রোমিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। ধাতুর উপর ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়ার জন্য প্রথমে কপার ধাতুর একটি আস্তরণ ফেলা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্যাথোডে ঐ ধাতুর প্রলেপ পড়ে। সাইকেলের হাতল ও চাকা, দরজার হাতল, সেলাই কলের চাকা, মোটরকারের বাতি প্রভৃতি অনেক জিনিস আজকাল ক্রোমিয়াম আস্তরণ ফেলে মরিচার হাত থেকে রক্ষা করা হয়। সিলভারের আস্তরণ ফেলতে হলে একটি পাতলা রূপার পাত অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে-সব ধাতব বস্তুর উপরে রূপার আস্তরণ ফেলা হয় সেগুলিকে ক্যাথোড হিসেবে রাখা হয়, আর এক্ষেত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য দ্রবণটি হল সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলভার সায়ানাইড।

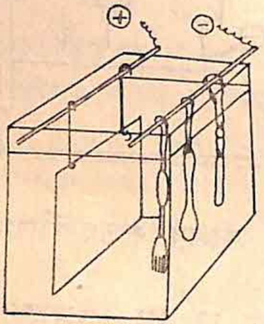


Fig. 4.3 তড়িৎ-বিলেপন

প্রশ্নাবলী

1. তড়িৎ-পরিবাহী, তড়িৎ-অপরিবাহী এবং তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দাও।

2. আয়ন কাকে বলে? ক'রকমের আয়ন আছে? কোন তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ জলে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হলেও দ্রবণটি নিরপেক্ষ কেন থাকে?

3. বিযোজন এবং বিয়োজনের মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দাও।

4. তীব্র এবং মৃদু তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ বলতে কি বোঝ? সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পাঠালে কি হয়?

5. জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ লেখ। তড়িৎ-বিলেপনের উদ্দেশ্য কি? কিভাবে তড়িৎ-বিলেপন করা হয়?

6. ঠিক না হলে শুদ্ধ কর :—

(a) বিশুদ্ধ জল তড়িৎ-সুপরিবাহী।

(b) পারদ, প্ল্যাটিনাম ও গলিত খাদ্যলবণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ।

(c) সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে তড়িৎ চালনা করলে কেবলমাত্র Na^+ এবং Cl^- আয়ন উৎপন্ন হয়।

(d) $KCl \rightleftharpoons K^+ + Cl^-$, একটি বিযোজনের উদাহরণ।

পঞ্চম অধ্যায়

অম্ল, ক্ষারক ও লবণ

1. অ্যাসিড নামটি ল্যাটিন শব্দ acidus থেকে এসেছে, অর্থ হল অম্ল। অতীতে অক্সিজেনের ধর্ম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা গেল সালফার, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি কতকগুলি অধাতুকে অক্সিজেনে পোড়ালে তাদের অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়। ঐ অক্সাইডগুলির জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে, অম্ল স্বাদযুক্ত কয়েকটি ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস ও লবণ উৎপাদন করে। অম্ল স্বাদযুক্ত কোন পদার্থের ঐ সব গুণগুলি থাকলে তাকে সাধারণতঃ **অম্ল** বা **অ্যাসিড** (acid) বলা হয়।

অপরপক্ষে, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি কতকগুলি ধাতুকে অক্সিজেনে পোড়ালে তাদের অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়। ঐ অক্সাইডগুলির জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে, অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, যে-সব পদার্থ লাল লিটমাসকে নীল করে এবং অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাদের সাধারণত **ক্ষারক** (base) বলা হয়।

তিনটি অ্যাসিড এবং তিনটি ক্ষারকের নাম বিশেষভাবে করা যেতে পারে। এগুলি হল,

অ্যাসিড	**ক্ষারক**
নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$)
সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)	ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ($Ca(OH)_2$)
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)	পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH)

যে তিনটি অ্যাসিডের উল্লেখ করা হল তাদের প্রত্যেকটিতেই **হাইড্রোজেন** আছে। হাইড্রোজেন ছাড়া বাকী অংশটিকে **অ্যাসিড মূলক** বলে। আবার,

যে তিনটি ক্ষারকের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিতেই একটি করে (OH) বা হাইড্রক্সিল মূলক আছে। এই ক্ষারকগুলি জলে বিয়োজিত হয়ে OH^- আয়ন উৎপন্ন করে। এ ধরনের ক্ষারকগুলিকে **ক্ষার** (alkali) বলা হয়। তবে সব ক্ষারক জলে OH^- আয়ন উৎপন্ন করে না; যেমন fused অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড Al_2O_3। এটা ক্ষারক বটে কিন্তু ক্ষার নয়। অর্থাৎ, সব ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সব ক্ষারক ক্ষার নয়।

আবার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) একটি হাইড্রোজেন সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়, তাই HClকে **মনোবেসিক অ্যাসিড** বলা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) দুটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে, তাই একে **ডাইবেসিক অ্যাসিড,** আর অর্থো-ফসফরিক অ্যাসিডে তিনটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে, তাই একে **ট্রাইবেসিক অ্যাসিড** বলা হয়।

জলে অ্যাসিডগুলি হাঁ-ধর্মী হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন (H^+), এবং না-ধর্মী অ্যাসিড মূলকে বিয়োজিত হয়।

$HCl \rightleftharpoons H^+$ (হাইড্রোজেন আয়ন) $+ Cl^-$ (ক্লোরাইড আয়ন)

$HNO_3 \rightleftharpoons H^+$ (হাইড্রোজেন আয়ন) $+ NO_3^-$ (নাইট্রেট আয়ন)

জলে অ্যাসিড বা ক্ষারক থাকলে জলের তড়িৎবাহিতাও অনেক বেড়ে যায়, তা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

লাউরি (Lowry) এবং **ব্রনস্টেড** (Bronsted)-এর আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী **যে সমস্ত পদার্থ দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) অর্থাৎ প্রোটন দিতে পারে, তাদের অ্যাসিড বলা হয়। আর, যে সমস্ত পদার্থ হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) অর্থাৎ প্রোটন গ্রহণ করতে পারে তাদের ক্ষারক বলা হয়।**

সমস্ত অ্যাসিড এবং ক্ষারকের শক্তি একরকম নয়। যে অ্যাসিড যত বেশী বিয়োজিত হয়ে প্রোটন দিতে পারে তা তত বেশী **তীব্র** (strong)। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি। অপরপক্ষে, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিয়োজিত হয়ে বেশী প্রোটন দিতে পারে না, তাই এদের **মৃদু** (weak) অ্যাসিড বলা হয়।

অ্যাসিডগুলিকে **দু'ভাগে** ভাগ করা যায়।

(a) **হাইড্রো-অ্যাসিড**—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিড (HCN) প্রভৃতি অ্যাসিডে হাইড্রোজেন আছে, কিন্তু কোন অক্সিজেন নেই। এগুলি হাইড্রো-অ্যাসিড।

(b) **অক্সি-অ্যাসিড—নাইট্রাস** অ্যাসিড (HNO_2), **নাইট্রিক** অ্যাসিড (HNO_3), সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ইত্যাদিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দুই-ই আছে। অ্যাসিড মূলকে অক্সিজেন কম থাকলে (যেমন, NO_2^-, $SO_3^=$) **য়াস্** অ্যাসিড, আর বেশী থাকলে (যেমন, NO_3^-, $SO_4^=$) **ইক্** অ্যাসিড বলা হয়।

2. লবণ (Salt)

সাধারণত, অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ধাতু বা যৌগমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ তৈরী হয় তাকে **লবণ** (Salt) বলা হয়। যেমন,

জিঙ্ক + সালফিউরিক অ্যাসিড = জিঙ্ক সালফেট + হাইড্রোজেন

জিঙ্ক অক্সাইড + সালফিউরিক অ্যাসিড = জিঙ্ক সালফেট + জল

এখানে জিঙ্ক সালফেট একটি লবণ। হাইপো বা সোডিয়াম থায়োসালফেট ফটোগ্রাফিতে, অ্যামোনিয়াম সালফেট সার হিসেবে, হোয়াইট লেড বা বেসিক লেড কার্বনেট সাদা রং হিসেবে, ক্যালসিয়াম সালফেট প্লাস্টার অব প্যারিস হিসেবে, সোডিয়াম কার্বনেট কাপড় ধোয়ার সোডা হিসেবে, এবং সোডিয়াম বাই-কার্বনেট খাওয়ার সোডা হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এ সবই লবণ।

প্রত্যেক লবণের **দুটি** অংশ। ধাতব অংশটিকে **ক্ষারক্ষীয়** (basic part) এবং বাকী অংশটিকে **আম্লিক** (acidic part) বলে।

লবণের শ্রেণীবিভাগ :

(a) **শমিত-লবণ** (normal salt)—অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় সমস্ত হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাকে **শমিত-লবণ** বলে। যেমন,

অ্যাসিড	**শমিত-লবণ**
H_2SO_4 (সালফিউরিক অ্যাসিড)	Na_2SO_4 (সোডিয়াম সালফেট)
H_3PO_4 (ফসফরিক অ্যাসিড)	Na_3PO_4 (সোডিয়াম ফসফেট)

(b) **অম্ল-লবণ** (acid salt)—অ্যাসিডের সবগুলি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন যদি প্রতিস্থাপিত না হয়, তবে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাকে **অম্ল-লবণ** বলে। যেমন,

অ্যাসিড	অম্ল-লবণ
H_2SO_4	$NaHSO_4$ (সোডিয়াম বাইসালফেট)
H_3PO_4	NaH_2PO_4 (সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট)
	Na_2HPO_4 (ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট)

(c) **ক্ষার-লবণ** (basic salt)—ক্ষারের অণুর যতগুলি (OH) মূলক আম্লিক মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে তার চেয়ে কমসংখ্যক প্রতিস্থাপিত হলে, লবণটিকে **ক্ষার-লবণ** বলা হবে। যেমন,

ক্ষারক	ক্ষার-লবণ
$Pb(OH)_2$ (লেড হাইড্রক্সাইড)	$Pb\langle{}^{OH}_{NO_3}$ (বেসিক লেড নাইট্রেট)

(d) **দ্বি-ধাতুক লবণ** (double salt)—ফটকিরি বা পটাস অ্যালাম (K_2SO_4, $Al_2(SO_4)_3$, $24H_2O$), ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট বা মোর সল্ট (Mohr's salt, $(NH_4)_2SO_4$, $FeSO_4$, $6H_2O$) ইত্যাদিতে দুটি লবণের অণুগুলি একত্রিত যুক্ত অবস্থায় থাকে। এগুলিকে **দ্বি-ধাতুক লবণ** বলে। জলীয় দ্রবণে অবশ্য লবণগুলি বিয়োজিত হয়ে যায়।

এ ছাড়া **জটিল-লবণের** কথা তোমরা পরে জানবে।

3. প্রশমন ক্রিয়া (Neutralisation)

অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় প্রশমন ক্রিয়া (neutralisation)। যেমন, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এবং জল উৎপন্ন হয়ঃ

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়ায় প্রশমন যে ঠিক ঠিক হল তা কি করে বুঝবে? প্রশমন ক্রিয়ায় দ্রবণে খুব সামান্য পরিমাণ এমন কতকগুলি পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা দ্রবণের রং পরিবর্তনের সাহায্যে প্রশমন সম্পূর্ণ হওয়ার

সঠিক মুহূর্তটি নির্দেশ করে। এই পদার্থগুলিকে **নির্দেশক** (indicator) বলা হয়। লিটমাস একটি নির্দেশক। লিটমাসের উপস্থিতিতে অ্যাসিড বেশী থাকলে দ্রবণের রং লাল হয় আর ক্ষারক বেশী থাকলে দ্রবণের রং নীল হয়।

প্রশমন ক্রিয়ার সাহায্যে ক্ষারক এবং অ্যাসিডের যে-কোন একটির **মাত্রা** বা **শক্তি** (strength) জানা থাকলে অন্যটির শক্তি বা মাত্রা নির্ণয় করা যায়। জ্ঞাত শক্তির অ্যাসিডের সাহায্যে অজ্ঞাত শক্তির ক্ষারক প্রশমিত করে ক্ষারকের শক্তি নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় **অম্লমিতি** (acidimetry)। অনুরূপভাবে জ্ঞাত শক্তির ক্ষারকের সাহায্যে অজ্ঞাত শক্তির অ্যাসিড প্রশমিত করে অ্যাসিডের শক্তি নির্ণয়ের পদ্ধতিকে **ক্ষারমিতি** (alkalimetry) বলে।

প্রশ্নাবলী

1. অ্যাসিড, ক্ষারক এবং লবণ কাকে বলে? ক্ষার কথাটার অর্থ কি?

2. অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়া থেকে কি কি উৎপন্ন হয়? প্রশমন ক্রিয়া কাকে বলে? প্রশমন থেকে কি কি জানা যায়?

3. অ্যাসিড এবং ক্ষারকের আধুনিক মতবাদ কি? এর সাহায্যে অ্যাসিড এবং ক্ষারকের সম্পর্কটি বুঝিয়ে লেখ।

4. নিম্নের সঙ্কেতগুলির আম্লিক এবং ক্ষারকীয় অংশগুলির নাম কর।
   HCl, H_2SO_4, H_3PO_4, $HClO_4$, $NaCl$, K_2SO_4, $FePO_4$, $KClO_4$, Na_2CO_3, NH_4OH, $NaOH$, KOH.

5. উপরের সংকেতগুলির কোন্‌টি অ্যাসিড, ক্ষারক এবং লবণ? কারণ দেখিয়ে লেখ।

6. লিটমাসের সঙ্গে ট্রাইসোডিয়াম অর্থো-ফসফেটের (Na_3PO_4) ক্রিয়া কিরূপ পরীক্ষা করে দেখ এবং কারণ বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জারণ ও বিজারণ

জারণ (Oxidation)—কার্বন বায়ুতে পোড়ালে কার্বনের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। তেমনি বায়ুর সংস্পর্শে ফেরাস অক্সাইড (FeO) ধীরে ধীরে ফেরিক অক্সাইডে (Fe_2O_3) পরিণত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি হল :

C (কার্বন) + O_2 (অক্সিজেন) = CO_2 (কার্বন ডাইঅক্সাইড)

$4FeO$ (ফেরাস অক্সাইড) + $O_2 = 2Fe_2O_3$ (ফেরিক অক্সাইড)

উপরোক্ত বিক্রিয়াগুলিতে অক্সিজেনের সংযোগ হয়েছে।

সাধারণত, কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটাকে **জারণ** (oxidation) বলা হয়। এখানে অক্সিজেন একটি **জারক** (oxidant)। অক্সিজেনের সংযোগ ছাড়াও জারণ হয়ে থাকে। যেমন, ক্লোরিনের (Cl) উপস্থিতিতে ম্যাগনেসিয়ামকে (Mg) উত্তপ্ত করলে হঠাৎ ম্যাগনেসিয়াম উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলতে থাকে এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) যৌগ তৈরী হয়। অনুরূপভাবে, ফেরাস ক্লোরাইডের ($FeCl_2$) সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) উৎপন্ন হয় :

$$Mg + Cl_2 = MgCl_2 \; ; \; 2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3$$

এখানে দেখা যাচ্ছে অপরা-তড়িৎধর্মী মৌল, যেমন ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফেরাস ক্লোরাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে $MgCl_2$ এবং $FeCl_3$ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, বিক্রিয়ায় অপরা-তড়িৎধর্মী মৌলের অনুপাত বেড়ে যাওয়াও জারণ। আবার বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন অপসারিত হলেও তাকে জারণ বলা হয়। যেমন, হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) সঙ্গে

ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় H_2S-এর হাইড্রোজেন অপসারিত হওয়ায় সালফার (S) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) তৈরী হয়। অর্থাৎ,

$$H_2S+Cl_2=S+2HCl$$

এখানে, H_2S জারিত হওয়ার কারণ হল হাইড্রোজেন অপসরণ।

আবার, ফেরাস সালফেটের ($FeSO_4$) সবুজ দ্রবণে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এবং হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (H_2O_2) দিলে $FeSO_4$ জারিত হয়ে ফেরিক সালফেটে ($Fe_2(SO_4)_3$) পরিণত হয়। অর্থাৎ,

$$2FeSO_4+H_2SO_4+H_2O_2=Fe_2(SO_4)_3+2H_2O$$

এখানে অপরা-তড়িৎধর্মী সালফেট মূলকের অনুপাত জারণের ফলে ফেরিক সালফেটে বেড়ে গেছে।

সুতরাং, শুধু অক্সিজেনের সঙ্গে সংযোগ ঘটাকে জারণ বলা সব সময় ঠিক হবে না। ব্যাপক অর্থে, **কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ, অথবা হাইড্রোজেন অপসরণ, অথবা অপরা-তড়িৎযুক্ত অংশের অনুপাত বেড়ে যাওয়াকে জারণ বলা হবে।** যে-সব পদার্থের সাহায্যে জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাদের **জারক** বলা হয়। অক্সিজেন, ওজোন, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, হ্যালোজেন (যেমন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন), নাইট্রিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ইত্যাদি **জারক** হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিজারণ (Reduction)—উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের (CuO) উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে, অথবা কপার অক্সাইডের সঙ্গে কাঠকয়লা মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে কপার ধাতু উৎপন্ন হয়। এখানে কপার অক্সাইডের অক্সিজেন হাইড্রোজেন কিংবা কার্বন দ্বারা অপসারিত হয়েছে।

$$CuO\ (\text{কালো রং})+H_2=Cu\ (\text{লালচে রং})+H_2O$$
$$2\,CuO+C=2\,Cu+CO_2$$

সাধারণত, কোন পদার্থ থেকে অক্সিজেন অপসরণকে **বিজারণ** বলা হয়। এখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সাহায্যে বিজারণ কাজটি হয়, তাই এদের **বিজারক** বলে। বিক্রিয়া দুটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে CuO যদিও হাইড্রোজেন কিংবা কার্বন দ্বারা বিজারিত হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে

হাইড্রোজেন এবং কার্বন জারিত হয়ে যথাক্রমে জল (H_2O) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয়েছে। তেমনি ক্লোরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হলে, একই সঙ্গে ক্লোরিন বিজারিত আর হাইড্রোজেন জারিত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়: $Cl_2 + H_2 = 2HCl$ (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড)।

এখানে, ক্লোরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটায় ক্লোরিন বিজারিত হয়েছে। আবার, $FeCl_3$ থেকে একটি ক্লোরিন পরমাণু জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে সরিয়ে নিলে ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) পাওয়া যায়: $2FeCl_3 + 2H = 2FeCl_2 + 2HCl$

এখানে অপরা-তড়িৎধর্মী ক্লোরিনের অনুপাত বিজারণের ফলে কমে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জারণ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ বিজারণ ক্রিয়ায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে, **কোন পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোগ, অথবা পদার্থ থেকে অক্সিজেন অপসরণ, অথবা অপরা-তড়িৎযুক্ত অংশের অনুপাত হ্রাস প্রাপ্তিকে বিজারণ বলে।** উপরের উদাহরণে $FeCl_3$-এর বিজারণের কাজটি হাইড্রোজেনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাই হাইড্রোজেন একটি **বিজারক**। হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2), স্ট্যানাস্ ক্লোরাইড ($SnCl_2$), হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিড (HI), কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড (CO), ইত্যাদি **বিজারক** দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জারণ ও বিজারণ একে অন্যের মুখাপেক্ষী :

একটি খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে জিনিসটি বোঝানো যাক। কোন গৃহিণীর গহনাগুলি চোর যখন চুরি করে, তখন দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটে ; গৃহিণীর কিছু লোকসান, আর চোরের কিছু লাভ। গৃহিণীর **গহনা** না থাকলে চোর সেগুলি চুরি করে **লাভবান** হত না, আর চোর চুরি না করলে গৃহিণীর **লোকসান** হত না। এখানে দুটো ঘটনা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। জারণ-বিজারণেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) দ্রবণের মধ্য দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস পাঠালে $FeCl_2$ জারিত হয়ে ফেরিক ক্লোরাইডে ($FeCl_3$) পরিণত হয়, আর ঐ একই সঙ্গে ক্লোরিন অণু বিজারিত হয়ে ক্লোরাইড মূলকে পরিণত হয়।

$$2FeCl_2 \text{ (বিজারক) } + Cl_2 \text{ (জারক) } = 2FeCl_3$$

জারণ-বিজারণ ক্রিয়াটি আরও ভালভাবে আয়ন-ইলেকট্রনের সাহায্যে বোঝানো যায়। জলীয় দ্রবণে ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) এবং ক্লোরাইড আয়নে (Cl^-) বিয়োজিত থাকে :

$$FeCl_2 \rightleftharpoons Fe^{2+} + 2Cl^-$$

$FeCl_2$-এর জলীয় দ্রবণের ভেতর দিয়ে Cl_2 গ্যাস পাঠালে তা ফেরিক ক্লোরাইডে ($FeCl_3$) পরিণত হয়। দ্রবণে $FeCl_3$, ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) এবং ক্লোরাইড আয়নে (Cl^-) বিয়োজিত থাকে :

$$FeCl_3 \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3Cl^-$$

জারণের সময় ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) ক্লোরিন পরমাণুকে একটি ইলেকট্রন দিয়ে ফেরিক (Fe^{3+}) আয়নে পরিণত হয়, আর Cl পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নে পরিণত হয়।

জারণ : Fe^{2+} (বিজারক) $- e = Fe^{3+}$

বিজারণ : Cl (জারক) $+ e = Cl^-$

এখানে বিজারকটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হচ্ছে, আর একই সঙ্গে জারকটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হচ্ছে। Fe^{2+} আয়ন Cl পরমাণুকে ইলেকট্রন না দিয়ে Fe^{3+} আয়নে পরিণত হতে পারে না, আর Cl পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ না করে Cl^- আয়নে পরিণত হতে পারে না। **অর্থাৎ জারণ ও বিজারণ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং যুগপৎ সম্পন্ন হয়।**

প্রশ্নাবলী

1. জারণ ও বিজারণ কাকে বলে? উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দাও। জারণ ও বিজারণে জারক ও বিজারক কাকে বলা হয়?

2. জারণ ও বিজারণ কি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল?

3. তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে জারণ ও বিজারণের সাহায্যে বোঝানো যায় কি?

সপ্তম অধ্যায়

বায়ু

বায়ু প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ ; এ ছাড়া বায়ুতে খুব কম পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস, যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, নিষ্ক্রিয় গ্যাস (inert gas), প্রভৃতি থাকে। আয়তনের শতাংশ হিসেবে বায়ুতে এদের অনুপাত সাধারণত নাইট্রোজেন 78·03, অক্সিজেন 20·99, নিষ্ক্রিয় গ্যাস 0·94, কার্বন ডাইঅক্সাইড 0·03, এ ছাড়া সামান্য জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা প্রভৃতিও থাকে। স্থান ও কালভেদে এই অনুপাত অল্প-স্বল্প বদলায়, কিন্তু তা অতি নগণ্য। এর কারণ হল, বায়ুর উপাদানগুলি একদিকে যেমন নানা প্রক্রিয়ায় বায়ু হতে অপসারিত হয় তেমনি অপর কতকগুলি প্রক্রিয়ায় সেগুলি বায়ুতে ফিরে আসে। ফলে উপাদানগুলির অনুপাত প্রায় একই থাকে। নাইট্রোজেন চক্রে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্রে এদুটি প্রক্রিয়াই বিশেষভাবে দেখা যায়।

তরল বায়ু (Liquid air)

বায়ুর উপাদানগুলি পৃথকভাবে পেতে হলে সাধারণত বায়ুকে তরল করে তার আংশিক পাতনের সাহায্যে উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করা হয়। প্রথমত কস্টিক পটাশ দ্রবণ ও কঠিন কস্টিক পটাশের ভেতর দিয়ে বায়ু চালনা করে তার কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প দূর করা হয়। জুল (Joule) এবং থমসন (Thomson) আবিষ্কার করেন যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের, V_1 আয়তনের গ্যাসকে P_1 চাপ প্রয়োগে যদি খুব সরু ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে অপেক্ষাকৃত কম চাপ (P_2) এবং বেশী আয়তনে (V_2) ঠেলে দেওয়া যায়, তবে V_1 আয়তনে গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ যা ছিল, V_2 আয়তনে তা হ্রাস পায়, কারণ V_1 হতে V_2 বড় (Fig. 7.1)।

এখন V_1 থেকে V_2তে যাওয়ায় গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যায় ; এর জন্য কিছুটা শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি গ্যাসের ভেতর থেকেই তাপরূপে গৃহীত হয়, ফলে গ্যাসটি খানিকটা শীতল হয়। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুকে অধিক চাপে সঙ্কোচিত করে সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে কম চাপে প্রসারিত হতে দিলে বায়ু ক্রমশ শীতল হতে থাকে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটিকে কয়েকবার চালালে পরিশেষে বায়ু তরলে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বায়ু তরলীকরণ পদ্ধতিটি এমন একটি আধারে করা হয় যাতে বাইরের সঙ্গে ভেতরের তাপের আদান-প্রদান হয় না। তরল বায়ুকে সংরক্ষণ করতে বিশেষ ধরনের দুই দেওয়ালবিশিষ্ট ফ্লাস্কের (ডিওয়ার ফ্লাস্ক, Dewar flask) প্রয়োজন হয়। তরল বায়ু হাল্কা নীল রঙের। জল বরফ হয় 0°C উষ্ণতায়, কিন্তু বায়ু তরল হয় – 190°C উষ্ণতায়।

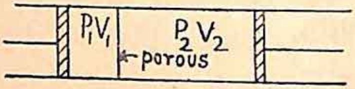


Fig 7.1

নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle)

সাধারণত বায়ুর আয়তনের 78·03 শতাংশ নাইট্রোজেন (N_2)। প্রাণী ও উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেনের কিছুটা নানাভাবে তাদের কাজে লাগায়। এর ফলে প্রাণীর দেহে সচরাচর 3·3 শতাংশ এবং উদ্ভিদে 0·45 শতাংশ N_2 বিভিন্ন যৌগরূপে থাকতে দেখা যায়। অপরদিকে অন্য কতকগুলি পথে বায়ু হতে গৃহীত N_2 আবার বায়ুতে ফিরে আসে ; ফলে বায়ুতে N_2-এর অনুপাত প্রায় একই থাকে। বায়ুর N_2-এর ক্ষয় এবং পূরণের এই আবর্তনকে বলা হয় **নাইট্রোজেন চক্র** (nitrogen cycle) (Fig. 7.2)। N_2 গ্রহণ ও বর্জনের এই আবর্তনকে প্রধানত 4টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) আকাশে বিদ্যুৎক্ষরণের সময় আশেপাশের বায়ুর অক্সিজেন (O_2) ও N_2-এর মধ্যে সংযোগ ঘটে, এবং N_2-এর বিভিন্ন অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়। পরে ঐ অক্সাইডগুলি বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হলে নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) তৈরী হয়। অ্যাসিডগুলি মৃত্তিকার ক্ষারকগুলির দ্বারা প্রশমিত হয়ে বিভিন্ন নাইট্রাইট ও নাইট্রেট লবণ উৎপাদন করে। অধিকাংশ উদ্ভিদ এইসব লবণ সার বা খাদ্য হিসেবে

গ্রহণ করে এবং তা থেকে দেহের প্রোটিন তৈরি করে। প্রাণীরা এভাবে প্রোটিন তৈরি করতে পারে না। তারা কোন-না-কোনভাবে এ ব্যাপারে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। $N_2+O_2=2NO$ (নাইট্রিক অক্সাইড), $2NO+O_2=2NO_2$ (নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড)।

$$H_2O+2NO_2=HNO_2+HNO_3$$

(ii) লেগিউমিনাস্ (leguminous) জাতীয় উদ্ভিদ, যেমন মটর, সীম ইত্যাদির শিকড়ে ছোট ছোট গুটি (nodules) থাকে। এই গুটি-গুলিতে এক রকম ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু থাকে। এরা বাতাসের N_2কে সরাসরি গ্রহণ করে ঐ সব উদ্ভিদের উপযোগী নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করে। এ ক্ষেত্রে ঐ সব ব্যাকটেরিয়া ও উদ্ভিদ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। লেগিউমিনাস্ জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া অধিকাংশ উদ্ভিদই বায়ুর N_2 সরাসরি নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগে পরিণত করতে পারে না। এ ছাড়া মৃত্তিকায় আরও কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। তারাও বায়ুর N_2 থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ তৈরি করতে পারে।

(iii) মৃত্তিকায় প্রাকৃতিক নিয়মে যে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হয়, এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত যে-সব কৃত্রিম সার মাটিতে ব্যবহার হয়, সবই উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়। তৃণভোজী প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে বড় হয়, আর মাংসভোজী প্রাণী তাদের পুষ্টির জন্য কোন-না-কোনভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। প্রাণীদের মল, মূত্র এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের পচন থেকে অ্যামোনিয়া তৈরী হয়। মৃত্তিকায় অবস্থিত কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু (নাইট্রোসিফায়িং) প্রথমে এই অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইট লবণে, এবং পরে অন্য কতকগুলি জীবাণুর (নাইট্রিফায়িং) সাহায্যে নাইট্রাইট লবণকে নাইট্রেট লবণে পরিণত করে।

(iv) এদিকে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ফাঙ্গাই (fungi) এবং ডিনাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়া জমির নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থগুলি, বিশেষ-ভাবে নাইট্রাইট এবং নাইট্রেট লবণকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, এবং তাদের ভেঙে N_2 উৎপাদন করে। এভাবে N_2 আবার বায়ুতে ফিরে আসে।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রকৃতির সমস্ত N_2 সম্ভার জীব জগতের

দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে কোন এক সময়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতিতে N_2-চক্র অনবরত চলতে থাকায় বায়ুর N_2-এর পরিমাণ প্রায় একই থাকে।

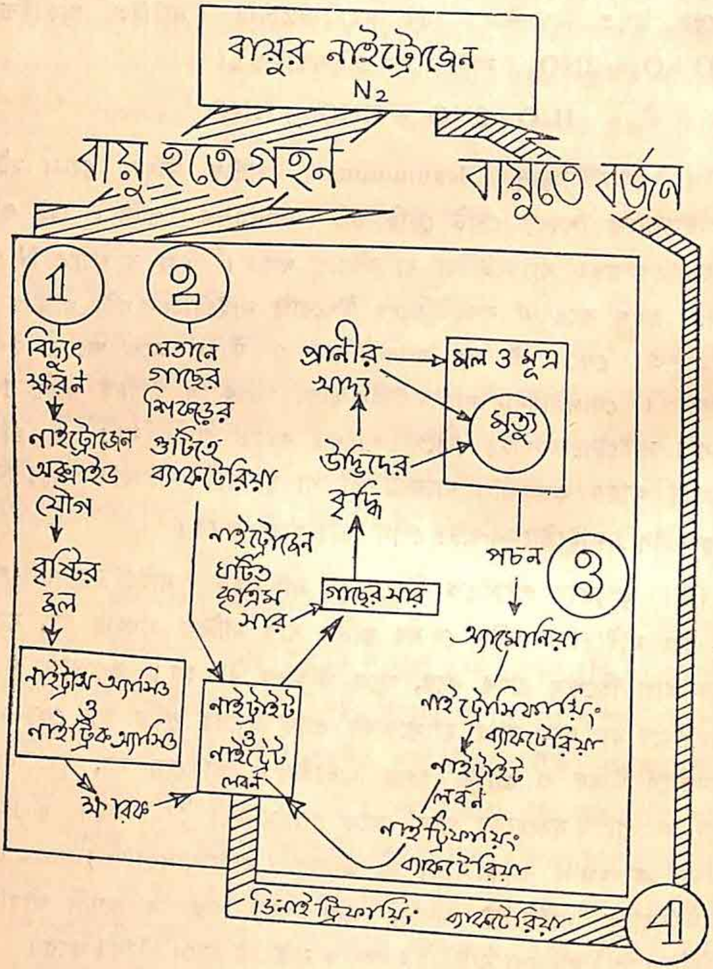


Fig. 7.2 নাইট্রোজেন চক্র

কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র (Carbon dioxide cycle)

সাধারণত বায়ুর আয়তনের 0·03 শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস। বায়ুর এই CO_2-এর একাংশ নানাভাবে জীব-জগৎ কাজে লাগায়, আবার অন্য কতকগুলি পথে বায়ুতে CO_2 ফিরে আসে, ফলে বায়ুর CO_2-এর

অনুপাত প্রায় একই থাকে। বায়ুর CO_2-এর ক্ষয় এবং পূরণের এই আবর্তনকে বলা হয় **কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র** (carbon dioxide cycle) (Fig.7.3)। CO_2 চক্রটিতে যে দুটি পদ্ধতি চলছে তা হল—(a) CO_2 গ্রহণ এবং (b) CO_2 বর্জন।

কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ও বর্জন

(i) সবুজ উদ্ভিদের পাতায় ক্লোরোফিল নামক সবুজ কণিকার উপস্থিতিতে সূর্যালোকে বায়ুর CO_2 এবং জল থেকে শর্করাজাতীয় পদার্থ, $(CHOH)x$, তৈরী হয়। এ পদ্ধতিতে অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন হয় এবং তা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্বাসকার্যে লাগে।

$$xCO_2 + xH_2O \xrightarrow[\text{ও সূর্যালোক}]{\text{পাতার সবুজ কণা}} (CHOH)x + xO_2$$

কিন্তু প্রাণীরা এভাবে সরাসরি খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারে না। তাই প্রাণীরা খাদ্যের জন্য কোন-না-কোনভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। প্রশ্বাসের সময় বায়ুর O_2 প্রাণীরা গ্রহণ করে। দেহে O_2-এর উপস্থিতিতে খাদ্যের দহন থেকে CO_2 উৎপন্ন হয় এবং তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে বায়ুতে ফিরে আসে। অপরপক্ষে, অন্ধকারে উদ্ভিদের শ্বাসকার্য থেকে যে CO_2 বের হয় তা বায়ুতে মেশে।

(ii) এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু হলে, তাদের পচন ও দহন থেকেও CO_2 তৈরী হয়। আমরা আজকাল কয়লা ও পেট্রোলিয়াম যা ব্যবহার করি তার উৎপত্তি উদ্ভিদ থেকে। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম যখন আবার ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন ঐ সব পদার্থের কার্বনের সঙ্গে বায়ুর O_2-এর বিক্রিয়ায় CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। CO_2 জলে বেশ দ্রবীভূত হয় এবং কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন হয়। মাটির ক্ষারকের সঙ্গে CO_2 এবং H_2CO_3-এর বিক্রিয়া হতে যথাক্রমে কার্বনেট এবং বাইকার্বনেট লবণ তৈরী হয়।

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$$

ক্ষারক + কার্বনিক অ্যাসিড = কার্বনেট লবণ + জল

কার্বনেট লবণ + কার্বনিক অ্যাসিড = বাইকার্বনেট লবণ

(iii) আকাশে স্থানে স্থানে বিদ্যুৎক্ষরণের সময় যে অত্যধিক তাপ উদ্ভূত হয় তা বায়ুর N_2 এবং O_2-এর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে নাইট্রিক

অক্সাইড (NO) এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন করে।

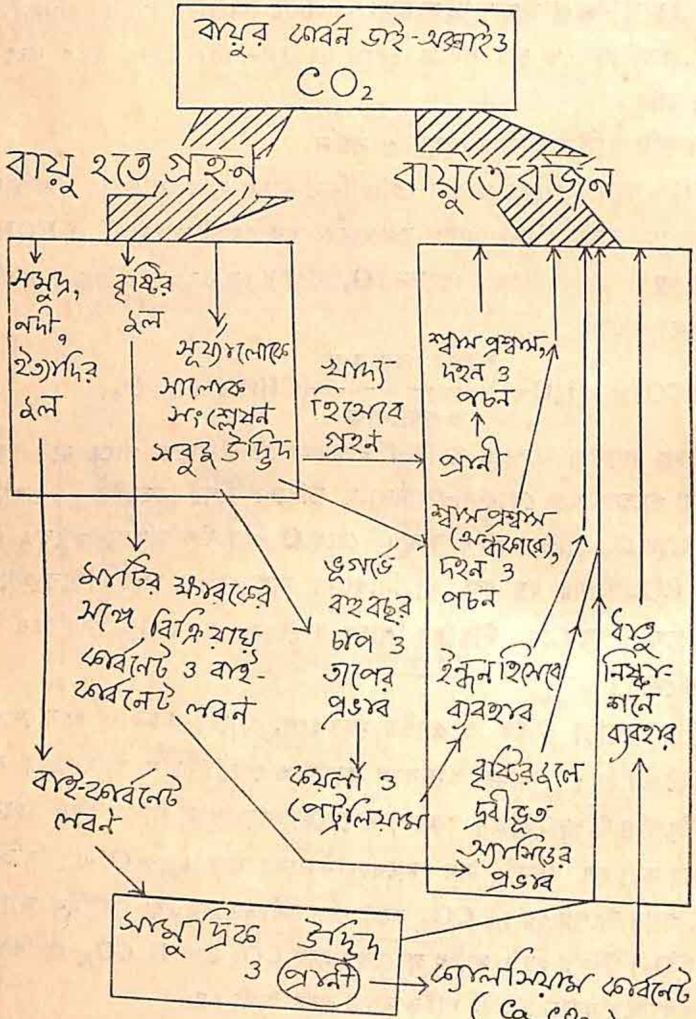


Fig. 7.3 কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র

এগুলি বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হলে নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) উৎপন্ন হয়।

$$N_2 + O_2 = 2NO\ ;\ 2NO + O_2 = 2NO_2\ ;$$
$$2NO_2 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$$

বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত HNO_2 এবং HNO_3-এর সঙ্গে কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট লবণের বিক্রিয়া হতে CO_2 উৎপন্ন হয়। সমুদ্র, নদী ইত্যাদির জলেও CO_2 সব সময়ই কিছু না কিছু ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট লবণ হিসেবে দ্রবীভূত থাকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীরা এর খানিকটা ব্যবহার করে, কিন্তু বাকি অংশটি CO_2 গ্যাসরূপে বায়ুতে ফিরে আসে। সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হলে তাদের দেহের ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে খড়িমাটিরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট ধাতুনিষ্কাশনে ব্যবহার হলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। এইভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রণালীতে CO_2 গ্রহণ ও বর্জন ক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে। আজকাল অবশ্য বায়ুর CO_2-এর খুব সামান্য অংশ কৃত্রিম প্রণালীতে রাসায়নিক যৌগ (যেমন, ইউরিয়া নামক সার) প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়। এই রাসায়নিক যৌগগুলিও বিভিন্ন প্রণালীতে বিযোজিত হলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ব্যবহার (Uses of the inert gases) :

বায়ুর আয়তনের মাত্র 0·94 শতাংশ ছয়টি নিষ্ক্রিয় গ্যাস (হিলিয়াম, He ; নিয়ন, Ne ; আর্গন, A ; ক্রিপ্‌টন, Kr ; জেনন, Xe এবং রেডন, Rn) তাতে মৌলিক অবস্থায় থাকে। এরা সাধারণত কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, তাই এদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে। Rn ছাড়া অন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি উচ্চ তড়িৎ-বিভবে আয়নিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ রং-এর আলোক বিচ্ছুরণ করে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির ব্যবহার সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যাক।

আর্গন : সাধারণত ইলেকট্রিক বালবে কম চাপে আর্গন গ্যাস থাকে। ইলেকট্রিক বালবে টাঙ্গস্টেনের তার থাকে এবং বায়ুর O_2-এর উপস্থিতিতে অপরিবাহী টাঙ্গস্টেন অক্সাইড যৌগে পরিণত হয়। এছাড়া বালব সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করলে উচ্চ উষ্ণতায় টাঙ্গস্টেনের উপরিতল থেকে অণুগুলি ক্রমশ বেরিয়ে যায়, ফলে তারটি ক্রমশ সরু হতে থাকে। কিন্তু বালবে কমচাপে আর্গন গ্যাস থাকলে টাঙ্গস্টেন পুড়ে নষ্ট হয় না এবং ধাতব টাঙ্গস্টেনের অণুগুলিও উদ্বায়ী হতে পারে না।

হিলিয়াম : হাইড্রোজেনের চেয়ে সামান্য ভারী হলেও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের সময় যে-সব বেলুন উড়ানো হয় তাতে হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়, কারণ হাইড্রোজেন একটি দাহ্য পদার্থ, কিন্তু হিলিয়াম নিষ্ক্রিয় গ্যাস। আজকাল সমুদ্রতলে ডুবুরিরা হিলিয়াম ও অক্সিজেনের সিলিণ্ডার ব্যবহার করে ; কারণ রক্তে হিলিয়ামের দ্রাব্যতা খুব কম হওয়ায় সমুদ্রের নীচে অধিক চাপেও ডুবুরিদের অনিষ্ট হয় না।

নিয়ন : নিয়ন বাতি সম্পর্কে আগেই খানিকটা বলা হয়েছে (পদার্থ-বিস্তার পরিচ্ছেদ 4 দেখ)। বিমান-বন্দরে নিয়ন বাতির খুব বেশী ব্যবহার হয়, কারণ নিয়ন বাতির আলো কুয়াশা ভেদ করে যেতে পারে, ফলে বিমান-বন্দর পর্যবেক্ষণ করা বৈমানিকদের পক্ষে সহজ হয়।

ক্রিপ্‌টন এবং জেনন : ক্রিপ্‌টন এবং জেননের ভেতর দিয়ে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ পাঠালে ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। সেজন্য আজকাল ক্যামেরায় যে ফ্ল্যাশবাতি ব্যবহৃত হয় তাতে Kr এবং Xe থাকে। এই ফ্ল্যাশবাতিগুলি অনেকবার ব্যবহার করা চলে।

রেডন : রেডন একটি তেজস্ক্রিয় গ্যাস এবং কর্কট রোগে (cancer) ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. তরল বায়ুর উপাদান কি ? বায়ুকে কিভাবে তরলে পরিণত করা যায় ? তরল বায়ুর ব্যবহার কি ?

2. নাইট্রোজেন চক্র কাকে বলে ? নাইট্রোজেন চক্রের বিক্রিয়াগুলি লেখ। উদ্ভিদ ও প্রাণী কিভাবে নাইট্রোজেন চক্রে অংশগ্রহণ করে ?

3. কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র কাকে বলে ? কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্রের বিক্রিয়াগুলি লেখ। উদ্ভিদ ও প্রাণী কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্রে অংশগ্রহণ করে ?

4. নিয়ন বাতি কি ? বালবে অক্সিজেন থাকলে কি হয় ? নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি কি কি কাজে লাগে ?

অষ্টম অধ্যায়

কয়েকটি গ্যাস ঃ প্রস্তুতি ও ধর্ম

1. অক্সিজেন (Oxygen)

সঙ্কেত O_2, পরমাণবিক গুরুত্ব 16, যোজ্যতা 2

মুক্ত অবস্থায় বায়ুর আয়তনের শতকরা 20·99 ভাগ অক্সিজেন ; যৌগরূপে জল, বালি, চুনাপাথর ($CaCO_3$) ও অন্যান্য অনেক খনিজ পদার্থ, চিনি, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তেল, চর্বি, প্রোটিন প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আছে।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : রসায়নাগারে সাধারণত পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) থেকে O_2 তৈরি করা হয়। $KClO_3$কে (360°C-এ) উত্তপ্ত করলে সেটা গলে গিয়ে O_2 দিতে আরম্ভ করে ; কিন্তু সবটুকু O_2 পেতে হলে তাকে 600°C-এরও কিছু বেশী উত্তপ্ত করতে হয়। কিন্তু $KClO_3$-এর সঙ্গে গুঁড়ো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) মিশিয়ে নিলে মাত্র 240°C উষ্ণতায় এবং বেশ দ্রুত গতিতে $KClO_3$ সম্পূর্ণ বিযোজিত হয় এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

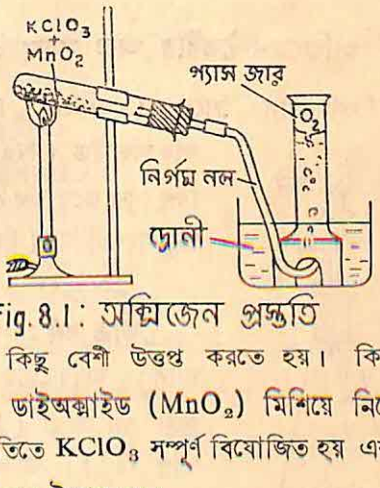


Fig. 8.1 : অক্সিজেন প্রস্তুতি

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$$

MnO_2-এর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। MnO_2-এর পরিবর্তে ফেরিক অক্সাইড, নিকেল অক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করেও বিযোজনটি ত্বরান্বিত করা যায়। এরা **অনুঘটকের** কাজ করে।

5 ভাগ ওজনের $KClO_3$ চূর্ণ এবং 1 ভাগ ওজনের MnO_2 চূর্ণ ভাল করে মিশিয়ে একটি শক্ত কাচের পরীক্ষানলের প্রায় অর্ধেক মিশ্রণ দিয়ে ভরা হয়। পরীক্ষানলের মুখে কর্কের সাহায্যে নির্গমনল লাগানো হয়। বন্ধনীর

সাহায্যে পরীক্ষানলটি এমনভাবে রেটর্ট দণ্ডের সঙ্গে আটকানো হয়, যেন নলের মুখ নীচের দিকে একটু ঝুঁকে থাকে। নির্গমনলের মুখ জলে ডুবিয়ে তার ওপরে সেল্‌ফের সাহায্যে একটি জলভরা গ্যাসজার উপুড় করে রাখা হয় (Fig. 8.1)। এবার পরীক্ষানলটিকে বুনসেন শিখায় প্রথমে সামনের দিকে এবং পরে ধীরে ধীরে পেছন দিকে উত্তপ্ত করলে (কেন?) $KClO_3$ বিযোজিত হয়ে KCl এবং O_2 উৎপন্ন হয়। O_2 নির্গমনল দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং গ্যাসজারের জল নিম্নদিকে অপসারণ করে সঞ্চিত হয়। জার ভর্তি হলে, কাচের ঢাকনি দিয়ে জারের মুখ বন্ধ করে দ্রোণী থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। বিশুদ্ধ O_2 পেতে হলে O_2কে গাঢ় H_2SO_4 অ্যাসিডের ভেতর দিয়ে চালনা করে পারদের উপর সংগ্রহ করা হয়।

অক্সিজেন তৈরীর অন্য সহজ প্রণালী :

কনিক্যাল ফ্লাস্কে (conical flask) কিছু শুকনো সোডিয়াম পার-অক্সাইড (Na_2O_2) নিয়ে বিন্দুপাতী ফানেল থেকে বিন্দু বিন্দু করে জল ফেললে, সাধারণ তাপাঙ্কেই দ্রুতগতিতে O_2 পাওয়া যায় (Fig. 8.2) :

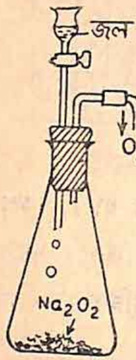


Fig. 8.2

$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$$

ভৌত ধর্ম : অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস ; বায়ুর চেয়ে অল্প ভারী (প্রায় 1·112 গুণ) ; জলে স্বল্প দ্রাব্য (N.T.Pতে 100 ভাগ জলে প্রায় 4 ভাগ O_2)। জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জল থেকে এই O_2 গ্রহণ করে। তরল O_2-এর স্ফুটনাঙ্ক $-183°C$ এবং রং ফিকে নীল। উত্তপ্ত রূপা, সোনা, প্ল্যাটিনাম ও প্যালেডিয়াম ধাতু O_2 শোষণ করে।

রাসায়নিক ধর্ম : (1) O_2 নিজে দাহ্য পদার্থ নয়, কিন্তু **দহনে সহায়তা করে।** একটি শিখাহীন জলন্ত পাটকাঠিকে অক্সিজেনপূর্ণ জারে প্রবেশ করালে তা উজ্জ্বল শিখাসহ জলতে থাকে অথচ গ্যাস জলে না।

(2) অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে উত্তপ্ত অবস্থায় O_2-এর রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, এবং তাদের অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়।

(a) প্রজ্বলন চামচে (deflagrating spoon) এক টুকরো উত্তপ্ত, গন্‌গনে লাল কাঠকয়লা নিয়ে অক্সিজেনের জারে ঢুকিয়ে দিলে কয়লাটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ সহ জলতে থাকে এবং CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় : $C+O_2=CO_2$। এভাবে আলো ও উত্তাপ সহ O_2-এর সঙ্গে কোন পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ বা জারণকে সাধারণত **দহন** (combustion) বলে। উৎপন্ন CO_2 চুনের জল ($Ca(OH)_2$) ঘোলা করে।

$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$$

ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড — ক্যালসিয়াম কার্বনেট

(b) অনুরূপভাবে S, শ্বেত P, Mg (তার বা পাত), Na, K প্রভৃতি O_2-এ দগ্ধ করলে তাদের অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয় :

$S+O_2=SO_2$ (সালফার ডাইঅক্সাইড)

$2S+3O_2=2SO_3$ (সালফার ট্রাইঅক্সাইড)

$P_4+5O_2=2P_2O_5$ (ফসফরাস পেন্টোক্সাইড)

$2Mg+O_2=2MgO$ (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড)

$2Na+O_2=Na_2O_2$ (সোডিয়াম পার-অক্সাইড)

ধাতব অক্সাইডগুলি জলে দ্রবীভূত হলে হাইড্রক্সাইড তৈরী হয় ; এরা ক্ষারক এবং লাল লিটমাসকে নীল করে। অপরপক্ষে, অধাতুর অক্সাইডগুলি জলে দ্রবীভূত হলে অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং তা নীল লিটমাসকে লাল করে ; অধাতুর অক্সাইডগুলি অ্যাসিড-ধর্মী।

$P_2O_5+H_2O$ (ঠাণ্ডা) $=2HPO_3$ (মেটাফসফরিক অ্যাসিড)

$P_2O_5+3H_2O$ (গরম) $=2H_3PO_4$ (অর্থ-ফসফরিক অ্যাসিড)

$MgO+H_2O=Mg(OH)_2$ (ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড)

$2Na_2O_2+2H_2O=O_2+4NaOH$ (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড)

(3) (a) পাইরোগ্যালল-মিশ্রিত কস্টিক পটাস দ্রবণ (বর্ণহীন) O_2 শোষণ করে কালো হয়।

(b) বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস (NO) অক্সিজেনের সংস্পর্শে লাল নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাসে পরিণত হয় :

$$2NO+O_2=2NO_2$$

ব্যবহার ঃ O_2 এবং অ্যাসিটেলিন সরু নলের মুখে মিশিয়ে জ্বালালে তীব্র শিখা (3200°C) উৎপন্ন হয়। এই শিখা বিভিন্ন ধাতু জুড়তে এবং কাটতে ব্যবহৃত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে O_2 অপরিহার্য। হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের এবং পর্বতারোহীদের অক্সিজেন লাগে।

2. হাইড্রোজেন (Hydrogen)

সঙ্কেত H_2, পারমাণবিক গুরুত্ব 1·008, যোজ্যতা 1

প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত অবস্থায় খুব কম থাকে, বেশীর ভাগ থাকে নানান যৌগিক পদার্থরূপে, যেমন জল, হাইড্রোকার্বন, চিনি, তেল, চর্বি, অ্যাসিড প্রভৃতিতে।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী ঃ ল্যাবরেটরীতে সাধারণত জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা হয়। একটি উল্‌ফ বোতলে খানিকটা জিঙ্কের টুকরো নেওয়া হল। কর্কের সাহায্যে বোতলের একমুখে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল (thistle funnel) এবং অপর মুখে একটি নির্গমনল লাগানো হল। নির্গমনলের মুখটি দ্রোণীর জলে ডুবিয়ে রেখে নলের ঠিক মুখের উপর একটি জলভরা গ্যাসজার উপুড় করে রাখা হল। এখানে বলা প্রয়োজন যে হাইড্রোজেন বায়ুর সঙ্গে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ উৎপাদন করে, তাই শুরুতেই কর্ক ও নলের সংযোগস্থল যে বায়ু-নিরোধক তা দেখা উচিত। এবার দীর্ঘ-নল ফানেলের ভেতর দিয়ে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এমনভাবে ঢালা হল যে দীর্ঘ-নল ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডে ডুবে থাকে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে জিঙ্ক (Zn) ধাতু আসার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হয় এবং হাইড্রোজেন (H_2) জলের নিম্নমুখী অপসরণের সাহায্যে গ্যাসজারে সঞ্চিত হয় ঃ $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$। উল্‌ফ বোতল ব্যবহার করে প্রয়োজনানুসারে যে-কোন সময় H_2 প্রস্তুত ও বন্ধ করা চলে না। তাই যে-কোন সময় হাইড্রোজেন পেতে হলে কিপ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়।



Fig.8.3 : হাইড্রোজেন প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম : হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, জলে স্বল্প দ্রাব্য একটি গ্যাস। একটি বেলুনে H_2 ভরে ছেড়ে দিলে তা শূন্যে উপরের দিকে উঠতে থাকে। বায়ুর চেয়ে প্রায় 14·4 গুণ হাল্কা, তাই এ রকম হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) একটি H_2 পূর্ণ গ্যাসজার উপুড় করে একটি জ্বলন্ত শলাকা প্রবেশ করালে শলাকাটি নিভে যায়, কিন্তু H_2 জারের মুখে নীল শিখাসহ জ্বলতে থাকে। অর্থাৎ H_2 একটি দাহ্য গ্যাস, কিন্তু দহনে সহায়তা করে না।

(ii) H_2 (2 আয়তন) এবং O_2 (1 আয়তন)-এর মিশ্রণে জ্বলন্ত পাটকাঠি ছোঁয়ালে তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে ওঠে এবং জল (H_2O) উৎপন্ন হয় [এই বিক্রিয়ায় সামান্য জলীয় বাষ্প অনুঘটকরূপে থাকা দরকার] : $2H_2+O_2=2H_2O$

(iii) উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডের উপর দিয়ে H_2 পাঠালে ধাতব অক্সাইড **বিজারিত** হয় এবং ধাতু ও জল উৎপন্ন হয় :

CuO (কপার অক্সাইড) $+H_2=$ Cu (কপার) $+H_2O$

(iv) অনেক **অধাতুর সঙ্গে** বিশেষ বিশেষ অবস্থায় H_2-এর সংযোগ ঘটে এবং অধাতব যৌগ তৈরী হয়। যেমন, আলোর উপস্থিতিতে : $H_2+Cl_2=2HCl$ (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড)। চাপ, তাপ ও অনুঘটকের (Fe) উপস্থিতিতে : $N_2+3H_2=2NH_3$ (অ্যামোনিয়া)।

(v) **অন্তর্ধৃতি** (occlusion) : বিচূর্ণ প্যালেডিয়াম, প্লাটিনাম, ইত্যাদি ধাতু তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় H_2 শোষণ করতে পারে। ধাতুর এই গুণকে **অন্তর্ধৃতি** বলে। এটি কঠিনে গ্যাসীয় দ্রবণের একটি দৃষ্টান্ত।

জায়মান হাইড্রোজেন : সাধারণ পদ্ধতিতে যে হাইড্রোজেন (H_2) তৈরি করা হয় জায়মান হাইড্রোজেন (H) তার চেয়ে শক্তিশালী বিজারক। একটি পরীক্ষানলে অ্যাসিড-মিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে কিপ যন্ত্র হতে উৎপন্ন H_2 নলের সাহায্যে পাঠালে পারম্যাঙ্গানেটের রঙ বিরঞ্জিত হয় না ; কিন্তু যদি একটি পরীক্ষানলে প্যারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে খানিকটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও জিঙ্ক দেওয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে পারম্যাঙ্গানেটের রঙ বিরঞ্জিত হয়। শুধু জিঙ্ক বা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড পারম্যাঙ্গানেটের রঙ বিরঞ্জিত করতে পারে না। বিক্রিয়ায় সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে জায়মান হাইড্রোজেন (H) বলে।

ব্যবহার : O_2 এবং অ্যাসিটেলিন সরু নলের মুখে মিশিয়ে জ্বালালে তীব্র শিখা (3200°C) উৎপন্ন হয়। এই শিখা বিভিন্ন ধাতু জুড়তে এবং কাটতে ব্যবহৃত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে O_2 অপরিহার্য। হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের এবং পর্বতারোহীদের অক্সিজেন লাগে।

2. হাইড্রোজেন (Hydrogen)

সঙ্কেত H_2, পারমাণবিক গুরুত্ব 1·008, যোজ্যতা 1

প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত অবস্থায় খুব কম থাকে, বেশীর ভাগ থাকে নানান যৌগিক পদার্থরূপে, যেমন জল, হাইড্রোকার্বন, চিনি, তেল, চর্বি, অ্যাসিড প্রভৃতিতে।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : ল্যাবরেটরীতে সাধারণত জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা হয়। একটি উল্ফ বোতলে খানিকটা জিঙ্কের টুকরো নেওয়া হল। কর্কের সাহায্যে বোতলের একমুখে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল (thistle funnel) এবং অপর মুখে একটি নির্গম-নল লাগানো হল। নির্গমনলের মুখটি দ্রোণীর জলে ডুবিয়ে রেখে নলের ঠিক মুখের উপর একটি জলভরা গ্যাসজার উপুড় করে রাখা হল। এখানে বলা প্রয়োজন যে হাইড্রোজেন বায়ুর সঙ্গে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ উৎপাদন করে, তাই শুরুতেই কর্ক ও নলের সংযোগস্থল যে বায়ু-নিরোধক তা দেখা উচিত। এবার দীর্ঘ-নল ফানেলের ভেতর দিয়ে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এমনভাবে ঢালা হল যে দীর্ঘ-নল ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডে ডুবে থাকে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে জিঙ্ক (Zn) ধাতু আসার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হয় এবং হাইড্রোজেন (H_2) জলের নিম্নমুখী অপসরণের সাহায্যে গ্যাসজারে সঞ্চিত হয় : $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$। উল্ফ বোতল ব্যবহার করে প্রয়োজনানুসারে যে-কোন সময় H_2 প্রস্তুত ও বন্ধ করা চলে না। তাই যে-কোন সময় হাইড্রোজেন পেতে হলে কিপ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়।

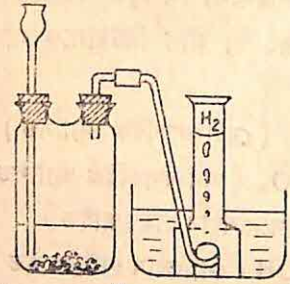


Fig.8.3: হাইড্রোজেন প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম : হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, জলে স্বল্প দ্রাব্য একটি গ্যাস। একটি বেলুনে H_2 ভরে ছেড়ে দিলে তা শূন্যে উপরের দিকে উঠতে থাকে। বায়ুর চেয়ে প্রায় 14·4 গুণ হাল্কা, তাই এ রকম হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) একটি H_2 পূর্ণ গ্যাসজার উপুড় করে একটি জ্বলন্ত শলাকা প্রবেশ করালে শলাকাটি নিভে যায়, কিন্তু H_2 জারের মুখে নীল শিখাসহ জ্বলতে থাকে। অর্থাৎ H_2 একটি দাহ্য গ্যাস, কিন্তু দহনে সহায়তা করে না।

(ii) H_2 (2 আয়তন) এবং O_2 (1 আয়তন)-এর মিশ্রণে জ্বলন্ত পাটকাঠি ছোঁয়ালে তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে ওঠে এবং জল (H_2O) উৎপন্ন হয় [এই বিক্রিয়ায় সামান্য জলীয় বাষ্প অনুঘটকরূপে থাকা দরকার] : $2H_2+O_2=2H_2O$

(iii) উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডের উপর দিয়ে H_2 পাঠালে ধাতব অক্সাইড **বিজারিত** হয় এবং ধাতু ও জল উৎপন্ন হয় :

$$CuO\ (\text{কপার অক্সাইড}) + H_2 = Cu\ (\text{কপার}) + H_2O$$

(iv) অনেক **অধাতুর সঙ্গে** বিশেষ বিশেষ অবস্থায় H_2-এর সংযোগ ঘটে এবং অধাতব যৌগ তৈরী হয়। যেমন, আলোর উপস্থিতিতে : $H_2+Cl_2=2HCl$ (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড)। চাপ, তাপ ও অনুঘটকের (Fe) উপস্থিতিতে : $N_2+3H_2=2NH_3$ (অ্যামোনিয়া)।

(v) **অন্তর্ধৃতি** (occlusion) : বিচূর্ণ প্যালেডিয়াম, প্ল্যাটিনাম, ইত্যাদি ধাতু তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় H_2 শোষণ করতে পারে। ধাতুর এই গুণকে **অন্তর্ধৃতি** বলে। এটি কঠিনে গ্যাসীয় দ্রবণের একটি দৃষ্টান্ত।

জায়মান হাইড্রোজেন : সাধারণ পদ্ধতিতে যে হাইড্রোজেন (H_2) তৈরি করা হয় জায়মান হাইড্রোজেন (H) তার চেয়ে শক্তিশালী বিজারক। একটি পরীক্ষানলে অ্যাসিড-মিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে কিপ যন্ত্র হতে উৎপন্ন H_2 নলের সাহায্যে পাঠালে পারম্যাঙ্গানেটের রঙ বিরঞ্জিত হয় না ; কিন্তু যদি একটি পরীক্ষানলে প্যারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে খানিকটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও জিঙ্ক দেওয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে পারম্যাঙ্গানেটের রঙ বিরঞ্জিত হয়। শুধু জিঙ্ক বা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড পারম্যাঙ্গানেটের রঙ বিরঞ্জিত করতে পারে না। বিক্রিয়ায় সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে জায়মান হাইড্রোজেন (H) বলে।

ব্যবহার : প্রধানত (i) অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে, (ii) অত্যুষ্ণ অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা (2800°C) তৈরি করতে, (iii) আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের ইন্ধন হিসেবে এবং (iv) ঘি-জাতীয় পদার্থ তৈরি করতে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়।

3. নাইট্রোজেন (Nitrogen)

সঙ্কেত N_2, পারমাণবিক গুরুত্ব 14 008, যোজ্যতা 3 ও 5

বায়ুর আয়তনের প্রায় 78 শতাংশই নাইট্রোজেন মুক্ত অবস্থায় থাকে। এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রোটিন ও অন্যান্য অনেক যৌগ নাইট্রোজেন ঘটিত।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : একটি গোলাকার তলবিশিষ্ট ফ্লাস্কে তুল্যাঙ্ক পরিমাণ সোডিয়াম নাইট্রাইট ($NaNO_2$) এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেওয়া হল। ফ্লাস্কের মুখে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল ও নির্গমনল কর্কের সাহায্যে লাগানো হল। দীর্ঘ-নল ফানেলের শেষ প্রান্ত ফ্লাস্কের দ্রবণে ডোবানো থাকে, আর নির্গমনলের শেষ প্রান্তটি একটি উপুড় করা জলপূর্ণ গ্যাসজারের নীচে, দ্রোণীর জলে ডোবানো থাকে (Fig. 8.4)। ফ্লাস্কটিকে খুব ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করলে প্রথমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (NH_4NO_2) এবং পরে তা বিযোজিত হয়ে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং তা গ্যাসজারের জল নিম্নদিকে অপসারণ করে জারে জমা হয়। গ্যাস উৎপন্ন শুরু হলে আগুন সরিয়ে নেওয়া হয়। বিক্রিয়াটিতে যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়।

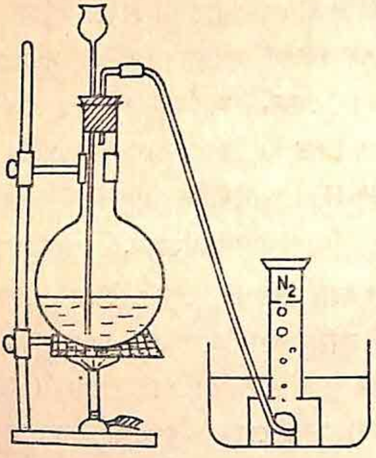


Fig. 8.4 : নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$

$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$$

উৎপন্ন নাইট্রোজেনে ক্লোরিন (Cl_2), অ্যামোনিয়া (NH_3), নাইট্রিক অক্সাইড (NO), জলীয় বাষ্প থাকতে পারে ; তাই বিশুদ্ধ N_2 পেতে হলে প্রথমে কস্টিক পটাশ (KOH) দ্রবণের মধ্য দিয়ে গ্যাসটিকে পাঠিয়ে ক্লোরিনমুক্ত করা হয়। এর পর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্প মুক্ত করা হয়। সব শেষে গ্যাসটিকে লাল তপ্ত তামার ছিলার উপর দিয়ে পাঠালে NO বিজারিত হয় এবং N_2 উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ N_2 পারদের উপর সংগ্রহ করা হয়।

ভৌত ধর্ম : N_2 গ্যাস বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং জলে প্রায় অদ্রাব্য।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) N_2 দাহ্য নয় এবং দহনে সাহায্যও করে না। তা ছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসেরও সহায়ক নয়। একটি N_2-পূর্ণ গ্যাসজারে জলন্ত পাটকাঠি ঢুকিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় এবং জারের গ্যাস পরিষ্কার চুনের জলকে ঘোলা করে না। এ পরীক্ষার সাহায্যে N_2কে খানিকটা সনাক্ত করা যায়।

(ii) N_2 বেশ নিষ্ক্রিয় পদার্থ। অবশ্য উচ্চ তাপে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ক্যালসিয়ামের (Ca) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড (Mg_3N_2) এবং ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড (Ca_3N_2) উৎপন্ন করে :

$$3Mg+N_2=Mg_3N_2 \; ; \; 3Ca+N_2=Ca_3N_2$$

ধাতব নাইট্রাইডগুলি জলের সংস্পর্শে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) তৈরি করে। NH_3 লাল লিটমাসকে নীল করে। এ পরীক্ষার সাহায্যে N_2-এর উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়, যেমন—

$Mg_3N_2+6H_2O=3Mg(OH)_2$ (ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড) $+2NH_3$

(iii) উচ্চ চাপে ও তাপে এবং লৌহচূর্ণ অনুঘটকের উপস্থিতিতে N_2-এর সঙ্গে H_2-এর মিলন ঘটে NH_3 তৈরী হয় : $N_2+3H_2=2NH_3$

(iv) আকাশে বিদ্যুৎক্ষরণের সময় উচ্চ তাপে N_2 ও O_2 এর সংযোগে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) এবং পরে আরও O_2-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) তৈরী হয় :

$$N_2+O_2=2NO \; ; \; 2NO+O_2=2NO_2$$

ব্যবহার : প্রধানত (i) অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রোজেন-ঘটিত সার প্রস্তুতি এবং (ii) বৈদ্যুতিক বালব ও গ্যাস থার্মোমিটারে নাইট্রোজেন লাগে।

4. অ্যামোনিয়া (Ammonia)

সঙ্কেত NH_3, আণবিক গুরুত্ব 17

বায়ুতে, বিশেষ করে আগ্নেয়গিরির ধারে-কাছে অ্যামোনিয়া মুক্ত অবস্থায় থাকে। এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ, মলমূত্র পচলেও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদল (NH_4Cl)-এর সঙ্গে প্রায় তিন গুণ পরিমাণ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কলিচুন ($Ca(OH)_2$) ভালভাবে মিশিয়ে মিশ্রণটিকে একটি ফ্লাস্কে নেওয়া হল। কর্কের সাহায্যে ফ্লাস্কের মুখে একটি নির্গম-নল এবং তার খোলা প্রান্তটি একটি পোড়াচুন (CaO) পূর্ণ টাওয়ারের নীচের দিকে লাগানো হল। টাওয়ারের মুখে একটি নল লাগিয়ে তার উপর একটি গ্যাসজার উপুড় করে রাখা হল (Fig. 8.5)। এবার ফ্লাস্কটিকে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং টাওয়ারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় জলীয় বাষ্প CaO দ্বারা শোষিত হয়। NH_3 গ্যাস এরপর বায়ুর নিম্নমুখী অপসরণ (downward displacement) দ্বারা গ্যাসজারে জমে, কারণ NH_3 গ্যাস বায়ুর চেয়ে হালকা। NH_3 গ্যাস জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। তাই জলের অপসরণ দ্বারা সংগ্রহ করা যায় না।

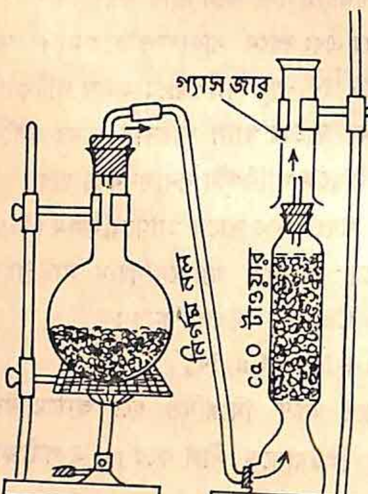


Fig. 8.5 : অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$

অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির জন্য সহজ পদ্ধতি :

কলিচুন ছাড়া অন্য কোন ক্ষারকের (যেমন, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, NaOH ; পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, KOH) সঙ্গে অ্যামোনিয়াঘটিত লবণ

(যেমন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, $(NH_4)_2SO_4$; অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, (NH_4Cl) মিশিয়ে উত্তপ্ত করলেও NH_3 উৎপন্ন হয় : $NH_4Cl + NaOH = NH_3 + NaCl + H_2O$; $(NH_4)_2SO_4 + 2KOH = 2NH_3 + K_2SO_4 + 2H_2O$.

ভৌত ধর্ম : NH_3 বর্ণহীন, বিশেষ ধরনের ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত, বায়ুর চেয়ে হালকা গ্যাস। গন্ধ শুঁকে সনাক্ত করা যায়। জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়।

ফোয়ারা পরীক্ষা : একটি শুকনো ফ্লাস্কে অ্যামোনিয়া ভর্তি করে ফ্লাস্কের মুখে কর্কের সাহায্যে একটি সরু নল লাগিয়ে ফ্লাস্কটিকে উপুড় করে এমনভাবে রাখা হল যে কাচের সরু নলটি একটি বীকারের লাল লিটমাসের জলীয় দ্রবণে খানিকটা ডুবে থাকে। এবার ফ্লাস্কটিকে ইথার দিয়ে একটু ঠাণ্ডা করলে দেখা যাবে, লিটমাস-জল সরু নল বেয়ে উপরে উঠে ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নীল রঙে পরিণত হচ্ছে। এ পরীক্ষা থেকে জলে NH_3-এর অত্যধিক দ্রবণীয়তা এবং ক্ষারকীয় ধর্ম প্রমাণ হল।

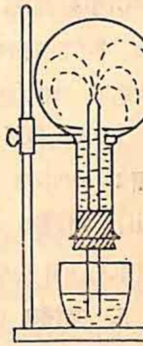


Fig. 8.6 : ফোয়ারা পরীক্ষা

রাসায়নিক ধর্ম : (i) NH_3 বায়ুতে দাহ্য নয় এবং দহনে সহায়তাও করে না। একটি NH_3-পূর্ণ গ্যাসজারে জলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে তা নিভে যায় এবং গ্যাসটিও জলে না।

(ii) NH_3 অক্সিজেনে সবুজাভ হলুদ শিখায় জলে : $4NH_3 + 3O_2 = 6H_2O + 2N_2$; উত্তপ্ত প্ল্যাটিনাম (অনুঘটক) তারজালির উপর দিয়ে বাতাস ও NH_3-এর মিশ্রণ পাঠালে NH_3 **জারিত** হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) উৎপন্ন হয় : $4NH_3 + 5O_2 \rightleftharpoons 4NO + 6H_2O$

(iii) NH_3 জলে দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) নামক মৃদু ক্ষার উৎপন্ন করে : $NH_3 + H_2O = NH_4OH$

(iv) **ক্ষারক ধর্ম :** NH_3-এর সঙ্গে অ্যাসিডের (যেমন, হাইড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড, HCl ; সালফিউরিক অ্যাসিড, H_2SO_4 ; নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3) বিক্রিয়ায় লবণ তৈরী হয়, যেমন $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ ।

একটি কাচদণ্ডের একপ্রান্তে গাঢ় HCl লাগিয়ে তা অ্যামোনিয়া-পূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করালে সাদা ধোঁয়ার আকারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) উৎপন্ন হয়।

(v) উত্তপ্ত কপার অক্সাইড (CuO , NH_3-এর দ্বারা **বিজারিত** হয়ে ধাতব কপারে (Cu) পরিণত হয় এবং NH_3 জারিত হয়ে N_2 উৎপন্ন হয় :

$$3CuO + 2NH_3 = 3Cu + N_2 + 3H_2O$$

(vi) অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন ইত্যাদির লবণের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ (NH_4OH) মেশালে ঐ সব ধাতুর হাইড্রক্সাইড অদ্রাব্য অবস্থায় অধঃক্ষিপ্ত হয়, যেমন $FeCl_3$ (ফেরিক ক্লোরাইড) $+ 3NH_4OH = Fe(OH)_3$ (ফেরিক হাইড্রক্সাইড) $+ 3NH_4Cl$ ।

ব্যবহার : প্রধানত (i) নাইট্রোজেনঘটিত সার, যেমন অ্যামোনিয়াম সালফেট, (ii) নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতি, এবং (iii) রেফ্রিজারেটারে শৈত্য উৎপাদনে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়।

5. কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide)

সঙ্কেত CO_2, আণবিক গুরুত্ব 44

বায়ুর আয়তনের 0·03 শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এছাড়া বিভিন্ন কার্বনেট লবণ হিসেবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : পরীক্ষাগারে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা মার্বেল পাথরের ($CaCO_3$) কুচি এবং লঘু HCl-এর বিক্রিয়া হতে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস তৈরি করা হয় : $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$

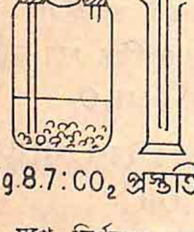


Fig.8.7: CO_2 প্রস্তুতি

একটি উল্ফ বোতলে কিছু মার্বেল পাথরের কুচি ও জল নেওয়া হল। এবারে বোতলের একটি মুখে দীর্ঘ-নল ফানেল এবং অপর মুখে নির্গমনল কর্কের সাহায্যে লাগানো হয়। দীর্ঘ-নলের প্রান্তটি যেন

বোতলের জলে ডুবে থাকে এবং ঐ অবস্থায় ফানেলের মাধ্যমে লঘু HCl বোতলে ঢাললে সাধারণ উষ্ণতায় সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদাকারে CO_2 গ্যাস তৈরী হয় এবং তা বায়ুর চেয়ে ভারী বলে বায়ুকে উপরের দিকে সরিয়ে (upward displacement) গ্যাসজারে সঞ্চিত হয়।

যখন-তখন এবং অনবরত CO_2 পেতে হলে কীপ যন্ত্রের মধ্যগোলকে মার্বেল নিয়ে বিক্রিয়াটি চালানো হয়।

লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ব্যবহার করে ল্যাবরেটরীতে CO_2 প্রস্তুত করা হয় না, কারণ $CaCO_3$-এর বিক্রিয়ায় অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) মার্বেলকুচির উপর অধঃক্ষিপ্ত হয়ে বিক্রিয়াটিকে খানিকক্ষণ পর বন্ধ করে দেয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতির অন্য সহজ পদ্ধতি :

(i) একটি শক্ত কাচের পরীক্ষানলে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ($NaHCO_3$) নিয়ে উত্তপ্ত করলে **বিশুদ্ধ** CO_2 উৎপন্ন হয় :

$$2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

(ii) কাঠকয়লা, মোম, কাগজ ইত্যাদি কার্বনের জৈব পদার্থগুলি বায়ুতে পোড়ালে ঐ পদার্থের কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটে এবং জারণের ফলে CO_2 গ্যাস তৈরী হয় : C (কার্বন) $+ O_2 = CO_2$

ভৌত ধর্ম : CO_2 গ্যাস বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং জলে সাধারণ উষ্ণতায় বেশ দ্রাব্য। চাপ বাড়িয়ে 31°C-এর নীচে CO_2 গ্যাসকে সহজেই তরলে পরিণত করা যায়। দ্রুত বাষ্পীভবনের সুযোগ দিলে তরল CO_2 জমে গিয়ে কঠিন বরফের মত হয়ে পড়ে। একে **'শুষ্ক বরফ'** (dry ice) বলে। খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে 'শুষ্ক বরফ' সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। CO_2 যে বাতাসের চেয়ে (প্রায় দেড় গুণ) ভারী তা সহজেই দেখানো যায় (Fig. 8.8)।

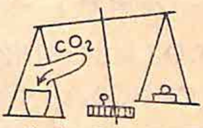


Fig. 8.8 : CO_2 বায়ুর চেয়ে ভারী।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) CO_2 নিজে দাহ্য নয় এবং দহনের সহায়কও নয়। একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি CO_2-পূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করালে সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে যায় এবং গ্যাসটিও জ্বলে না।

(ii) সাধারণত দহনে সহায়ক না হলেও, ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাসিয়াম (K) ইত্যাদি ধাতুর তার জ্বলন্ত অবস্থায় CO_2 গ্যাসজারে প্রবেশ করালে যথারীতি জ্বলতে থাকে। বিক্রিয়ায় Mg জারিত হয়ে সাদা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে (MgO), আর CO_2 বিজারিত হয়ে কালো কার্বনে পরিণত হয় এবং গ্যাসজারে সঞ্চিত হয়: $2Mg+CO_2=2MgO+C$ (কালো কণা)।

(iii) CO_2 জলে দ্রবীভূত হলে মৃদু অম্ল কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন হয় এবং তা নীল লিটমাসকে খুব সামান্যই লাল করে:

$$H_2O+CO_2=H_2CO_3$$

(iv) CO_2 একটি আম্লিক অক্সাইড, ফলে ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বনেট লবণ তৈরী হয়।

(a) একটি পরীক্ষানলে খানিকটা ঘন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) দ্রবণ নিয়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় তার মধ্য দিয়ে CO_2 গ্যাস পাঠালে প্রথমে সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) তৈরী হয়, কিন্তু আরও CO_2 গ্যাস পাঠালে অপেক্ষাকৃত কম দ্রাব্য সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ($NaHCO_2$) অধঃক্ষিপ্ত হয়:

$$2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O\ ;$$
$$Na_2CO_3+CO_2+H_2O=2NaHCO_3$$

(b) একটি পরীক্ষানলে স্বচ্ছ চুনের জল ($Ca(OH)_2$) নিয়ে তার মধ্যে CO_2 গ্যাস পাঠালে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) তৈরী হয় এবং চুনের জল ঘোলা হয়। এ পরীক্ষা দ্বারা CO_2 সনাক্ত করা যায়। অবশ্য বেশীক্ষণ CO_2 গ্যাস পাঠালে অদ্রাব্য $CaCO_3$ দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে ($Ca(HCO_3)_2$) পরিণত হয় এবং দ্রবণটি আবার স্বচ্ছ হয়।

$$Ca(OH)_2+CO_2=CaCO_3+H_2O$$
$$CaCO_3+H_2O+CO_2=Ca(HCO_3)_2$$

দ্রবণটি উত্তপ্ত করলে আবার $CaCO_3$ এবং CO_2 উৎপন্ন হয় এবং দ্রবণটি ঘোলা হয়।

ব্যবহার: প্রধানত (i) উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষে, (ii) হিমকারক হিসেবে, (iii) আগুন নেভাতে, (iv) সোডাওয়াটার, সোডিয়াম কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট এবং ইউরিয়া প্রস্তুত করতে CO_2 ব্যবহৃত হয়।

6. সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide)

সঙ্কেত SO_2, আণবিক গুরুত্ব 64

শহরাঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে কিছু সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। কয়লা পোড়ালে কিংবা আগ্নেয়গিরি থেকে যে গ্যাসীয় পদার্থ বের হয় তাতে সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) সঙ্গে তামার (Cu) ছিলা উত্তপ্ত করলে সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস তৈরী হয় :

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + 2H_2O + SO_2$$

একটি কাচের ফ্লাস্কে তামার কুচি ও খানিকটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) নেওয়া হয়। ফ্লাস্কের মুখে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল এবং একটি নির্গমনল এমনভাবে কর্কের সাহায্যে লাগানো হয় যে দীর্ঘ-নল ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডে ডোবানো থাকে। এবার ফ্লাস্কটিকে তারজালির উপর রেখে উত্তপ্ত করলে H_2SO_4 তামার দ্বারা বিজারিত হয়ে SO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং তা বায়ুর চেয়ে ভারী বলে বায়ুকে উপরের দিকে সরিয়ে গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। SO_2 গ্যাস প্রথমে অল্প জল এবং পরে ঘন H_2SO_4-এর মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বিশুদ্ধ ও বিশুষ্ক করা যায়।

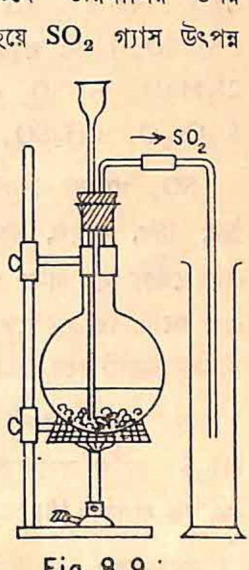


Fig. 8.9 : SO_2 প্রস্তুতি

ল্যাবরেটরীতে আরও একটি পদ্ধতিতে SO_2 গ্যাস তৈরি করা যায়। একটি ফ্লাস্কে সোডিয়াম বাই-সালফাইটের ($NaHSO_3$) গাঢ় দ্রবণ নিয়ে বিন্দুপাতী ফানেল দিয়ে ঘন H_2SO_4 ঢেলে সহজেই SO_2 গ্যাস তৈরি করা যায় :

$$NaHSO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + H_2O + SO_2$$

ভৌত ধর্ম : SO_2 গ্যাস বর্ণহীন, পোড়া সালফারের ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত এবং বায়ুর চেয়ে ভারী।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) SO_2 গ্যাস নিজে জলে না এবং অন্য পদার্থকেও

জলতে সাহায্য করে না। একটি জলন্ত পাটকাঠি SO_2-ভরা গ্যাসজারে প্রবেশ করালে সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে যায় এবং জারের গ্যাসটিও জলে না।

(ii) অবশ্য অতি তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাসিয়াম (K) ইত্যাদি SO_2 গ্যাসে দগ্ধ হতে পারে। একটি SO_2-ভরা গ্যাসজারে জলন্ত Mg প্রবেশ করালে তা যথারীতি জলতে থাকে। বেশী উষ্ণতায় SO_2 ভেঙে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা Mg-এর দহনে সাহায্য করে :

$$2Mg + SO_2 = 2MgO + S$$

(iii) SO_2 একটি আম্লিক অক্সাইড। জলে দ্রবীভূত হয় এবং সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3) নামে একটি মৃদু অ্যাসিড তৈরী হয় :

$$H_2O + SO_2 = H_2SO_3$$

(iv) SO_2 একটি ভাল **বিজারক**। যেমন, স্বল্প আম্লিক বেগুনী পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) এবং কমলা রঙের পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7$) দ্রবণের ভিতর দিয়ে SO_2 গ্যাস চালনা করলে ঐগুলি বিজারিত হয়ে দ্রবণে যথাক্রমে বর্ণহীন ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ($MnSO_4$) এবং সবুজ ক্রোমিয়াম সালফেট ($Cr_2(SO_4)_3$) তৈরী হয় :

$$2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2H_2SO_4$$
$$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + 3SO_2 = K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$$

SO_2 গ্যাসের বিজারক ধর্মটি একে সনাক্ত করতে লাগে। SO_2 গ্যাস উল, সিল্ক, কাগজ, খড় ইত্যাদি বিরঞ্জিত করতে শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে সব সময় জল বা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি প্রয়োজন। SO_2 এবং জলের বিক্রিয়া হতে উৎপন্ন **জায়মান হাইড্রোজেন বিজারক হিসেবে** বিরঞ্জন ক্রিয়াটি করে : $2H_2O + SO_2 = 2H + H_2SO_4$

(v) SO_2 একটি **মৃদু জারক**, যেমন হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) জলীয় দ্রবণে SO_2 গ্যাস পাঠালে H_2S জারিত হয় এবং অদ্রাব্য মৌলিক সালফার (S) তৈরী হয় : $2H_2S + SO_2 = 3S + 2H_2O$

ব্যবহার : প্রধানত (i) সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে, (ii) বিরঞ্জক পদার্থ হিসেবে, (iii) বীজাণুনাশক হিসেবে, এবং (iv) হিমকারক হিসেবে SO_2 ব্যবহৃত হয়।

7. সালফিউরেটড হাইড্রোজেন (Sulphurated hydrogen)

(বা হাইড্রোজেন সালফাইড)

সঙ্কেত H_2S, আণবিক গুরুত্ব 34

আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ায়, কখনো কখনো জলে এবং জীব ও উদ্ভিদের পচন থেকেও পাওয়া যায়।

ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত প্রণালী : ল্যাবরেটরীতে ফেরাস সালফাইডের (FeS) সঙ্গে ঠাণ্ডা লঘু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া হতে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) তৈরি করা হয় :

$$FeS+2HCl=FeCl_2 \text{ (ফেরাস ক্লোরাইড) } +H_2S$$

$$FeS+H_2SO_4=FeSO_4 \text{ (ফেরাস সালফেট) } +H_2S$$

একটি উল্‌ফ বোতলে (Fig. 8.7) কিছু FeS দানা নেওয়া হয়। বোতলের এক মুখে দীর্ঘ-নল ফানেল এবং অন্য মুখে নির্গমনল কর্কের সাহায্যে লাগানো হয়। ফানেল দিয়ে বোতলে লঘু H_2SO_4 (বা লঘু HCl) এমনভাবে ঢালা হয় যে দীর্ঘ-নলের প্রান্তটি বোতলের অ্যাসিডে ডুবে থাকে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসা মাত্র FeS-এর সঙ্গে বিক্রিয়া হয় এবং সাধারণ উষ্ণতায় H_2S তৈরী হয়। H_2S নির্গমনল দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং তা বায়ুর চেয়ে ভারী বলে বায়ুকে উপরের দিকে সরিয়ে গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। উৎপন্ন H_2S গ্যাস বিশুদ্ধ নয়। এতে হাই-ড্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি অল্প পরিমাণে থাকে। অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের (Al_2O_3) ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে গ্যাসটিকে বিশুদ্ধ করা হয়।

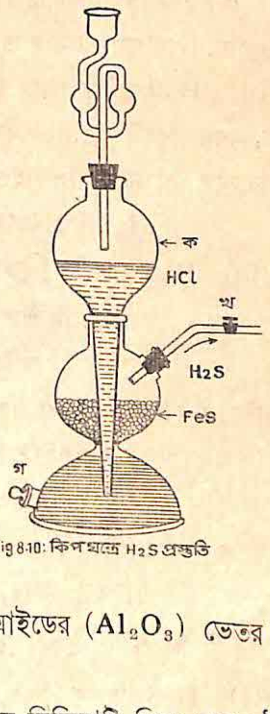


Fig 8.10: কিপ যন্ত্রে H_2S প্রস্তুতি

প্রয়োজনানুরূপ এই গ্যাস পেতে হলে উপরের বিক্রিয়াটি কিপ যন্ত্রে ঘটানো

হয়। কিপ যন্ত্রের মধ্যগোলকে FeS-এর টুকরো নিয়ে নির্গমনলের স্টপকক্ (খ) খুলে উপরের গোলক দিয়ে লঘু H_2SO_4 এমনভাবে ঢালা হয়, যাতে অ্যাসিড FeS-এর সংস্পর্শে আসে এবং H_2S তৈরী হয়। স্টপকক্ বন্ধ করলে উৎপন্ন H_2S মধ্যগোলকে জমা হয় এবং অ্যাসিডকে চাপ দিয়ে উপরের গোলকে ঠেলে দেয়; ফলে অ্যাসিড থেকে FeS বিচ্ছিন্ন হয় এবং বিক্রিয়াটি বন্ধ হয়। মধ্যগোলকের স্টপকক্ খুললে আবার বিক্রিয়া শুরু হয় এবং H_2S পাওয়া যায়।

ভৌত ধর্ম : H_2S গ্যাস পচা ডিমের মত গন্ধযুক্ত (সনাক্ত করতে লাগে), বর্ণহীন, জলে স্বল্প দ্রাব্য এবং বায়ুর চেয়ে ভারী। গ্যাসটি অত্যন্ত বিষাক্ত এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। সাধারণ উষ্ণতায় চাপ প্রয়োগে তরলে পরিণত করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) H_2S গ্যাস নিজে দাহ্য কিন্তু দহনে সহায়ক নয়। একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি H_2S গ্যাসভরা জারে প্রবেশ করালে পাটকাঠি নিভে যায়, কিন্তু গ্যাসটি নীলাভ শিখায় জ্বলতে থাকে।

(ii) H_2S জলীয় দ্রবণে H^+ (প্রোটন) এবং HS^- আয়নে বিযোজিত থাকে, ফলে দ্রবণটি অ্যাসিড-ধর্মী হয় এবং নীল লিটমাসকে লাল করে। এছাড়া ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফাইড লবণ তৈরী হয়, যেমন

$$H_2S + 2NaOH = Na_2S + 2H_2O$$

(iii) H_2S একটি **বিজারক**। H_2S-এর হাইড্রোজেন বিজারকের কাজ করে। অ্যাসিড-মিশ্রিত বেগুনী পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$), কমলা রঙের পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7$) কিংবা হলদে ফেরিক ক্লোরাইডের ($FeCl_3$) মধ্য দিয়ে H_2S চালনা করলে দ্রবণে যথাক্রমে বর্ণহীন ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ($MnSO_4$), সবুজ ক্রোমিয়াম সালফেট ($Cr_2(SO_4)_3$) এবং বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) উৎপন্ন হয়, আর H_2S জারিত হয়ে অদ্রাব্য সালফারে (S) পরিণত হয় :

$$2FeCl_3 + H_2S = 2FeCl_2 + 2HCl + S$$

অন্য বিক্রিয়াগুলি নিজেরা চেষ্টা করে লেখ।

(iv) H_2S দ্রবণে SO_2 গ্যাস পাঠালে তা বিজারিত হয় এবং সালফার (S) উৎপন্ন হয় : $2H_2S + SO_2 = 2H_2O + 3S$

(v) কর্পার, মার্কারি, লেড, আরসেনিক, টিন ইত্যাদি ধাতব লবণের দ্রবণে সামান্য লঘু HCl মিশ্রিত করে দ্রবণের ভেতর দিয়ে H_2S গ্যাস পাঠালে ঐ সব ধাতুর সালফাইড লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়, যেমন

$$CuCl_2 + H_2S = CuS \text{ (কালো) } + 2HCl$$

$$SnCl_2 + H_2S = SnS \text{ (খয়েরী) } + 2HCl$$

তেমনি অ্যাসেটিক অ্যাসিড-মিশ্রিত লেড অ্যাসিটেট দ্রবণের ভেতর দিয়ে H_2S গ্যাস পাঠালে কালো লেড সালফাইড (PbS) অধঃক্ষিপ্ত হয়। উপরের বিক্রিয়াগুলি বিভিন্ন ধাতবমূলক সনাক্ত করতে লাগে।

ব্যবহার : ল্যাবরেটরীতে ধাতবমূলক সনাক্ত করতে এবং বিজারক হিসেবে H_2S ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়ার সঙ্কেত ও পারমাণবিক গুরুত্ব লেখ।

2. প্রশ্ন 1-এ উল্লেখিত যে-কোন একটি গ্যাসের সহজ প্রস্তুত প্রণালী ও ধর্ম আলোচনা কর।

3. অনুঘটকের কাজ কি? দুটি অনুঘটক সম্পর্কে যা জানো লেখ। অক্সিজেন প্রস্তুতিতে অনুঘটক কি করে?

4. সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর : দহন, অন্তর্ধৃতি, জায়মান হাইড্রোজেন, ফোয়ারা পরীক্ষা, শুষ্ক বরফ, SO_2-এর বিরঞ্জক ধর্ম, ধাতবমূলক সনাক্ত করতে H_2S-এর ব্যবহার।

5. প্রশ্ন 1-এর গ্যাসগুলি গ্যাসজারে কিভাবে সংগ্রহ করা হয় কারণ উল্লেখ করে লেখ।

6. কি হয় সমীকরণের সাহায্যে লেখ :

(i) উত্তপ্ত লাল কাঠকয়লা, সালফার, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেনে পুড়লে ;

(ii) অতি তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেনে পুড়লে ;

(iii) অক্সিজেনে অ্যামোনিয়ার দহন হলে ;

(iv) চুনের জলে ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে CO_2 গ্যাস পাঠালে ;

(v) লঘু অ্যাসিডমিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণের ভেতর দিয়ে SO_2, H_2S চালনা করলে।

———

আমাদের নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠ্যসূচী (১৯৭৪) অনুযায়ী লিখিত

॥ নবম শ্রেণীর জন্য ॥

ইংরাজি

A Guide To English Grammar, Composition & Translation : Dr. P. Mahato

জীবন-বিজ্ঞান

সহজ জীবন-বিজ্ঞান : ড. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ড. নরেশচন্দ্র দত্ত

ইতিহাস

ভারতের ইতিহাস : ড. অসিতকুমার সেন ও পুলিনবিহারী দে

ভূগোল

ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভূগোল : ড. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গণিত

গণিত বিকাশ (১ম) : **Mathematical Association**
[পাটীগণিত ও বীজগণিত]

গণিত বিকাশ (২য়) : **Mathematical Association**
[জ্যামিতি, পরিমিতি ও ত্রিকোনমিতি]

বিশ্লিষ্ট গণিত **(Discrete Maths.) : A. I. M. T.**

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

Nag & Nag : BIJNAN PARICHAY (Part I)—Bengali
[Physical Science for Class IX]

1976 Rs. 6·00